স্মৃতি-সত্তায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

সম্পাদক

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

আর. কে. বি. কে. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনী

ও

চন্দননগর চ্যারিটেবল বুক ব্যাংক

যৌথ প্রকাশক ঃ

১) আর. কে. বি. কে. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনী
পি-২২, সি. আই. টি. রোড, স্কীম নং ৭/এম, কলিকাতা ৭০০ ০৫৪

২) চন্দননগর চ্যারিটেবল বুক ব্যাংক
৪৮, ব্যানার্জী পাড়া রোড, বারাসাত, চন্দননগর- ৭১২ ১৩৬

প্রথম প্রকাশ ঃ ২ আগস্ট ১৯৬০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১) সংগঠনদ্বয়ের নিজস্ব কার্যালয়

২) শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

৩) সন্তোষ পুস্তকালয়, দয়াল মঞ্জিল, বড়বাজার, চন্দননগর ৭১২ ১৩৬ .

উৎসর্গ

সমস্ত আচার্যানুরাগীদের
উদ্দেশে নিবেদিত

।। ভূমিকা।।

প্রফুল্লচন্দ্র ঃ স্মৃতি/সত্তা

প্রফুল্লচন্দ্র নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালীর অহঙ্কার, এবং তারো সঙ্গে তাঁকে (প্রায় তাঁর জীবৎকাল থেকেই) বিস্মরণে নির্বাসিত করার এক দুরপনেয় লজ্জা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি' এ আক্ষেপোক্তির সঙ্গে সমান সত্য 'বাঙালী আবেগ প্রবণ জাতি' যে আবেগ তুলনাহীন, ভারতবর্ষ পেরিয়ে সারা বিশ্বেই। আবেগধৃত প্রফুল্লচন্দ্রের একদা-দীপ্ত অবয়ব আজ আবেগশেষে অনাদরে বিস্মরণে কী ধূসর!

আমাদের দেশে মহাজীবন বা বড়ো মানের মানুষদের মূল্যায়নে যে সম্বর্ধনা, দেশজ স্বীকৃতি বা সমাদর-শ্রদ্ধা তা ঘটে প্রায়শ: সেসব জীবনের ম্লান সায়াহ্নে কখনো বা মরোণোত্তর চিতার মঞ্চে, কখনো বা মোটেই না। স্তুতি নিন্দার মিশ্র পরিমণ্ডলে নানা প্রহরে রবীন্দ্র সম্বর্ধনা অবশ্য এক বিরল ব্যতিক্রম।

টয়েনবী বলেছেন, 'একটি দেশে কতজন মহাপুরুষ মহাজীবন জন্মেছেন সেই সংখ্যাতত্ত্ব বড়ো নয়, বড়ো কথা সেই দেশ ক'টি মহাজীবনের আদর্শ-মনন তাদের জীবনে গ্রহণ করেছে।'

বিচিত্র এই, আমাদের দেশে মনীষী-স্মরণ কতকগুলি সোপানাশ্রয়ী। দুটি সোপানের মধ্যবর্তী কাল, কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভাষায় অস্তিত্বহীন। ৫০-৭০-৮০-১০০-১২৫ এগুলিই আমাদের মূলত স্মরণের সোপান। মধ্যবর্তী কালে তাঁদের স্মরণ-মনন, মুষ্টিমেয়র বিচ্ছিন্ন ব্যায়াম মাত্র।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সম্বন্ধে সব কথাগুলিই সত্য। তাঁর স্মরণ-মননের মূল প্রয়াস আসা উচিৎ ছিল দেশের সরকারের কাছ থেকে, বিশেষ করে আজ যখন দেশ স্বাধীন। পরাধীনতার দিনে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে, স্বদেশ স্বজাতির বৈষয়িক ও সামাজিক ও উন্নতির অনলস সংগ্রামে এক পুরোধা সংগ্রামী বিজ্ঞানীর ভূমিকাকে উত্তর-প্রজন্মের কাছে যথোচিত মূল্যায়নে তুলে ধরার সরকারী ঔদাসীন্য-অনীহা চোখে পড়েই।

প্রফুল্লচন্দ্র যদি কেবলমাত্র প্রথাসিদ্ধ বিজ্ঞানী হতেন, যদি কেবলমাত্র বিজ্ঞানের গোলায় তাঁর জীবনের ফসল তিনি তুলে রেখে যেতেন হয়ত কোথাও আমাদের বিস্মরণের স্বপক্ষে কিছু বক্তব্য তুলে ধরা যেত, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান এতো বিস্তৃত বৃত্তে, তার দায়ভাগ অনেককেই ছুঁয়ে যায়। তাঁর স্মরণ-মননের উদ্যম অনান্তরো ক্ষেত্রগুলি থেকেও আসা উচিত ছিল। প্রত্যাশা ছিল তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ছাত্রদের কাছ থেকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে, শিল্প -উদ্যোগী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে, গবেষক তথ্যানুসন্ধানীর কাছ থেকে,

বিজ্ঞান-শিল্প মন্ত্রকের কাছ থেকে। আজ ১৩৫ বৎসর পরেও কোনো প্রত্যাশাই পূরণ হয়নি, 'কেউ কথা রাখেনি'।

আজ অন্ধকারের দিনে আলোর দীপ নিয়ে একদিন যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সেই দীপ জ্বালিয়ে রাখার প্রশ্নে বুদ্ধিজীবীরা, শিক্ষাজীবীরা যখন বিশ্বস্ত নন্ তখন অবশ্যই মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের লাইন "মাটির প্রদীপ ছিল যে কহিল স্বামী / আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।" অনেক সময় কিছু বিচ্ছিন্ন মানুষ, কিছু ছোটো প্রতিষ্ঠান দৃঢ়সংকল্পে সেই কাজের ভার তুলে নেয়— যা বহুজনের কৃত্য ছিল। এঁদের কাছে ইতিহাসের ঋণ,জাতির ঋণ, অপরিশোধ্য। আর. কে. বি. কে. সম্মিলনী (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত রাড়ুলী, কাটিপাড়া, বাঁকা, খেঁসরার ইংরেজী আদ্যক্ষরগুলি নিয়ে— R K B K) প্রফুল্লচন্দ্র-স্মরণে এমনই এক বিরল প্রতিষ্ঠান। অমার্জনীয় ঔদাসীন্যে ইতিমধ্যে কৃতী প্রফুল্লচন্দ্রের কীর্তি, কর্ম, আদর্শ, অমূল্য রচনা চিরকালের মতো লুপ্ত। তবু এই ছোটো প্রতিষ্ঠানের কিছু অদম্য কর্মী, কিছু প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শের প্রতি নিবেদিত প্রাণ মানুষ, প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের এখনো লভ্য বিচ্ছিন্ন উপকরণগুলি অতি সযত্নে দীর্ঘ ক্লান্তিহীন প্রয়াসে সংগ্রহ করছেন, মুদ্রণ করছেন, গোচরে আনছেন।

এঁদের কাছ থেকেই নিকট অতীতে পাওয়া গেছে প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র জীবনের দুর্লভ কীর্তি India Before and After the Mutiny— এর একটিই কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ছিল। তা থেকে ভারতবর্ষে, এই সম্মিলনীই প্রথম মুদ্রিত আকারে সে গ্রন্থ তুলে দিয়েছেন, তাঁর জন্মের ১৩০ বৎসরে। এঁদের 'কপোতাক্ষ' পত্রিকাটি, গত ১৪ বছর ধরে অনর্গল ভাবে প্রফুল্লচন্দ্রের এবং তাঁর জীবনের ওপর নানা প্রাচীন রচনা, দলিল এমন তথ্যসমৃদ্ধ ভাবে প্রকাশ করেছেন, যে প্রচলিত প্রশংসাটুকু বা সাধুবাদই যথেষ্ট নয়। তাঁদের ওই প্রয়াস ভবিষ্যতে গবেষকদের কাছে প্রফুল্লচন্দ্র-গবেষণার অনিবার্য উপাদান হয়ে রইল। এঁদের এবারের প্রয়াস— 'স্মৃতি-সত্তায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র'।

আমরা সবাই জানি, সমকাল তার নানা সমস্যা ও সমাজ-বিন্যাসের বুনোটে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির দোলাচলে, যেমন মহৎ প্রতিভা সৃষ্টি করে, তেমনি সেই লোকোত্তর প্রতিভারা আবার তাঁদের জীবনে কর্মে, মননে আদর্শে এমন এক প্রভাব বিস্তার করেন যা প্রভাবিত করে, প্রবল আলোড়ন জাগায় সমকালে – আন্দোলনের, রিফর্মেশনের নানা তরঙ্গ-অভিঘাতে, যা উত্তরকালে সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। আমাদের এই ছোটো প্রদেশে (অধুনা পশ্চিমবঙ্গে) এমন উদাহরণ দুর্লভ নয়। আছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, অরবিন্দ ও অগণিত নক্ষত্রপ্রতিম প্রতিভা। বিশেষ করে 'কালের নৌকায় সহযাত্রী' রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র, যাঁরা রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষিতে ভারতের সব আন্দোলনে সহযাত্রীই থাকেননি, দুই অশীতিপর বৃদ্ধ আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের সংকটেও প্রতিবাদের দলিলে

যুগ্ম স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

আমরা অনেকেই বিস্মৃত হয়েছি – ৭০ বৎসর ও ৮০ বৎসর দুটি প্রফুল্ল জয়ন্তীতেই পুরোটা ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম সম্মিলন। ৮০ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ, জয়ন্তী উৎসবে প্রফুল্লচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর শেষ রাজনৈতিক রচনার ক্ষুদ্র গ্রন্থ "Mahatma Gandhi and the Depressed Humanity"। স্বদেশচিন্তার এক শ্রেষ্ঠ তপস্বীকে আরেক স্বদেশচিন্তার-তপস্বীর, মূল্যায়নের, চারিত্রপূজার অনন্য নিবেদন!

আর. কে. বি. কে. সম্মিলনীর এক মূল প্রচারবিমুখ কর্মী শ্রীপিনাকপাণি দত্তের সঙ্গে আমার কথা প্রসঙ্গে একদিন এক আলোচনায় বলেছিলুম, "জানতে কৌতূহল হয় কি লেখা হয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্র প্রয়াণে সেদিন কলকাতার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের দৈনিক সংবাদপত্রে: পাক্ষিকে, মাসিকে, সাময়িক পত্রে? স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর, শনিবারের চিঠি, দেশ, মিউনিসিপ্যাল গেজেটে? এইসব সম্পাদকীয়র একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কি ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের মূল্যায়ন ঐসব রচনায় দূরাভাসে প্রতিভাসে?" আমি চমৎকৃত হলাম সেই দূরূহ শ্রমসাধ্য ধৈর্যের পরীক্ষার কাজ এঁরা সম্ভব করলেন, স্বল্পকালে। তারই ফলশ্রুতি এই সঙ্কলন: স্মৃতি-সত্তায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। কবি বিষ্ণু দে'র একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম— 'স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ'। এই সংকলনের 'স্মৃতি সত্তা' সমর্পিত হল ভবিষ্যতের হাতে। হয়ত এই সংকলনে অনেক অপূর্ণতা আছে, ত্রুটি আছে— প্রমাদও আছে, মুদ্রণ ও অন্যান্য। তবু তা সস্মিত মার্জনা পাবে অনুরাগী পাঠক মহলে, এ বিশ্বাসও রইল।

প্রসংগত, এই সংকলনকে সমর্পণযোগ্য করে তুলতে যুক্ত হয়েছে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে বহু গুণী ও অনুরাগীজনের শ্রম-সহযোগিতা ও আনুকূল্য। সব থেকে উল্লেখ্য— চন্দননগর চ্যারিটেবল বুক ব্যাংকের চিত্ত ও বিত্তের সহযোগিতা, শ্রীঅজিতকুমার দে'র মতো কর্মীদের ভূমিকা। এঁরা সবাই শ্রদ্ধায় স্মর্তব্য।

পিতৃতর্পণ, আচার্যঋণের স্মরণে আচার্য তর্পণ একদা প্রাচীন ভারতের ঋষিদের অনুশাসন ছিল ব্যক্তির জীবনে। সে অনুশাসন অবশ্য পালনীয় ছিল সেদিন নৈতিকতাধৃত সমাজধর্ম--ধৃত ভারতবর্ষে। এটি নির্দিষ্ট হয়েছিল মূল্যবোধের প্রয়োজনেই, তার সৃজন-লালন-ধারণের প্রয়োজনেই। ওই মূল্যবোধের বিচ্ছিন্নতাই আজ আমাদের সর্বদুর্গতির মূলে।

প্রফুল্লচন্দ্রের যে স্মৃতি অর্ঘ নিবেদিত 'প্রফুল্লচন্দ্র : স্মৃতি সত্তা' গ্রন্থনায় তার সঙ্গে আজ কৃতকৃতার্থ বাঙালীর কিছু শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনে আরেকবার আমরা স্মরণ করি সেই মহাজীবনের উপলখণ্ডগুলি।

'কালের নৌকায় সহযাত্রী' রবীন্দ্রনাথ প্রফুল্লচন্দ্রের সপ্ততি জয়ন্তীর মানপত্রে অনবদ্য ভাষায় প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনকে নানা বিশ্লেষণে মহিমান্বিত করে গেছেন। বিশেষ করে বলেছেন :

'সংসারে স্থানত্যাগী দুর্লভ নয় কিন্তু মানুষের চরিত্রে ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করে তুলতে পারেন এমন মানুষের সংখ্যা আঙুলে গুণে শেষ করা যায়।'

আরো বলেছেন : *'তিনি বহু হয়েছেন..... নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। .... অকৃপণ ভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করেছেন।..... তাঁর আত্মদানমূলক সৃষ্টি, শক্তি, দৈবশক্তি।..... আচার্য নিজের জয়কীর্তি স্থাপন করেছেন, উদাসশীল জীবনের ক্ষেত্রে পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।'*

সংশয়ের যুগের মানুষ আমরা, আমাদের সংশয় ওই পাথর আর প্রেমের কথায়। আমরা কি সত্যি আচার্যকে গ্রহণ করেছি প্রেমে, না পাথরে, স্তম্ভিত মর্মরেই? তাঁকে মর্মরে প্রতিষ্ঠা করেই আমরা দায়মুক্ত হয়েছি। সেই মর্মর সায়ান্স কলেজের ধূলিধূসর প্রান্তে অন্ধকার করিডরে, সে মর্মর হুকারবেষ্টিত লোক-অগোচর কলেজ স্কোয়ারের মূর্তিতে।

আমরা আত্মপ্রবঞ্চনায় কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিশেষণ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আরোপ করে দায়মুক্ত হয়ে থাকি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আচার্য নামের মহিমায় আমরা প্রায় আপ্লুত। মনে রাখা দরকার *'আচার্য'* শব্দটি প্রাচীন ভারতবর্ষে অতি শ্রদ্ধার উচ্চারণ। মূলত যাঁরা শিক্ষক, লোকশিক্ষক, যাঁদের জীবন, কর্ম, আদর্শ নিত্য আচরণীয়, যাঁদের জীবনচর্যাই ছিল তাঁদের জীবন—বাণী, তাঁদেরই আচার্য বলেছিল ভারতবর্ষ। এমন সার্থক অভিজ্ঞতা, একমাত্র প্রফুল্লচন্দ্রেই সম্ভব।

প্রফুল্লচন্দ্রের আরেক জন- পরিচয়, তিনি বরেণ্য বিজ্ঞানী। অবশ্যই তাঁর পুরোধা বিজ্ঞান সাধনা ভারতের ইতিহাসের সামগ্রী। তাঁর ছাত্ররা বিজ্ঞান প্রতিভায় জগৎস্বীকৃত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষাপরিষদে, ভারতে রসায়ন বিজ্ঞান সাধনার মূল স্থপতি তিনি।

বহু বিচিত্র তাঁর মৌলিক গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, পত্রিকা প্রকাশ, প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি এবং সর্ব অর্থেই বিপুলবীর্যে আধুনিক বিশ্ববিজ্ঞানে তিনি ভারতের আদি পথিকৃৎ।

ফলিত বিজ্ঞানে তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক বৃহৎ ও কুটিরশিল্পপ্রতিষ্ঠান সেও বাংলার, এবং ভারতেরও এক ইতিহাস। ইতিহাস, বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা-বিকাশ-বিস্তার। যদিও, আজ তা গৌরবচ্যুত, আমাদের চারিত্রিক ভ্রষ্টতায় ও নানা কুটচক্রে।

কিন্তু বিজ্ঞানের ভাল লাগা যখন সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের ওপর স্বচ্ছন্দ ও সুছন্দ ভালোবাসায় প্রবাহিত হয় এক বিজ্ঞানীর জীবনে— তখন তা আরেক বিস্ময়ের অনন্য মাত্রা বা ডায়মেনশন যোগ করে দুই ধারাতেই। তাঁর সাহিত্যপ্রীতি বিশেষ করে শেক্সপীয়ার সাহিত্য ও মধ্যযুগীয় ইংরাজী এবং কন্টিনেন্টাল সাহিত্য তাঁর শেষ প্রহর পর্যন্ত নিত্য সঙ্গী ছিল।

তবু বিজ্ঞানীর আরেক শর্ত— সামাজিক দায়বোধ ও সমাজসচেতনতা। গজদন্তমিনারের বাসিন্দা মৃণালভোজী, one dimensional, আত্মপ্রতিষ্ঠাসর্বস্ব এবং জনবিচ্ছিন্ন আজকের দিনে যে বিজ্ঞানীদের আমরা দেখে থাকি– প্রফুল্লচন্দ্র তার মূর্ত ব্যতিক্রম ছিলেন এবং চিরকাল তাই থাকবেন।

তাঁর জীবনের অন্যতম এবং শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় জনসেবা, আর্তত্রাণ। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মতো মানের কোনো বিজ্ঞানী তাঁর পঠন-পাঠন-গবেষণাকে একপাশে রেখে সেবা ও আর্তত্রাণকে এমন বিস্তীর্ণ পটভূমিতে পরিণত করেননি। দেশের মানুষও সেদিন অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসে তাঁর প্রসারিত মুষ্টিতে ('যার যাহা আছে ভাণ্ড ভরিয়া দেহ রে') দিয়েছে।

আরো আছে। আচার্যের মূল পরিচয়– ছাত্র, শিক্ষা, শিক্ষণ, পঠন, পাঠন। ছাত্রবৎসল প্রফুল্লচন্দ্র— লিজেন্ড, কিংবদন্তী। আজ শিক্ষক ও শিক্ষাজগতের সার্বিক অবক্ষয় ও ভ্রষ্টতার দিনে ওই লিজেন্ড আর পূরণের প্রশ্নই ওঠে না।

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'র জীবনে এক অকলঙ্ক শুভ্রতার, কৃচ্ছ্রতার (যা প্রায় কৃপণতা) ঋষিকল্প জীবনে আচার্যের জীবনের ধ্যান জ্ঞান ছিল দেশ, মানুষ এবং সর্বোপরি বাঙালী। এমন আদ্যন্ত বাঙালী আর কখনো প্রমূর্ত হবেন না। এই শূন্যতা বোধহয় সবথেকে অপূরণীয়।

বাঙালী বিদ্যাসাগর, বাঙালী রবীন্দ্রনাথ, বাঙালী প্রফুল্লচন্দ্র এবং ইদানীংকালে বাঙালী বিভূতিভূষণ, বাঙালী জীবনানন্দে যে বাংলার মুখ সেইসব মুখের দর্পণে বাংলার মুখ দেখার অবকাশ যেদিন বাঙালীর হবে সেদিন বাঙালী উপলব্ধি করবে এইসব জীবনের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' কোন্ ভাষায় কথা বলেছিল।

রেনেসাঁ এদেশে হয়েছিল কি হয়নি তার চুলচেরা বিচার করার ভার পণ্ডিতদের। কিন্তু একথা কে অস্বীকার করবে উনিশ শতকের বাংলার 'এক আকাশে অনেক তারা'র মতো যেসব নক্ষত্রের মতো যুগপুরুষেরা, তাদের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র বিশিষ্টতম, যাঁর জীবনে রেনেসাঁর তিনটি শর্ত Science, Secularity, Synthesis পূর্ণ মহিমায় বিকশিত।

তাঁর Science-এর কথা সর্বজনবিদিত, Secularity-র প্রশ্নেও তিনি একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি ব্রাহ্ম হয়েও ঈশ্বর নিরুৎসুক, তাঁর মুখ ছিল আর্ত মানুষের দিকে ফেরানো–'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের থেকে দীন/ সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে।' এদিক দিয়ে তাঁর আশ্চর্য মিল ছিল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। আর Synthesis? 'বহু মনীষীর বহু মননের ধারা' তাঁর জীবনে যেমন প্রমূর্ত এমন আর কোনো মনস্বীর জীবনে নয়।

সমকাল মনীষীদের জীবনে প্রভাব ফেলেই। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে প্রভাব ফেলেছিলেন যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত, গ্রন্থকীট পিতা, মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন এবং নানা মানুষ। সব থেকে বেশী বোধহয় প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে বিবেকানন্দ। সমসাময়িক

কালের বিবেকানন্দই প্রথম হৃতমান ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপুল বীর্যে প্রতিষ্ঠা করলেন, তাইনা, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি- ধর্ম- ঐতিহ্য সর্ববিধ গরিমাকে তুলে ধরলেন। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ স্বাদেশিকতা স্বদেশপ্রেম জাতীয়তার আহ্বানে যুবচিত্ত ও কর্মশক্তিকে এক নতুন রূপ দিলেন, আর তুলে ধরলেন সেবাধর্মের মাধ্যমে হৃদয়বৃত্তির উদ্বোধন। বিবেকানন্দ তিনটি জ্বলন্ত প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন উত্তরকালের ভারতকে ঃ 'মূর্খ ভারতবর্ষ, চণ্ডাল ভারতবর্ষ, দরিদ্র ভারতবর্ষ।'

বিবেকানন্দ তুলে ধরতে চাইলেন ভারতের লুপ্ত বিজ্ঞান–গরিমাকে, চাইলেন ঐহিক বিজ্ঞান সহায়ে দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি ঘুচিয়ে, যুবকদের চাকুরীমুখীনতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জীবনে–কর্মে স্বপ্রতিষ্ঠ, ও চরিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।

বিবেকানন্দই প্রথম দুটি শব্দ তার গুরুত্ব দিয়ে প্রথম ব্যবহার করলেন– Mass এবং Youth Power। মনে রাখার কথা এগুলি সবই বিবেকানন্দ করেছিলেন, বলেছিলেন— স্বধর্মে, তাঁর সন্ন্যাসধর্মে স্থিত থেকে।

প্রফুল্লচন্দ্র এর সব কটি পথেই পদচারণা করেছেন। তাঁর History of Hindu Chemistry প্রাচীন ভারতের লুপ্ত বিজ্ঞান–গরিমার এক অনন্য দলিল। স্বধর্মে স্থিত থেকে (বাসন্তী দেবীকে তাঁর লেখা চিঠি স্মর্তব্য) তাঁর মত এমন স্বদেশ প্রেমিক যিনি নিষ্ঠায়, আত্মত্যাগে, আন্তরিকতায়, পরাধীন দেশের man making, character building এতে নিঃশব্দব্রতী থেকে জাতি গঠন করেছিলেন, তাঁর পদচিহ্ন আজো খুঁজলে পাওয়া যায়। বাঙালীকে ঐহিক বিজ্ঞান সহায়ে স্বপ্রতিষ্ঠ করার তাঁর সাধনা, তার পুনরপি সাধনা আর কেউ করেননি আজো।

প্রফুল্লচন্দ্রের সেবাধর্ম তাঁর জীবনে অনন্য অধ্যায়। এই প্রসংগে অপ্রাসংগিক নয় কিছু ইতিহাসের পদচিহ্ন অনুসরণ। বিবেকানন্দ-প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যায় আলোচনায় তা কম প্রয়োজনীয় নয়। ১৮৯৭ সালে স্বামী অখণ্ডানন্দ দুর্ভিক্ষতাড়িত মহুলাগ্রামে সেবাকার্য শুরু করেন। মূল প্রেরণা, সাহায্য করেন বিবেকানন্দ। ১৮৯৭ সালেই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ৮৪টি গ্রাম নিয়ে দুর্ভিক্ষতাড়িত দিনাজপুরে সেবাকার্য শুরু করেন। এবারো অগ্রণী, উৎসাহী, বিবেকানন্দ। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগে সেবাকার্যে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা বহু আলোচিত। উত্তরভারতেও 'মশিন সাধু' (মিশ্যন সাধু) বা ভাঙ্গী সাধু কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের বহুমুখী সেবাকার্য। এসব রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানের আগের বা সদ্য প্রতিষ্ঠাকালের ঘটনা। আজো সেবাধর্মে তাঁরা অটুট, অবিচল। এক সন্ন্যাসী থেকে যে সেবাধর্মের সূচনা, গৃহী(?) সন্ন্যাসী প্রফুল্লচন্দ্রে আমরা নিজস্বতায় তার পূর্ণ মহিমাময় বিকাশ দেখেছিলাম।

ভাবতেও কষ্ট হয়, বার্ধক্যের অনিবার্য শারীরিক অক্ষমতায় তাঁর জীবৎকালেই তিনি নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিলেন, হয়তো বা নির্বাপিতও হয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাসিত মানুষটির

সঙ্গী ছিল না জ্ঞানে-মনে-আদর্শে। তাঁর জীবৎকালেই ১৩৫০-এর মহামন্বন্তরে কোনো যুবসম্প্রদায়, কি দেশের মানুষ এগিয়ে আসেননি— তাঁর ঐতিহাসিক ত্রাণকার্যের ছিন্নসূত্রের গ্রন্থিবন্ধনে। অসহায় মানুষটি সেদিন তাঁর অকৃতার্থ কর্মের জন্য কোন্ বেদনা অনুভব করেছিলেন আরেকবার জানতে ইচ্ছে করে। তাঁর জীবৎকালেই তাঁর হাতে গড়া বেঙ্গল কেমিক্যাল যখন 'অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগে' স্বার্থ লোলুপ, সেদিন প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর হাতে গড়া বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে আদর্শগত কারণেই সংশ্রব ছিন্ন করেছিলেন। নিজের হাতে গড়া সৃষ্টি ছেড়ে আসার সময় সেদিন কোন্ বেদনা বিদ্ধ করেছিল আদর্শবাদী কর্মযোগী মানুষটিকে, আরেকবার জানতে ইচ্ছে করে।

নির্বাক মানুষটির সেই শেষপ্রহরের দিনে ভীরুপায়ে নিঃসঙ্গ তাঁকে একদিন প্রণাম করে এসেছিলুম। সে আমার তীর্থদর্শন-বিগ্রহদর্শন। তাঁর সেই স্নেহময় ক্ষণ-আশীর্বাদের স্পর্শ চিরস্মরণীয় আমার জীবনে। সেইই আমার সারা জীবনে একটি অলংঘ্য তর্জনী তুলে ধরেছে, সব বিচার সিদ্ধান্তে, সব প্রলোভনের মধ্যে বলেছে- এইটে 'হ্যাঁ', এইটে 'না'। এই 'হ্যাঁ', 'না' বলার মানুষগুলি যখন জাতির-ব্যক্তির জীবন থেকে, ইতিহাসের থেকে, স্মৃতি-মননের থেকে তিরোহিত হয়ে যান, ধূসর হয়ে যান,— তখন সে বড় দুর্দিন। আজকের দুর্দিন — তাইই। এই দুর্দিনের উত্তরণের পথ একটাই। সে হল, ওই ঋষিকল্প মানুষটির লুপ্ত পদচিহ্নের যথাসাধ্য অনুসরণ করে লোকগোচর করা, এবং তাঁকে শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায় ব্যক্তির জীবনে এবং জাতির জীবনে গ্রহণ করা, মূল্যবোধে— কর্মৈষণায় প্রতিষ্ঠা করা।

'স্মৃতি-সত্তায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' সেই কৃত্যকর্মের নিরভিমান সূচনামাত্র।

অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদকের কথা

এ-পরিকল্পনা মাথায় রেখেছিলাম অনেক বছর আগে, বহুদিন ধরে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্মীরূপে দীর্ঘকাল যুক্ত থাকার ফলে প্রতিদিন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, প্রাচীন গ্রন্থাবলী দেখতে হয়। তখনই মনে পড়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা। বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন ৯ বছর এবং একটানা ৪ বছর ছিলেন সভাপতি। এটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, প্রতিদিনের কর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর আগে ও পরে আমৃত্যু জড়িয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র, পরিষদের বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে। ফলে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জড়িয়ে আছে এইরূপ একটি সংকলনের আয়োজনে। আচার্য রায়ের মৃত্যুর পরে যে-সব পত্রপত্রিকা আচার্য রায়কে নিয়ে বিশেষ স্মৃতি-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, সেসব পত্রপত্রিকা থেকে বিভিন্ন মনীষীদের স্মৃতিচারণ সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলাম অনেক আগে থেকেই। তারপর আমার এই ইচ্ছার কথা, এই স্মৃতিচারণ সংকলনের কথা সম্মিলনীর এক প্রকাশ্য সভায় প্রকাশ করেছিলাম। উৎসাহিত হয়েছিলাম, অভিভূত হয়েছিলাম সেই সভায় উপস্থিত সদস্যদের তাৎক্ষণিক হর্ষোৎফুল্ল উৎসাহে। মনে মনে প্রণাম জানিয়েছিলাম আচার্যদেবের স্মৃতির প্রতি।

এটাই শুরু। তারপর সম্পাদকমণ্ডলীর বিশেষ সভায় আলোচনা করে স্থির হয়েছিল কেবলমাত্র স্মৃতিচারণই নয়, আচার্য রায়ের জীবৎকালেও তাঁকে নিয়ে যেসব মূল্যবান্ রচনা প্রকাশিত হয়েছে তারও একটা নির্বাচিত অংশ এই সংকলনে গ্রহণ করা হোক। এরই ফলশ্রুতি বক্ষ্যমান সংকলন '*স্মৃতি-সত্তায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র*'। ফলে স্বাভাবিক কারণে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে রচনা-নির্বাচন ও সংকলনের ব্যাপারে। বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পত্র--পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আচার্য রায়ের মৃত্যু সংবাদ এবং তাদের প্রতিক্রিয়া খুঁজে পাওয়াও অত্যন্ত দুরূহ। এ-সব সংগৃহীত হতেও বহু সময় ব্যয়িত হয়েছে। এসব কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন সম্মিলনীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এবং এই গ্রন্থের সহ-সম্পাদক অনুজপ্রতিম শ্রীপিনাকপাণি দত্ত। পাঠক-সাধারণ তাঁর এই দুঃসাধ্য প্রয়াসের ফসল দেখে নিশ্চয়ই তাঁদের অধীর প্রতীক্ষার ক্ষোভ প্রশমিত হবে, এই প্রত্যাশা।

এই সংকলন করতে গিয়ে, পুরনো ও নতুন ধারার বানানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ সেকালে যে কীভাবে রচনায় ব্যবহৃত হতো তা এই সংকলন-গ্রন্থ পাঠে অনুভূত হবে। আমরা এই বানান ও ভাষা ব্যবহার যথাযথ রাখতে চেষ্টিত হয়েছি। তবুও সংশয় থেকে যায়, মুদ্রণ প্রমাদ হয়তো থেকে গেছে। এজন্য পাঠকদের কাছে আমরা ক্ষমার্থী। কয়েকটি বানান ডি.টি.পি - তে সঠিকভাবে আনা সম্ভব হয়নি। যেমন 'রাড়ুনী' বানানটি অনেকক্ষেত্রে 'রাড়ুনী' করতে হয়েছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি যাতে মুক্ত হতে পারে সে-চেষ্টার প্রতিশ্রুতি রইল।

আচার্য রায়কে নিয়ে কাজ করার আরো বহু সুযোগ আছে। প্রথমত, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর জীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞের বহু তথ্য আজও আমাদের অজানা। সেই সব তথ্যাদির মাধ্যমে সম্পূর্ণ-মানুষ-প্রফুল্লচন্দ্রকে জানা সম্ভব। এর একটি সংকলন প্রকাশ করা যেতে পারে। আচার্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সম্মিত উৎসাহে এ-কাজে আমরা অগ্রসর হতে পারি।

এই সংকলন-প্রকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের আর্থিক সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য চন্দননগর চ্যারিটেবল বুক ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ। এঁদের আচার্যপ্রীতি সম্পাদকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছে। আমাদের একান্ত সুহৃৎ এবং সম্মিলনীর সনিষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মার মূল্যবান ভূমিকা এ-গ্রন্থের সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে। সংকলন-প্রকাশে যে-সকল আচার্যানুরাগী ব্যক্তি অগ্রিম অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে গ্রাহক হয়ে গ্রন্থপ্রকাশ সুগম ও ত্বরান্বিত করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি। জীর্ণ পত্র-পত্রিকা থেকে বহু রচনা কপি করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কল্যাণীয়া কল্যাণী মিত্র। তাঁর প্রতি রইল আমাদের আশীর্বাদ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ড. শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী পারমিতা গোস্বামী (ভট্টাচার্য) পরিষদের পত্রপত্রিকা সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রইলাম।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর প্রতি। তিনি এই গ্রন্থের জন্য শুভেচ্ছাপত্র দিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীকে অনুগৃহীত করেছেন।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সূ চী প ত্র

অভিনন্দন (হস্তলিপি) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

।। স্মৃতি ।।

॥ সত্তা ॥

।। শেষ নমস্কার ।।

Synopsis of Editorials :

।। ঘটনাপঞ্জী ।।

❑ *পরিশিষ্ট*

সম্মিলনীর অন্যান্য প্রকাশনা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র– ১২৫তম জন্মজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র– শ্রীসন্তোষকুমার দে

Three Convocation Addresses of Sir P.C. Ray

India Before and After the Mutiny

(1st Indian Edition:1991)

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan. Bengal

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের
সপ্ততি বর্ষ বয়সের
জয়ন্তী উপলক্ষ্যে
কবির এই অভিনন্দন।

আমরা দুজনে সহযাত্রী।

কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁচেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন,— কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।

বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি,

বেশী শক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হোত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্য্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য্য নিজের জয়কীর্ত্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২ আষাঢ়
১৯৩২

আচার্যদেব (১৯১৮)

স্মৃতি

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী

স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্।

বাংলা ১২৬৮ সনের শ্রাবণ মাসে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দে) দেশমান্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাড়ুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রপিতামহ মানিকচন্দ্র রায় প্রথমে নদীয়ার, শেষে যশোহরের কালেক্টারীর দেওয়ান ছিলেন; পরে ঐ পদের নাম সেরেস্তাদার হয়। ১৮২৩ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। আচার্যদেবের পিতামহ আনন্দলাল রায় যশোহর কালেক্টরীর পেশকার এবং পরে সেরেস্তাদার হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়। আচার্যদেবের পিতা হরিশ্চন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজের কাপ্তান ডি.এল.রিচার্ডসন-এর ছাত্র ছিলেন। লোকে বলে যে ইঁহার ন্যায় ইংরাজী জানা অধ্যাপক ভারতবর্ষে আর আসেন নাই। স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী হরিশ্চন্দ্রকে বাংলা ও সংস্কৃত পড়াইতেন এবং সাগরদাঁড়ী সেখপাড়া নিবাসী মৌলবী মখমলের নিকট ইনি আরবী ও পার্সী পড়েন। দুর্গাপুরের সেখ হাতেম মৌলবীর পিতা সেখ মাদারবক্স আখুঞ্জীর নিকট হরিশবাবু পার্শী শেখেন। এই মৌলবী সাহেব কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। হরিশবাবু কমবেশী ৭টি ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন: — ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, কায়েতী বা হিন্দী, আরবী, পার্সী ও উর্দু; ইহার মধ্যে বাংলা ও পার্সী তিনি ভাল জানতেন।

হরিশবাবু অল্পদিন চাকরী করিয়াছিলেন। তিনি যশোহর কালেক্টারীতে প্রধান মুন্সী ছিলেন। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথমে শিক্ষকতা করেন, পরে তিনি নিমক বিভাগের দারোগা হন। ইঁহার পর তিনি বাড়ীতে আসিয়া বিষয়কর্মের তত্ত্বাবধান করিতেন। ইঁহাদের পরিবার খুব পুরাতন ও সম্ভ্রান্ত।

(বংশপঞ্জী)

(১) জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র (২) নলিনীকান্ত (৩) প্রফুল্লচন্দ্র (৪) পূর্ণচন্দ্র (৫) বুদ্ধদেব

কাঁকরের খাসনবিশ, গদাইপুরের কাজি এবং মলুই-এর চৌধুরী এই তিনঘর একসঙ্গে নবাবী আমলে এদেশে আসেন। মলুই-এর চৌধুরীদের তিন ভ্রাতা কমল, রঘুনন্দন ও শ্রীহরি পুরাইকাটী গদাইপুর হইতে উঠিয়া আসেন ; কমল হরিঢালী গ্রামে বাস করেন। রঘুনন্দন ও শ্রীহরি রাড়ুলী তে আসেন ; রায়-আলি হইতে রাড়ুলী নাম হইয়াছে এইরূপ জনশ্রুতি।

এই বংশের রামপ্রসাদ রায় মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সময় এদেশে আসেন। শিবদাস চোখন্ডী নামক এই বংশের একজন মলুই নামক সুবিস্তীর্ণ পরগণা পাঠান—নবাবদিগের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লন। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে রঘুনন্দন রায়ের ভ্রাতা কমল ও গোপী রায় অবস্থার বিপর্যয় হেতু উক্ত পরগণা চাঁচরার রাজা মনোহর রায়ের নিকট বিক্রয় করেন।

হরিশবাবু কলিকাতায় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একজন সভ্য ছিলেন। রাজা দিগম্বর মিত্র, বাগ্মী কৃষ্ণদাস পাল, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হরিশবাবুর বন্ধু ছিলেন। উক্ত রাজা বাহাদুর হরিশবাবুর বাড়ীতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। আচার্যদেবের জন্মের পূর্বে রাড়ুলী অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহা জানাবার জন্য ১৮৫৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী (বাংলা ২৯ মাঘ, ১২৬৪) তারিখের "সংবাদ প্রভাকর" হইতে কয়েকছত্র নিয়ে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কিয়দ্দিবস অতীত হইল জিলা যশোহরের অন্তর্গত রাড়ুলী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় এবং অন্যান্য কতিপয় মহাত্মাগণের প্রযত্নে প্রোক্ত রাড়ুলী পল্লীতে গবর্ণমেন্টের সাহায্যকৃত একটি স্বদেশীয় ভাষার বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াবধি বালকবালিকারা যথাবিধিক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং সুশিক্ষার প্রভাবে তাহারা স্ব স্ব পঠিত বিষয়ে একপ্রকার ব্যুৎপন্নও হইয়াছে বটে ; ফলতঃ অতি অল্পকালের মধ্যে এই রাড়ুলী বিদ্যালয়স্থ ছাত্রেরা যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অন্যত্র প্রায় সেরূপ শুনিতে পাওয়া যায় না। বিগত পৌষ মাসে জিলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টার সাহেব তথা খুলনিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং অন্যান্য কতিপয় সদ্বিদ্যাশীল মহাত্মাগণ অত্র বিদ্যালয়ে শুভাগমন পুরঃসর বালক বালিকাকুলের পরীক্ষা গ্রহণে যথোচিত সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে বিদ্যালয়ের সমুন্নতির বিস্তারিত বিবরণ করিতে হইলে এই বলা উচিত যে বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহনলাল তর্কবাগীশ মহাশয়ের সুনিয়মে শিক্ষাপ্রদান ও প্রস্তাবিত বাবু হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের অবিচলিত অধ্যবসায় ও গাঢ়তর উৎসাহই তাহার প্রধান কারণ।"

হরিশবাবু ১৮৭০ সালে ডিসেম্বর মাসে পুত্রদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার উদ্দেশ্যে সপরিবারে কলিকাতায় যান এবং ১৩২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে চাঁপাতলা বাড়ীতে বাস করেন। ঐ বাড়ীতে তাঁহার এই সময় হইতে ১৮৮৯ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। বাড়ীটা দোতলা, মাসিক ভাড়া ৩০ টাকা। ১৮৭০ সনের প্রথম কলিকাতায় পানীয় জলের কল হয়। ১৩০২

সনের (ইং ১৮৯৫) ২৭ বৈশাখ তারিখে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচপুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র ভাড়াশিমলা গ্রামে নবকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের কন্যা ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করেন। ১৩১০ সনে ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হয়।

হরিশ্চন্দ্র কিরূপ বিদ্যোৎসাহী ও স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন তাহা বুঝা যায়। তিনি ১৮৬৮ সাল হইতে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেন। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হরিশবাবুর স্ত্রী ভুবনমোহিনীকে বাংলা শিক্ষা করিতে সহায়তা করিতেন। মেম্ ও দেশীয় খৃষ্টান মহিলাদ্বারা হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীকে লেখাপড়া ও কার্পেটের কাজ শেখান।

খুলনা জেলার ইতিহাস লিখিতে যাইয়া ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তোমার সন্তান।
দানবীর, জ্ঞানবীর, কে তাঁর সমান॥
উজ্জ্বল তোমার অঙ্ক তাঁহার প্রভায়।
বিজ্ঞান সাধনা তাঁর ধরাতলে গায়॥
দয়ার সাগর সেই বাঁচাইল প্রাণ।
দুর্ভিক্ষপীড়িত তব ক্ষুধিত সন্তান॥

আচার্যদেব ১৮৭০ সাল পর্যন্ত রাড়ুলী মধ্য ইংরাজী স্কুলে পড়িয়া ১৮৭১ সালে কলিকাতায় যান এবং হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। ইঁহার মধ্যমাগ্রজ ঐ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ হন। আচার্যদেব ঐ স্কুলে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। এর পর কঠিন আমাশয়রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁহার সুস্থ হইতে দেড় বৎসর সময় লাগে। বাড়ী আসিয়া টোটকা ঔষধে ঐ রোগ হইতে মুক্তি পান। ইহাতে তাঁহার এক বৎসর সময় নষ্ট হয়। ১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে তিনি এ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। উক্ত বিদ্যালয়ের সুনাম বঙ্গদেশময় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলিয়া গণ্য হইত। কেশবচন্দ্র সেনের অনুজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী সেন তখন এই স্কুলের অধিনায়ক ছিলেন। উক্ত স্কুল হইতে আচার্যদেব ১৮৭৮-৭৯ সালে প্রথম বিভাগে এন্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং স্কুলের একটি ফাণ্ড হইতে দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৫ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। ১৮৮১ সালে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিট্রিশন হইতে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পাশ করেন। পরে সেইখানে বি. এ. পড়িবার সময় গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি উত্তীর্ণ হইয়া ৭,০০০ টাকা বৃত্তি পান (১৮৮২)। ইহাতে গ্রীক, লাটিন, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা শেখা দরকার হইত। প্রফুল্লচন্দ্র যখন বি. এ. পড়েন, তখন কলেজের পড়া পড়িয়া গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পরীক্ষার জন্য পৃথকভাবে প্রস্তুত হন। বাড়ীর কেহ জানিতেন না যে ইনি নূতন কোন্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা ও ধর্মোপদেশ শুনিবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। ১৮৮২ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত সমাজের সভ্য ছিলেন। গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া ইনি বিলাতে যান। বিলাতে প্রথম বি. এস-সি এবং পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি

উপাধি লাভ করেন। এদেশে আসিয়া কর্মজীবন আরম্ভ করিবার পর তিনি সি. আই. ই. এবং 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন, তবু তাঁহার অহঙ্কার ছিল না। আড়ম্বর বা বিলাসিতা ছিল না। অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন করিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সামান্য একখানি ধুতি বা লুঙ্গি, ছোট একটা জামা এবং তাঁহার সমান লম্বা একগাছা ছড়ি লইয়া তিনি এখানে ওখানে ভ্রমণ করিতেন।

দেশের অর্থকষ্টের দিনে তিনি গ্রামে ঘুরিয়া চরকা ও খদ্দরের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের আর্তনাদে তাঁহার হৃদয় দ্রব হইত। সঙ্কট-ত্রাণ সমিতির কর্তা হইয়া তিনি উত্তরবঙ্গের বন্যার ভীষণ ধ্বংসলীলা হইতে ও দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে অনেককে রক্ষা করিয়াছেন।

আমাদের রাড়ুলী অঞ্চলে যাহাতে শিক্ষাবিস্তার হয় সে উদ্দেশ্যে এডুকেশন সোসাইটীর হাতে ১০,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। স্কুল ও পাঠাগারের জন্য এবং পানীয় জলের অভাব মোচনের জন্য তিনি অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। বৎসর বৎসর কত দুঃস্থ কলেজের ছাত্রকে তিনি বেতন সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। লোকে আদর্শের অনুকরণ করে। আমাদের সম্মুখে তিনি বিরাট জীবিত আদর্শ ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার জীবনের কৃতকার্যতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন — "এক সময় একটি মাত্র কাজে হাত দিবে এবং তাহাই সুসম্পন্ন করিবে—এই একনিষ্ঠা সফলতার কারণ।"

আচার্যদেব ১৮৮২ সালে আগষ্ট মাসে কালিফোর্নিয়া নামক জাহাজে বিলাতে যাত্রা করেন। ডাক্তার পি. কে. রায় মহোদয়ের ভ্রাতা ডাক্তার ডি. এন. রায় (দ্বারকানাথ রায়) চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তাঁহার সহযাত্রী হইয়া বিলাত যান। প্রফুল্লচন্দ্র বিলাতে গিয়া প্রথমে লণ্ডনে, পরে এডিনবরাতে অবস্থান করেন। ১৮৮৮ সালে আগষ্ট মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৯ সালে জুন মাসে মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে সুবিখ্যাত টনি সাহেব প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ এবং আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার (যিনি পরে স্যার হইয়াছিলেন) রসায়নশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র যখন কর্মপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তখন ক্রফ্‌ট সাহেব শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর। তিনি এই সময়ে দার্জিলিং-এ ছিলেন। ২৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্র মনের দুঃখে দার্জিলিং-এ ডিরেক্টর সাহেবের নিকট ছুটিয়া যান। কিন্তু ডিরেক্টর সাহেব তাঁহার আবেদন সমবেদনার সহিত গ্রহণ না করিয়া বরঞ্চ একটু তীব্রভাবই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ সালে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট ডাঃ রায়কে বিলাত পাঠান প্রধান প্রধান রসায়নাগার পরিদর্শনের জন্য। ১৯০৪ সালের বর্ষাকালে ৬ মাসের জন্য এবং ১৯১২ সালে ৩-৪ মাসের জন্য ডাঃ রায় বিলাত যান লণ্ডন নগরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহাসম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে। ১৯২০ সালে ৬ মাসের জন্য এবং ১৯২৬ সালে ২-৩ মাসের জন্য আবার তিনি বিলাত যান।

বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা আচার্যদেবের প্রধান কীর্তি। নিজ খরচা বাদে ৮০০ টাকা বাঁচাইয়া তাহার দ্বারা ১৮৯২ সালে তিনি ইহার পত্তন করেন। দেশীয় গাছগাছড়ায় সস্তাদামে ঔষধ প্রস্তুত করা যায়, ইহা তিনি এই কারখানা স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছেন। এখানে সহস্র সহস্র শিক্ষিত লোক, বহু সহস্র মুটে, মজুর, গাড়োয়ান ইত্যাদি কার্য করিয়া অন্নসংস্থান করিতেছে। ব্যবসায়ে এত সফলতা লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহার কাছে কেউ যদি চাকরীর উমেদারী করিত তিনি বলিতেন ব্যবসা কর না কেন? বঙ্গীয় সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি স্থাপন করিয়া ইনি আর একটি কীর্তি রাখিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন ইত্যাদি আপদে কত লোক যে সাহায্য পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

যখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর উত্তীর্ণ হয়, তাঁহার সম্বন্ধে কাগজে দেখি :— "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের সপ্ততি বর্ষ উত্তীর্ণ হইল। রসায়নশাস্ত্রের শিক্ষকরূপে, রাসায়নিক গবেষণার অগ্রদূতরূপে মানবতার হিতার্থী হিসাবে, জাতির কল্যাণকামীরূপে, চরখার পুনঃপ্রবর্তনের প্রধান প্রচারকরূপে, তাঁহার খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বালকের ন্যায় সদাপ্রফুল্ল। যে বেঙ্গল কেমিক্যালের বর্তমান মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা, তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। অতি অল্প মূলধন লইয়া ইহা আরম্ভ করিবার সাহস এবং ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির স্বপ্ন তিনিই প্রথম পোষণ করিয়াছিলেন।"

উত্তরবঙ্গের জলপ্লাবনজনিত দুর্ভিক্ষের সময় আর্তসেবায় শারীরিক ক্লেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তিনি অবিশ্রাম গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেবাকার্যে পরিদর্শন ও সুষ্ঠুভাবে এই কার্যের পরিচালনার ভার স্বীয় স্কন্ধে বহন করিতে তিনি এতটুকু ক্লেশ বোধ করেন নাই।

প্রফুল্লচন্দ্র ব্যবসায়ী নন। তিনি আজীবন বিজ্ঞানের উপাসক। অনেক ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন লোক অনেক সময় কারবার দাঁড় করাইতে সক্ষম হন না; আর তিনি রসায়নের সেবা করিয়াও বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানাটি সুন্দররূপে খাড়া করিয়াছেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই কারবার অতি অল্প মূলধন লইয়া আরম্ভ করা হয়।

আচার্যদেবের প্রিয় ছাত্র ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ডাঃ প্রফুল্লকুমার মিত্র, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ সেন, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, ডাঃ রসিকলাল দত্ত, ডাঃ বিমানবিহারী দে প্রভৃতি নানা মৌলিক প্রবন্ধে আপন আপন কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯১৬ সালে প্রফুল্লচন্দ্র সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে বিজ্ঞানচর্চার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ হাজার টাকা দান করেন।

৬০ বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে পত্র দেন :— "আমার জীবনের বাকী দিনগুলি বিজ্ঞানমন্দিরের পরীক্ষাগারে কাটাইয়া দিতে খুবই ইচ্ছা করি, কিন্তু এই কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে আর পারিশ্রমিক লইতে আমি অক্ষম। সেই জন্য আমার নিবেদন যে পালিত অধ্যাপকের প্রাপ্য মাসিক এক হাজার টাকা আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যার্পণ করিতেছি, যাহাতে এই টাকা বিজ্ঞান মন্দিরের রাসায়নিক বিভাগে ব্যয় হইতে পারে।"

বাঙ্গালী তথা ভারতকে যাঁহারা বিশ্বের দরবারে পরিচিত করিয়াছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদে অন্যতম—একথা আজ বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। আচার্য রায় যদি শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজ উচ্চ আসন লইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন, তবুও তিনি দেশবাসীর চিত্তে অমর হইয়া থাকিতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ পাত্র ছিলেন না। তাঁহার বিশাল হৃদয়ে দেশবাসীর প্রতিটি প্রয়োজনীয় কথা স্থান পাইত। তিনি দেখিয়াছিলেন, সংসারে উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির তিরোধানে কত সংসার ভাঙ্গিয়া যায়, কত বিধবা ও অনাথ শিশু অসীম দুর্দশায় নিপতিত হয়। আর শুধু তাই বা কেন, দেশের বেশীর ভাগই কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া দেখে যে তাহাদের সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে কিছুই নাই। অনশনের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। অথচ এই দুর্দিনে সমস্যার সমাধান হইতে পারে জীবনবীমার সাহায্যে। তাই তিনি নিজে অগ্রণী হইয়া দেশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে লইয়া———আর্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী গঠন করেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের প্রণীত "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" নামক গ্রন্থ ভারতবাসীর অতি গৌরবের সামগ্রী। ইহার ১ম খণ্ড ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হিন্দু আয়ুর্বেদ, চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ট, শার্ঙ্গধর ও চক্রপাণি, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান শাস্ত্র, ইতিহাস, কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিয়া এই অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইয়াছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত গ্রন্থের ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন—১৩৫১ সালের ২রা আষাঢ় এই মহাপুরুষ সাধনোচিত ধামে গমন করেন। আমাদের সান্ত্বনা এই যে, মানবজীবনে সৎকার্য সম্পাদনদ্বারা যতদূর যশোলাভ হইতে পারে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পূর্ণমাত্রায় তাহার অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। যদি "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই মহাজন বাক্যে অণুমাত্র সত্য থাকে তাহা হইলে তিনি মরিয়াও জীবিত আছেন।

আচার্য-প্রশস্তি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মেছিলেন কপোতাক্ষ নদের ধারে রাড়ুলী গ্রামে। কিছু দূরে একই নদের উপর সাগরদাঁড়ি গ্রামে মহাকবি মধুসূদনের জন্মভূমি। নতুন আমলে বাঙালীর এই দুই তীর্থস্থানই এখন পূর্বপাকিস্থানে।

স্বাবলম্বন, দেশপ্রীতি ও বিজ্ঞানে অটুট অনুরাগ, আচার্যের সারা জীবনের গতি নির্ণয় করেছে। পিতা হরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠান। ভাগ্যবিপর্যয়ের দরুণ তার উপযুক্ত অর্থ জোগাড় করা সম্ভব হল না। তখন দুইটি বিদেশী ভাষা নিজের চেষ্টায় আয়ত্ব করে গিলক্রিষ্ট প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র বিদেশে শিক্ষার পাথেয় স্বয়ং সংগ্রহ করলেন। বহুবৎসর পরিশ্রমের পর রসায়নশাস্ত্রে ডক্টর উপাধি নিয়ে যখন দেশে ফিরলেন, তখন সরকারী শিক্ষকমণ্ডলীর উচ্চতম বিভাগে প্রবেশ করতে পারলেন না। তবু প্রেসিডেন্সী কলেজেই যোগ দিলেন— এডিনবরা থেকে গবেষণার নেশা ধরে গিয়েছিল। ভাবলেন প্রাদেশিক বিভাগের শিক্ষকেরও গবেষণার সুযোগ মিলবে।

সেইদিনে বিদেশী মালে দেশ ছেয়ে ছিল। ঔষধ-পত্র কাপড়-চোপড়, কাঁচের বাসন, এমন কি ছুঁচটি পর্যন্ত বাহির থেকে আমদানী হত। নিত্যব্যবহার্য জিনিসের জন্য দেশ যে তখন পরমুখাপেক্ষী, স্বাবলম্বী প্রফুল্লচন্দ্র এটি বরদাস্ত করতে পারতেন না। জীবনে কলকাতার খরচ মিটিয়ে তাঁর উপার্জনের অল্পই উদ্বৃত্ত থাকতো—কিন্তু সেই সম্বল নিয়েই তিনি নেমে পড়লেন রাসায়নিক কারবার গড়ে তুলতে। 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' তাঁর সেই অসম-সাহস, দৃঢ়-সংকল্প ও অক্লান্ত চেষ্টার উজ্জ্বল স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে।

প্রথম অবস্থায় যখন লোকসানের অঙ্কেই খাতা ভরে উঠত প্রফুল্লচন্দ্র তখন কারবারে নিজের পুঁজি অকাতরে ব্যয় করতেন শিশু প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে। পরে যখন প্রতিষ্ঠা এলো, দেশের লোক তাঁর মাল খরিদ করতে লাগল—আয় বাড়তে শুরু হল—তখন পয়সার মোহে না মেতে ব্যবসার ভার তাঁর কৃতী ছাত্রদের উপর দিলেন—দরদী ধনিকেরা নিয়ন্ত্রণের হাল ধরলেন। ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের জুটল সম্মান, যশ ও অর্থ। নির্লোভ বিজ্ঞানী কিন্তু তখনও কলেজের কর্মশালায় ব্যস্ত রইলেন— গবেষণার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সমাধান করতে। শিক্ষকের সকল কাজই তিনি রীতিমত চালিয়ে গেলেন।

তিনি চেয়েছিলেন দেশে বিজ্ঞানের যুগ ফিরিয়ে আনতে। মৌলিক অনুসন্ধানে আলকেমী বিদ্যায় ভেষজতত্ত্বে ভারতীয়েরা একসময় সভ্যজগতে অগ্রণী হয়েছিল। পুরনো পুঁথি ঘেঁটে বহু পরিশ্রমে তার ইতিহাস তিনি বিস্মৃতির গহ্বর থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর লিখিত প্রাচীনকালে হিন্দুদের রসায়নশাস্ত্রের কথা বিশ্বের বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি গৌরবময় স্থান দখল করে রয়েছে। পুরাকালে পর্যবেক্ষণে পরীক্ষায় নিপুণতায় হিন্দুবিজ্ঞানী অন্যদেশীয়দের থেকে হীন ছিলেন না—

তার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করে আচার্য আমাদের সকলের আত্মসম্মানজ্ঞান জাগিয়েছেন— ভারতীয়ের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন।

বর্তমানকালে, শিল্পে ও বিজ্ঞানে ভারত যেন পাশ্চাত্য দেশের সমকক্ষ হয়ে ওঠে এই ছিল তাঁর সাধের স্বপ্ন। বহুশতাব্দীর দাসত্বের ফলে দেশ থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রায় লোপ পেয়েছিল, এখন তাঁরই সারাজীবনের পরিশ্রমে বিজ্ঞানচর্চা জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। রাসায়নিক গবেষণার তিনিই প্রধান পথিকৃৎ। তাঁই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরই কাছে শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে আজ বহু ভারতীয় নানাক্ষেত্রে যশ অর্জন করেছে। শেষ জীবনে এই—ই ছিল আচার্যের গর্বের কথা। তাঁরই ছাত্রেরা দেশ বিদেশে সম্বর্ধনা পাচ্ছে— তার খবর অনেক আড়ম্বর করে তিনি এ-দেশের কাগজে প্রকাশ করতেন।

দেশে ফিরে কাজ সুরু করার চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যেই মারকিউরস নাইট্রাইটের আবিষ্কার হ'ল। কর্মশালায় প্রফুল্লচন্দ্র তখন একা কাজ করছেন। আস্তে আস্তে দু'একটি ছাত্র জুটতে লাগলো। তারাও ওঁর কাছে গবেষণার পদ্ধতি শিখলে— কিন্তু বেশীদিন এই কাজে ভুলে থাকতে পারতো না— নিজেদের সাংসারিক দায়িত্ব, একা অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় অন্যত্র চলে যেতে হ'ত। সে যুগে মৌলিক গবেষণার দায়িত্ব ছিল একমাত্র শিক্ষকের। কলেজের কর্তৃপক্ষের মন সে দিকে ছিল না। তা ছাড়া ডাঃ রায় তখন পর্যন্ত বিভাগের পরিচালনার সমস্ত ভার নিজের হাতে পাননি। মাথার উপর কর্তা ছিলেন ইংরাজ— আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁরা অনেক সময় আচার্যকে সুযোগ জুগিয়ে দিতেন।

ডাঃ রায়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এই সময়ে তাঁকে মাতিয়ে রেখেছিল। এর ফলে তাঁর সুখ্যাতি যখন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো তখন সরকারও তাঁকে মৌলিক গবেষণার সুযোগ দিতে সুরু করলেন। ১৯০৪ সালে সরকারের পয়সায় প্রথম বিদেশ ভ্রমণে গেলেন। ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স— সর্বত্র নানা গবেষণার ধারা দেখে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নানা বিজ্ঞানীর প্রশংসা নিয়ে ফিরে এসে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ সুরু করলেন। এবার সরস্বতী দেবী সাধনায় প্রসন্না হয়েছেন। দেশের আবহাওয়াও তখন বদলেছে। স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়েছে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাচ্ছে বাঙালী সকল বিষয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অনেক নতুন ব্যবস্থা করেছেন। দেশসেবার আদর্শ সামনে রেখে বহু ছাত্র এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালো। গবেষণার ক্ষেত্র প্রচুর বিস্তৃতি লাভ করল। এদিকে তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ প্রচুর অর্থদান করলেন বিশ্ববিদ্যালয়কে। স্যার আশুতোষের চেষ্টায় সায়েন্স কলেজ স্থাপিত হ'ল। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে ডাঃ রায় রসায়ন বিভাগের ভার নিলেন ৯২, আপার সার্কুলার রোডে। সায়েন্স কলেজেই থাকতেন দিনরাত। কর্মজীবন আরও ১৫ বৎসর চলল। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর যে মাহিনা বরাদ্দ করেছিল তাঁদের তহবিলে তা জমতে লাগল, এর এক পয়সাও নিজের জন্য তিনি খরচ করেন নি। শেষ কালে ১৫ বৎসরের সঞ্চিত সব টাকা খরচ হল রসায়ন বিভাগে স্যার পি. সি. রায় ফেলোশিপ সৃষ্টি করতে।

দেশের দুঃখে আচার্যের প্রাণ কাঁদত। যখন সরকারের চাকরী ছাড়লেন, দেশহিতকর নানা কাজে অগ্রণী হতে আর কোনও বাধা রইল না। তাই বন্যার প্লাবনের সময় গড়লেন সঙ্কটত্রাণ সমিতি——— তাঁর ডাকে হাজার হাজার স্বেচ্ছাকর্মী এগিয়ে এল দুঃস্থদের সাহায্য করতে। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতাবর্জন ও খদ্দর ব্যবহারের আন্দোলন সুরু করলে——— আচার্য রায় এই কাজ মাথায় করে নিলেন। দেশসেবার এইকাজ তাঁর শেষ জীবনের ব্রত হলো। নিজের সুখবিধার কথা না ভেবে, ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে———তিনি ঘুরতেন দেশ-বিদেশে-স্বাদেশিকতার মন্ত্র প্রচার করতে।

অকৃতদার, শুদ্ধচরিত্র আচার্যের ছাত্ররাই ছিল নিকট-পরিবারবর্গ। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁর আশ্রয়ে সাহায্য পেয়ে পড়াশুনা করেছে। তাঁর স্নেহ যে শুধু শান্তশিষ্ট পড়ায় মনোযোগী ছাত্রদের জন্যই বারত। তা নয়-অশান্ত, অসমসাহসী-অনেক বিপ্লবী-যারা সে যুগে সর্বস্ব পণ করে দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিল—তাদের অনেকে তাঁর কাছে পেত সহানুভূতি ও গোপনে সাহায্য, তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি তারাও—এরূপ জনপ্রসিদ্ধি আছে। আজকে তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত এবিষয়ে নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারেন। ভারতে বিজ্ঞানের যুগ প্রবর্তনের জন্য, দেশী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য আচার্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই মহৎ দান যে কতটা ফলপ্রসূ হ'ল দেশের ভবিষ্যতের ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে।

নানাস্থানে ও নানা সময়ে আচার্যদেব পথনির্দেশছলে অনেক কথা বলে গেছেন—সংগৃহীত আচার্যবাণী তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। আবার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি নিজেই আত্মচরিতে লিখে গেছেন। যাঁরা অনুরাগী—যাঁরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান তাঁদের এগুলি পড়তে অনুরোধ করি।

১৯৪৪—এর ১৫ই জুন আচার্যের তিরোভাব ঘটলো। দেশে এরই মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ভারত আজ স্বাধীন —তবে তাঁর নিজের জন্মভূমি পূর্ব—পাকিস্তানে। দেশের উন্নতি করবার কাজে দৃঢ়সংকল্প করে তাঁর ছাত্রদের এগিয়ে যেতে তিনি অনুরোধ করে গেছেন। তাঁর নির্দিষ্ট কাজগুলি এখনও শেষ হয়নি। ছাত্ররা হয়ত এবার শতবর্ষপূর্তির দিনে বলবে কতটুকু এতদিনে করা সম্ভব হল। পুণ্যচরিত আচার্যদেবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করলাম।

আচার্য—বাণী

আমাকে যদি কেউ একদিনের জন্যও কলকাতার সর্বময় কর্তা করে, তবে ল'কলেজটিকে আগে ভূমিস্যাৎ করি। অন্ততঃ দশ বছরের জন্য আইন পড়া উঠিয়ে দিই।

— প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রফুল্লচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য

শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী, ডি.এস.সি.

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী, ভারতে রাসায়নিক গোষ্ঠীর সৃষ্টিকর্তা, বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সকলের নিকটই সুপরিচিত। ১৯২৪ সালে এম.এস.সি পড়িবার সময়ে আচার্যদেবের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, তদবধি তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার অমায়িকতার, তাঁহার জ্ঞান মহিমায় এবং সর্বোপরি তাঁহার চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হইয়াছি। ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শিক্ষাগুরু প্রফুল্লচন্দ্র আদর্শস্থানীয়। প্রাচ্য-সংস্কৃতির প্রতীক প্রফুল্লচন্দ্র পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষালাভ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াও আর্য্য ঋষিগণের মাহাত্ম্য সম্যকন উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রাচীন গুরুর আশ্রমের পুনঃ প্রবর্তন তিনি করিয়াছিলেন। আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিয়া প্রাণাধিক শিষ্যগণের সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে বিজ্ঞানচর্চা তপস্যা—অনন্যমনা হইয়া একান্তচিত্তে সাধনা না করিলে উচ্চাঙ্গের গবেষণা হইতে পারে না, তাই প্রিয় শিষ্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরীক্ষাগারে জীবনের সায়াহ্নেও জরাজীর্ণদেহ পলিতকেশ প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা দেখিয়া উৎসাহ লাভ করিয়াছি। তাঁহার উপস্থিতি, তাঁহার উৎসাহবাণী ও মৃদু ভর্ৎসনা এবং মাঝে মাঝে উপহাস তরুণ গবেষককে সর্বদাই অনুপ্রাণিত করিয়াছে। অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি কোনও গবেষকের ভাল কাজ হইলে প্রফুল্লচন্দ্র পিতার মত সস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন এবং অন্যান্যের নিকট তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞান কলেজে এই দৃশ্য অনেকেরই চক্ষে পড়িয়াছে। তিনি প্রায়ই বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীগণের জীবনের ঘটনা আলোচনা করিয়া-তাঁহাদের আবিষ্কারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া তরুণ ছাত্রগণের মধ্যে গবেষণাস্পৃহা জাগাইয়া তুলিতেন এবং বর্তমান সময়ে কোনওরূপ অসুবিধার কথা উল্লেখ করিলেই তিনি তাঁহার প্রথম জীবনের ইতিহাস বিবৃত করিতেন এবং কিরূপ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে—নানারূপ আধুনিক সাজসরঞ্জামের অভাবসত্ত্বেও তাঁহাকে গবেষণা করিতে হইয়াছে তাহা বলিতেন। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা ছিল শতমুখী, বিজ্ঞানচর্চার মধ্যেও তিনি প্রসঙ্গক্রমে দেশের কথা, ব্যবসার কথা অর্থনীতির কথা, সমাজসংস্কারের কথা এবং নানাবিষয়ে আলোচনা করিয়া ছাত্রগণকে দেশমাতৃকার আহ্বানে সাড়া দিতে আমন্ত্রণ করিতেন। মেধাবী গবেষককে অনেক সময়েই তিনি উপহাসচ্ছলে বলিতেন 'তুই একচোখা, কূপমণ্ডুক, কেবল লেখাপড়া, মাড়োয়ারী ভাটিয়াদের মত তোদের ব্যবসা শেখা উচিৎ।' অনেক সময়েই তিনি বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিতেন এবং বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীজীবী পরনির্ভর না হইয়া স্বাবলম্বী হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারে সে বিষয়ে বলিতেন। তিনি বাঙ্গালীর যেমন প্রশংসা করিতেন তাহার বুদ্ধির

জন্য, মেধার জন্য, তাহার চরিত্রবলের জন্য, আবার রুগ্নশীর্ণ বাঙ্গালী ছাত্রকে দেখিলেই তিনি তাহাকে সজোরে আঘাত করিয়া দুর্বল শরীরের জন্য, নিরন্নতার জন্য, অর্থহীনতার জন্য বাঙ্গালী জাতির নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিতেন। কোনও ছাত্রকে বিলাসিতা কিংবা বাবুয়ানী করিতে দেখিলে তিনি ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে লজ্জা দিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। মহাপুরুষ প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল অনাড়ম্বর ভাবে জীবনযাত্রা প্রণালী। সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াও প্রফুল্লচন্দ্র কমলার আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন। তথাপি তিনি আর্য্যঋষিগণের আদর্শে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থেরই মত তিনি থাকিতেন এবং তাঁহার আচার-ব্যবহারে কখনই তাঁহার অর্থশালীতার পরিচয় পাওয়া যাইত না। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য কোনওরূপ ব্যয়বাহুল্য তাঁহার ছিলনা। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে না মিশিলে আমরা কল্পনাই করিতে পারিতাম না যে তাঁহার দৈনন্দিন জীবন এত অনাড়ম্বর। এই অশীতিপর মহাপুরুষ মৃত্যুর ২/৩ বৎসর পূর্বেও নিজের বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া নিজেই তাহা রৌদ্রে শুকাইতে দিতেন। নিজের কাজ নিজে করিবেন এইজন্য তিনি মোটেই দ্বিধা বোধ করিতেন না এবং সেজন্য পরমুখাপেক্ষী হন নাই। তাঁহার কক্ষ ছিল একাধারে শয়নপ্রকোষ্ঠ, বিশ্রামাগার, পড়িবার ঘর এবং আহারের স্থান। কোন উজ্জ্বল আসবাবপত্র তাঁহার গৃহে শোভা পাইত না এবং মহাযোগীর মতই তিনি এই কক্ষে বসবাস করিতেন। তাঁহাকে পরিচ্ছদের তারতম্য করিতে দেখা যায় নাই——— ক্রোড়পতি মহাজনগণ, উর্ধ্বতন রাজকর্মচারিগণ এবং রাজপ্রতিনিধিগণ তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইলেও তিনি সাধারণবেশে তাঁহাদের সহিত দেখা করিতেন। বিজ্ঞানকলেজের বারান্দায় হয়ত আচার্যদেব সাধারণবেশে পায়চারী করিতেছেন এবং তাঁহাকেই আসিয়া দর্শনার্থী কেহ সার্ পি সি রায় কোথায় আছেন এবং তাঁহার সহিত দেখা হইবে কিনা ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—— এইরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। যাহারা না জানিত তাঁহার এই বেশে তাঁহাকে চিনিতে না পারা বিচিত্র নহে। এমন ঘটনাও শুনা যায় সে জনবহুল সভার তোরণদ্বারে প্রফুল্লচন্দ্রকে চিনিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাকে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিতে বাধা দিয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্রের এই অনাড়ম্বর জীবন——তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং তাঁহার বালকসুলভ সরলতা তাঁহাকে সাধারণ মানব হইতে অনেক উচ্চে আসন প্রদান করিয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে অর্থে বীতস্পৃহতা। তিনি অর্থোপার্জন করিয়াছেন নিজের সুখের জন্য নহে—— নিজের ভোগ বিলাসের জন্য নহে। নিরন্নকে অন্নদান, আর্তের দুঃখমোচন, শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাহায্য প্রভৃতির জন্য তিনি তাঁহার কোষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অর্থলালসা কিংবা অর্থসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ ছিল না। তাঁহার সমস্ত অর্থই তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন এবং আমরা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি যে অর্থকে তিনি নিতান্তই ভারস্বরূপ মনে করিতেন। তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন তাঁহার ব্যাঙ্কের খাতায় কতটাকা জমিয়াছে এবং যখনই শুনিতে পাইতেন ৪০০/৫০০ জমিয়াছে সেই টাকা দান না করিলে যেন তিনি অস্বস্তি বোধ করিতেন এবং সেই শুভমুহূর্তে যদি কোনও প্রার্থী আসিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিত, তখনই তিনি সঞ্চিত টাকার চেক্ কাটিয়া দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেন

এবং এমন অনেক সময় ঘটিয়াছে যে তাঁহার ব্যাঙ্কের হিসাবে মাত্র ১০/১৫ টাকা রহিয়াছে। শেষজীবনেও যখন পেন্সনের টাকা মাত্র তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল তখনও তিনি সংসার খরচের অতিরিক্ত টাকা দান করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগ সত্যই অতুলনীয়।

নিয়মানুবর্তিতা ও সময়নিষ্ঠা প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই উদ্যোগী পুরুষসিংহের প্রাত্যহিক জীবন ছিল ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত, কর্মবহুলতার মধ্যেও নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যের ব্যতিক্রম কোন সময়েই হইত না। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, অধ্যয়ন, দর্শনার্থীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার তাঁহার নির্দিষ্ট সময় ছিল এবং জীবন এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়াই তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আজীবন জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রের ন্যায় প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে নিয়মমত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন—অধ্যয়ন তাঁহার নিকট ছিল যোগসাধনা এবং কোনও কারণে এই যোগভঙ্গ হইলে তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন এবং রুষ্ট হইতেন। শেষজীবনেও দৃষ্টিশক্তির হীনতা হইলে তিনি এই জ্ঞানচর্চা পরিত্যাগ করেন নাই— কোনও ছাত্র আসিয়া নিয়মিতভাবে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিত এবং তিনি একান্তচিত্তে যোগীর মত উহা শুনিতেন। তিনি নিজেকে ছাত্র বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন।

ভারতবর্ষ: শ্রাবণ ১৩৫১।

"Acharya Ray one of the giants of old, and more, particularly, he was a shinning light in the field of Science. His frail figure, his ardent patriotism, his scholarship and his simplicity, impressed me greatly in my youth."

— Jawaharlal Nehru.

প্রফুল্ল-প্রয়াণে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চির প্রফুল্ল স্বর্ণ কমল
মুদিত হলো রে আজ
যায় বিজ্ঞান ভিক্ষু মোদের
জ্ঞানের রাজাধিরাজ।
যে রাসায়নিক জানিত রে যাদু
বদ্‌লিয়ে দিলে বাঙালীর ধাতু,
জাতিকে করিল সুপ্রতিষ্ঠ
বিপুল ধরণী মাঝ।

আজি তার মহাপ্রস্থান পথে
জোরে বল্ হরিবল্,
লক্ষ বুকের আলোকমালায়
রোশনাই করে চল।

ছড়া রে দুহাতে ফুল, খই, কড়ি,
লয়ে চল্ সব গৌরব করি,
বুক ভরা থাক্ আশা উৎসাহ,
চোখ ভরা থাক্ জল।

মৌশুমী বায়ু এ চিতার ধূম।
সবটুকু লহ ভাই,
প্রতিভার বীজ দেশেতে ছড়াও
সোনার ফসল চাই।
বাঙ্‌লা এবং ভারতের মান
বাঙ্‌লা এবং ভারতের দান
বিশ্বে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হউক
তাঁর যে কাম্য ভাই।

ভারতবর্ষ: শ্রাবণ ১৩৫১।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

অধ্যাপক হিসাবে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন ক'রে গেছেন, প্রফুল্লচন্দ্র তাঁদেরই একজন। বিজ্ঞানজগতে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন রসায়নবিজ্ঞানের গবেষণায় এবং হিন্দু রসায়নের ইতিহাস রচনায়। ভারতবর্ষে আধুনিক রসায়নচর্চার আদিগুরু বা প্রবর্তক হিসাবে, এবং রাসায়নিক শিল্পের প্রথম উদ্যোক্তা হিসাবে তাঁর নাম আজ আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। কিন্তু তাঁর এসব কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে উঠেছে তাঁর বিরাট মনুষ্যত্বের আদর্শ—তাঁর ত্যাগ ও সেবার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের জ্ঞান ও গুণের গরিমায়, কর্মের মহিমায় এবং চরিত্রের মহত্ত্বে আধুনিক বাংলার ভিত্তি পত্তন করে গেছেন, প্রফুল্লচন্দ্রের স্থান হচ্ছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তাঁদের সঙ্গে একাসনে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের মহান আদর্শ যাতে বর্তমান ছাত্রছাত্রীবৃন্দের জীবনকে উদ্বুদ্ধ ও প্রণোদিত করে তুলতে পারে, সেই আশাতেই এ রচনায় অগ্রসর হয়েছি।

মানুষের সমাজে যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করে বড় বলে গণ্য হন, তাঁদের চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এ শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তি হচ্ছে যথাক্রমে অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারে, কর্মের মহিমায়, জ্ঞানের গরিমায় এবং চরিত্রের মহত্ত্বে। কিন্তু এসব শ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন বলে গণ্য করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এদের মধ্যে অল্প বিস্তর পরস্পর মিশ্রণ দেখা যায়। অর্থাৎ যাঁরা সে ধনী ক্ষেত্রে এদের মধ্যে কখন কখন কর্মী, জ্ঞানী বা চরিত্রবান লোক দেখতে পাওয়া যায়। অর্থের বা ক্ষমতার অধিকারী হলেই লোক সকল ক্ষেত্রে চরিত্রহীন, অলস বা মূর্খ হয় না। অথবা কর্মী জ্ঞানী বা চরিত্রবান হলেই লোক সব সময়ে গরীব হয় না। তথাপি সাধারণতঃ এরূপ শ্রেণী-বিভাগ করে পরস্পরের তুলনা করা সহজ।

সমাজে যাঁরা শুধু অর্থের বা ক্ষমতার জোরে বড়, তাঁদের মনুষ্যত্বের নিদর্শন, রেল বা স্টীমার যাত্রীর মালের গায়ে লেবেলের মত রাশিকৃত সোনারূপার বা জমিজমার উপর ঝুলতে থাকে। সাধারণ লোক এদের বাহ্যিক সম্মান দেখায় অবস্থা বিশেষে স্বার্থের খাতিরে, নির্যাতনের আশংকায় অথবা ঐশ্বর্য্যের মোহ এবং দীপ্তিতে। এরূপ সম্মানে বিস্ময় থাকতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধা থাকে না। এঁদের মৃত্যুতে আমরা এঁদের বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা জানতেই সাধারণতঃ উৎসুক হই, আসল মানুষটি সম্বন্ধে হই সম্পূর্ণ উদাসীন। মানুষের ইতিহাসে এঁদের কোন স্থান নেই ; কেননা জীবিকা অর্জন ও স্বার্থের আহরণে যাঁদের জীবন কাটে, তা হতে ইতিহাসের কোন মালমসলা উদ্ধার করা চলে না।

ইতিহাসের মালমসলা আসে অপর তিন শ্রেণীর বড় লোকের জীবনী হতে। যাঁরা নিজের কর্মের মহিমায়, জ্ঞানের গরিমায় বা চরিত্রের মহত্ত্বে সমাজকে নূতন গঠন দিয়ে যান, নূতন জ্ঞানের

আলোকে মনের অন্ধকার দূরীভূত করেন, অথবা ত্যাগ ও সেবার আদর্শে মানুষের হৃদয় জয় করেন ; ইতিহাস গড়ে ওঠে তাঁদেরই অবদান নিয়ে।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে এ তিনেরই অপূর্ব সমাবেশ আমরা দেখতে পাই।

গোড়াতেই বলতে হয় প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনযাত্রার আদর্শ ও আমাদের জীবনযাত্রার আদর্শের মধ্যে বিস্তৃত ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক জীবনযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ একমাত্র জীবিকার্জন। এ জীবিকার্জনের প্রচেষ্টায় আমরা সারাজীবন অর্থের আহরণে করি অশ্রান্তভাবে ছুটোছুটি, এবং সে জন্য যে সব পন্থা আমরা অনেক সময় অনুসরণ করি, তা আধুনিক অর্থনীতির অনুমোদিত হলেও ধর্মনীতির অনুযায়ী হয় না। জীবনযাত্রার আদর্শকে উন্নত করবার অছিলায় আমরা আমাদের প্রয়োজনের সীমাকে তুলেছি অনবরত অসংযতভাবে বাড়িয়ে। ফলে আমাদের স্বার্থবুদ্ধি উঠছে ক্রমশঃ প্রবল হয়ে। এতেই ঘটেছে আজ সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষের স্বার্থে স্বার্থে ভীষণ সংঘাত, আর লোভে লোভে কঠোর সংগ্রাম, এবং দেশে দেশে জেগে উঠছে এক আসুরিক শক্তির নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর আস্ফালন। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের আদর্শ ছিল এ হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিপরীত। আপন প্রয়োজন ও স্বার্থবুদ্ধিকে রেখেছিলেন তিনি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ; এবং তাঁর ধর্মবুদ্ধিকে করেছিলেন এর প্রহরী। নিজের স্বার্থকে তিনি বিলীন করে দিয়েছিলেন সাধারণের স্বার্থে ; তাতে তাঁর স্বার্থের পরিণতি ঘটেছিল পরার্থে। কেননা, সকলের মধ্যে তিনি দেখতেন আপনাকে, এবং নিজের মধ্যে দেখতেন সবাইকে। গীতার কথায় বলা যায় তিনি ছিলেন যোগযুক্তাত্মা ও সমদর্শী।

> ''সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি,
> ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥''

নিজের সুখসুবিধার জন্য সামান্য মাত্র ব্যয়েও তাই তিনি কুণ্ঠিত হতেন বা কৃপণতার পরিচয় দিতেন ; অথচ পরের সাহায্যে ছিলেন মুক্তহস্ত। নিজের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় মাত্রকেই তিনি মনে করতেন দরিদ্রকে বঞ্চনা বা চুরির সামিল। ত্যাগেই ছিল তাঁর ভোগের আনন্দ ; যাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, ''তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ''। সংসারের লাভ ক্ষতি টানা-টানি ও ভাগাভাগি যা নিয়ে আমরা রাতদিন ব্যস্ত থাকি, তিনি থাকতেন এ সবার উপরে। এ শ্রেণীর যাঁরা বড়লোক, মানব সভ্যতার হিসাব নিকাশের তালিকায় এঁরাই হন একমাত্র পরিসম্পৎ। কেননা, সমাজ হতে যা তাঁরা নিজের জন্য গ্রহণ করেন, তার বিনিময়ে তার সহস্রগুণ ফিরিয়ে দেন সমাজকে, তাঁদের ত্যাগে, সেবায় ও জ্ঞানের বিতরণে। এ কারণে আমরা তাঁদের শুধু সম্মান করি না, পরন্তু শ্রদ্ধা করি এবং ভালবাসি। তাঁরা করেন আমাদের হৃদয় জয়।

প্রফুল্লচন্দ্রের নিজের সম্পর্কে অসাধারণ ব্যয়কুণ্ঠা এবং পরের জন্য অকাতর ত্যাগের অপরূপ উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যায়। বিজ্ঞান কলেজে যখন তিনি পালিত অধ্যাপক তখন ঐ কলেজের দোতলায় দক্ষিণ পার্শ্বের কোণার ঘরটি ছিল একাধারে তাঁর পড়বার,

শোবার এবং খাবার ঘর। দারুণ গ্রীষ্মেও এ ঘরে কোন বৈদ্যুতিক পাখা আমরা দেখিনি। কলেজের অনেক গরীব ছাত্র থাকত তাঁর সঙ্গে, এবং তাঁরই খরচে করত পড়াশুনা। এঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনদীয়াবিহারী অধিকারী। ইনি এখন বেঙ্গল কেমিকেল এন্ড ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কসের একজন ম্যানেজার। নদীয়াবাবুর উপর ছিল তাঁর গৃহস্থালী ও জমা খরচের হিসাব রাখার ভার। নিয়ম ছিল, আচার্যদেবের জন্য প্রত্যহ আসবে দু'পয়সার চাঁপা কলা। একদিন বাজার হতে নদীয়াবাবু বেশ ভাল সুপুষ্ট দুটি চাঁপা কলা আনলেন কিনে। আচার্যদেব দেখে ভারী খুশী। দাম কত জানতে চাইলেন। নদীয়াবাবু উত্তরে বললেন দু'আনা। শুনেই তিনি গেলেন একেবারে ক্ষেপে, এবং নদীয়াবাবুর চুলের মুঠি ধরে তাঁর পিঠের উপর দিলেন বার কয়েক মুষ্ট্যাঘাত। মন্তব্য হ'ল—নবাবী শিখতে আরম্ভ করেছ! এ ব্যাপার হ'ল সকাল বেলা ৯'টায়। এর ঘণ্টা দুই পরে বেলা এগারটা সাড়ে এগারটায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তার লেবরটরিতে কাজে নিযুক্ত। এমন সময় আসলেন ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ডাঃ ঘোষ তাঁদের অভয় আশ্রমের কাজে খদ্দর প্রচার ও অন্যান্য দেশহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য সাহায্য ও পরামর্শের অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে আচার্যদেবের শরণাপন্ন হতেন। ডাঃ ঘোষ জানালেন কিছু টাকার বিশেষ দরকার। প্রফুল্লচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন "কত ?" উত্তরে ডাক্তার ঘোষ বল্লেন হাজার তিনেক। অমনি ডাক পড়ল হিসাবরক্ষক নদীয়াবাবুর, এবং ব্যাঙ্কের খাতায় কত টাকা জমা আছে দেখবার জন্য আদেশ হ'ল। খাতা দেখে নদীয়াবাবু উত্তর দিলেন তিন হাজার পাঁচ শত। আচার্যদেব বল্লেন চেক বই নিয়ে আয়। বইখানি নিয়ে তিনি অবিলম্বে একখানি তিন হাজার টাকার চেক কেটে দিলেন ডাঃ ঘোষের হাতে। নদীয়াবাবু রইলেন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। কেননা, এই ঘন্টা দুই আগে দু'আনা পয়সার জন্য তিনি যাঁর কাছে খেলেন গাল ও মার, সে লোকটাই এখন বিনা বাক্যব্যয়ে ও বিনা দ্বিধায় দিলেন তিন হাজার টাকার চেক কেটে! ভাবলেন হয়ত, বুড়োর মতিগতি বোঝা ভার।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন শিশুর মত সহজ এবং সরল মানুষ। অন্তরে বাহিরে ছিল তাঁর সম্পূর্ণ মিল। কপটতা বা কৃত্রিমতা ছিল তাঁর হেয়। অর্থ এবং ক্ষমতার প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। এক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের আদর্শ হতে আমাদের আধুনিক সভ্য জীবনের আদর্শের ব্যবধান গেছে গুরুতরভাবে বেড়ে। বর্তমান যুগে সংসারের পথে আমরা সাধারণতঃ চলাফেরা করি নানা রকমের মুখোস পরে বা বহুরূপী সেজে। সাজেগোজে, চাল চলনে, আলাপে পরিচয়ে, নানা ছদ্মবেশে আমরা চাই নিজেকে পরের নিকট বাড়িয়ে তুলতে। তাই আমাদের ভিতরের খাঁটি মানুষটি থাকে সাধারণের কাছে আড়ালে; এবং পোশাকী মানুষটিই করে বেশির ভাগ কাজ কারবার। এ কারণে আধুনিক সভ্যতায় মানুষ হয়েছে সুবিধাবাদী; সত্যের প্রতি তার শ্রদ্ধা গেছে খর্ব হয়ে, এবং মিথ্যার আশ্রয়ে তার প্রাত্যহিক জীবন উঠেছে গড়ে। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মোটা ধুতিচাদর ও জামা ছিল প্রফুল্লচন্দ্রর পোশাক—শেষ বয়সে খদ্দরই ছিল তাঁর একমাত্র অঙ্গভূষণ। প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন অধ্যাপনা করতেন তখন তাঁকে দেখেছি দেশী ময়নামতী ছিটের পায়জামা এবং কোট গায়ে। অ্যাসিড পড়ে সেগুলি যেত আবার স্থানে স্থানে ছিদ্র হয়ে। এর ফলে পথে ঘাটে এবং অনেক সময় সরকারী বৈঠকেও তিনি অভদ্র ব্যবহার পেয়েছেন অযাচিতভাবে। কিন্তু এসব মান অপেক্ষা উপেক্ষা করা বা তা নিয়ে হাস্যপরিহাস

করাই ছিল তাঁর স্বভাব। তিনি ছিলেন সাধারণের লোক এবং সাধারণের দুঃখদৈন্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন আপন দুঃখদৈন্য হিসাবে। তাই দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, ঝড়ে, ভূমিকম্পে, মহামারী বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে যখন কোথায়ও সাধারণ মানুষ হয়েছে, প্রফুল্লচন্দ্র সেখানে অগ্রণী হয়েছেন তাঁদের পরিত্রাণের জন্য। ছোট বড়, ধনী, দরিদ্র, পরিচিত সবার কাছেই তিনি ছিলেন অবারিত দ্বার। নামের বদনাম কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বিজ্ঞানী, রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপনা ও গবেষণায় ছিল তাঁর অসাধারণ খ্যাতি। বিজ্ঞানের তথ্যগুলি বহু যন্ত্র এবং দ্রব্যযোগে পরীক্ষা করে প্রমাণ দেওয়া ছিল তাঁর অধ্যাপনার বিশেষত্ব। এতে ছাত্রদের মনে তিনি জাগিয়ে তুলতেন বিস্ময় এবং কৌতূহল। অন্যদিকে পুরাযুগের বড় বড় বিজ্ঞানীদের জীবনী এবং কীর্তিকলাপ বর্ণনায় বিজ্ঞানের পাঠকে মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলবার ছিল তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। তাঁর অধ্যাপনায় তাই ছাত্রেরা পেত উদ্দীপনা এবং প্রেরণা। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ এবং উৎসাহ। তাঁর রচিত "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে আজ সর্বত্র সুপরিচিত। তিনি মনে করতেন বিজ্ঞানের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান অধ্যয়ন হচ্ছে সবচেয়ে স্বাভাবিক পন্থা। বিজ্ঞানের কোন তথ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভুল জ্ঞানলাভ করতে হলে আগে জানতে হবে, এ তথ্যের আবিষ্কার করল কে এবং কি ভাবে? গাছ না দেখে এবং তার ফুল না দেখে, শুধু তার ফল দেখলে যেমন সে ফলের জ্ঞান হয় অসম্পূর্ণ, সেরূপ বিজ্ঞানের জ্ঞান হয় অপরিপক্ক। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের পরস্পর আচরণের সঙ্গে উপমা দিয়ে তিনি রসায়নের বিবিধ তথ্য এবং তত্ত্বগুলিকে এমন সজীব ও রসাল করে তুলতে পারতেন যে, তার নমুনা বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না। যাঁরা প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর কাছে পড়েছেন, এসব কথা তাঁদের মনে এখনও গাঁথা আছে সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞানের যে দুটি ধারা আছে— তাত্ত্বিক ধারা ও প্রয়োগের ধারা, এ সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্রের মন ছিল সজাগ। এই দুই ধারাতে পুষ্ট হয়ে বিজ্ঞান উঠেছে বেড়ে। এদের বলা যায় বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। এ উভয়ের সমন্বয়েই বিজ্ঞান করে মানুষের কল্যাণ। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে শুধু ধ্যানধারণার বিষয় করে পরীক্ষাগৃহ বা পাঠাগারের চতুঃসীমায় আবদ্ধ করে রাখলে, তাতে মানুষের মনের অন্ধকার বা বুদ্ধির মোহ ঘুচতে পারে, কিন্তু সমাজের বহু কল্যাণ এবং মানুষের বহু দুঃখদৈন্য থাকে অব্যাহত। আবার অন্যদিকে একমাত্র বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে মেতে থাকলে তাতে জীবনযাত্রার সুখ সুবিধার এবং ভোগবিলাসের বহু উপকরণ যে জমে ওঠে এর কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু বিজ্ঞান হয় তাতে বিপথগামী। ফলে মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হয়ে সমাজ এবং মানুষ চলে অবনতি ও ধ্বংসের পথে। এর নিদর্শন আজ দেখা দিয়েছে এটম ও হাইড্রোজেন বোমার বিভীষিকায়। বিজ্ঞানের ও উভয় ধারার সমতা রক্ষা, অর্থাৎ তার জ্ঞানযজ্ঞ ও দ্রব্যযজ্ঞের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানুষের স্থায়ী কল্যাণ নেই। তাই প্রফুল্লচন্দ্র যেমন ভারতীয় রাসায়নিক গোষ্ঠীর (ইন্ডিয়ান স্কুল অফ কেমেষ্ট্রি) এবং ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির (ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে

ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের জ্ঞানবিস্তারের পাকা ভিত্তি গেছেন গঠন করে, সেরূপ আবার বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতির বিধান করে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে দিয়েছেন কর্মে আকার এবং রূপ। বহু কর্মীর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে আজ এ বিশাল রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে।

প্রাচীন ভারতে গুরুশিষ্যের মধ্যে যে অতি নিকট ও মধুর সম্বন্ধ ছিল, তারই নমুনা আমরা পাই প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে। এ চিরকুমার বিজ্ঞান-সন্ন্যাসীর নিকট শিষ্যেরা ছিল আপন পুত্রের মত প্রিয়।

শিষ্যদের কৃতিত্বে ছিল তাঁর গৌরব ও আনন্দ। তাই, প্রায় তিনি বলতেন-

"সর্ব্বত্র জয়মন্বিষেৎ পুত্রাদ্ (শিষ্যাদ্) ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্।"

আবার সময়ে সময়ে বলতেন শিষ্যেরা হচ্ছেন তাঁর গৃহিণী (হাউস কিপার), সচিব এবং সখা। গুরুশিষ্যের মধ্যে এরূপ শ্রদ্ধা স্নেহ এবং প্রীতির সম্বন্ধে বর্তমান যুগে বিরল হয়ে উঠেছে।

প্রফুল্লচন্দ্র নিজের অর্জিত অর্থের বেশির ভাগই বিতরণ করতেন পরের কল্যাণে। বহু দীনদুঃখী ও দুঃস্থ ছাত্র তার কাছে নিয়মিত সাহায্য পেত। এ দানের বিশেষত্ব ছিল। এ দান ছিল না রোজগারের প্রাচুর্য হতে উচ্ছিষ্টের সামিল, যেহেতু তাঁর উপার্জন ছিল সীমাবদ্ধ। নিজেকে সকল সুখ সুবিধা এবং ভোগবিলাস হতে বঞ্চিত করে তিনি ঐশ্বর্য সঞ্চয় করতেন দীনদুঃখী ও আর্তের সেবার জন্য। এ দানে তাই মুরুব্বিয়ানার গন্ধ ছিল না---ছিল কেবল হৃদয়ের সমবেদনা এবং প্রাণের প্রেরণা। বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপকের বেতন হিসাবে প্রাপ্য বহু টাকা, প্রায় দেড় লক্ষের অধিক তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন---রসায়ন উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার গবেষণায় বৃত্তি ও পুরস্কার দানের জন্য। এ ছাড়া বাংলার বহু শিক্ষা এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান তাঁরই অর্থ সাহায্যে গড়ে উঠেছে। শেষ বয়সে খদ্দর প্রচারের জন্য তিনি যে দান করে গেছেন, তার পরিমাণও বড় কম নয়।

বিজ্ঞানী হলেও সাহিত্যে এবং ইতিহাসে প্রফুল্লচন্দ্রের জ্ঞান ছিল গভীর এবং ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন এবং সেক্সপীয়ারের রচনা হতে তিনি অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন। ইমার্সন ও কারলাইলের লেখাও ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। অনেক সময় তিনি নিজেই আমাদের বলতেন দৈবাৎ ভুলক্রমে তিনি হয়েছেন রাসায়নিক। তাঁর আত্মচরিতে (Life and Experience of a Bengalee Chemist) এর আমরা নমুনা পাই। ভাষার সহজ প্রবাহে, রচনার কৌশলে এবং প্রকাশের সারল্যে বইখানি আগাগোড়া হৃদয়গ্রাহী। এর মধ্যে একটি সবল জীবনীশক্তির ও গভীর অনুভূতির স্পন্দন আছে পরিস্ফুট হয়ে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং প্রচারের ছিলেন তিনি বিশেষ পক্ষপাতী। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত রুশ রাসায়নিক মেন্ডেলিফের উদাহরণ ছিল তাঁর প্রধান নজীর। মেন্ডেলিফ তাঁর বিখ্যাত পর্যায় সূত্র (পিরিয়ডিক ক্লাসিফিকেশন) বিধিবদ্ধ করে প্রচার করেন রুশ ভাষায়। ফলে, এ অতি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবার জন্য অনেক বিদেশী বৈজ্ঞানিককে রুশ ভাষা হয় শিখতে। প্রফুল্লচন্দ্র মনে করতেন,

মাতৃভাষাকে শিক্ষায় বাহন করতে না পারলে স্বাধীন চিন্তার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়, এবং ফলে, স্কুল কলেজের শিক্ষার ভিত্তি থাকবে শিথিল হয়ে। কেননা, বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থায় চেষ্টা এবং সময়ের অপচয় হয় বহুল। প্রেসিডেন্সী কলেজে লেবোরেটারীতে কাজ করবার সময় প্রায়ই তিনি আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন— "ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি। এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি"।

প্রফুল্লচন্দ্রের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সমাজ সংস্কার ছিল অন্যতম। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি যে সব দূষিত রীতিতে আমাদের সমাজদেহ কলঙ্কিত, তার প্রতিকার ও নিরাকরণে তিনি ছিলেন অগ্রণী। বহু লেখায় এবং বক্তৃতায় এর বিরুদ্ধে তিনি আপন প্রতিবাদ প্রকাশ করতেন প্রবলভাবে কঠোর ভাষায়। এ নিয়ে প্রায়ই সনাতনপন্থীদের সাথে হত তার বাদানুবাদ ও লেখালেখি। মনে পড়ে একবার তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'বাঙ্গালী মস্তিস্কের অপব্যবহার" নামে। ক্লাসে পড়াবার সময়ও এবিষয়ে বহু উপদেশ এবং ব্যঙ্গোক্তি তাঁর মুখে আমরা শুনতে পেতাম।

অজীর্ণ রোগে ও অনিদ্রায় তাঁর শরীর ছিল রুগ্ণ। কিন্তু ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর নজর ছিল কড়া। কোন ছাত্র তাঁর লেবোরেটারীতে কাজ করবার জন্য প্রার্থী হলে সকলের আগে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলে তবেই খোঁজ হত তাঁর অন্যবিধ গুণাগুণের। কুঁড়েমি এবং বিলাসিতা মোটেই তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল যে বাঙ্গালী যুবক শ্রমকাতর এবং আরামপ্রিয়—এ কারণেই অবাঙ্গালীদের নিকট জীবন সংগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা যাচ্ছে হটে।

সময় বা পদার্থের অপচয় ছিল তাঁর কাছে অসহনীয়। তাঁর কাজকর্ম, খাওয়া পরা সবই চলত বাঁধাবাঁধি নিয়মে। প্রত্যহ সকাল ৮-৯টা অবধি ছিল তাঁর পড়ার সময় ঐ সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করা বারণ ছিল। জিনিসপত্রের অপচয়েও তিনি যেতেন চটে। ঘরে পাখা ঘুরছে অথবা বাতি জ্বলছে, অথচ ঘরে লোক নেই, লেবোরেটারীর টেবিলে অকারণে বার্ণার জ্বলছে। অথবা কল হতে জল পড়ছে, এ দেখলেই তিনি রেগে হতেন আগুন। এ জন্য ছাত্র-শিক্ষক কেউই তাঁর কাছে রেহাই পেত না। জিনিসপত্রের অপচয় নিবারণে তিনি যে কত সাবধান হতেন তার একটি নিদর্শন দিচ্ছি এখানে। তার নামে খামে করে যে সব চিঠিপত্রাদি আসত, তা হতে সাদা পাতাগুলি ছুরি দিয়ে কেটে যত্নের সঙ্গে রেখে দিতেন। তাতেই অনেক সময় তাঁর লেখার কাজ চলে যেত।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন দেশভক্ত। প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগ না দিলেও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রচ্ছন্নভাবে যে তার গভীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছিল, এ কারো কাছে অজানা নেই। তিনি ছিলেন মহাত্মাজীর অনুরক্ত। খদ্দর প্রচার ও চরকার কাজে বাংলাদেশে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। বিজ্ঞান কলেজের বারান্দায় বসে প্রত্যহ অপরাহ্ণে তদানীন্তন

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'নাইট' পদবীধারী এ মহাপুরুষ চরকায় সুতা কাটতে ব্যস্ত আছেন, এ দৃশ্য সবাই দেখতে পেত। তাঁর এ অভ্যাসের ব্যতিক্রম আমরা বড় দেখি নি।

আজীবন পরের সেবায় তিনি আপনাকে গেছেন নিঃশেষ করে। কিন্তু নিজে কারো সেবা নিতে সদাই ছিলেন নারাজ। বৃদ্ধ বয়সেও বিজ্ঞান কলেজে তাঁকে আমরা দেখেছি নিজের কাপড় নিজে আনছেন কেচে, কিংবা নিজের জুতোয় নিজেই দিচ্ছেন কালি। অতএব বলা যায় তিনি ছিলেন একপ্রকার গুণাতীত। গীতায় আছে :-

"মনোপমনোয়োঃ তুল্য তুল্য মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাজী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।"

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাঁর সকল চিন্তার ও সকল কর্মের উৎস হচ্ছে আত্মবিলোপ বা আত্মত্যাগের ক্ষমতা। এ হতেই আসে সৃষ্টির প্রেরণা। তিনি আপনাকে সম্পূর্ণভাবেই বিলীন করে দিয়ে ছিলেন আপন শিষ্যদের মধ্যে।

এর ফলেই গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষে নব্য রসায়নের সাধনা। আপন খণ্ড স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যকে সর্বসাধারণের অখণ্ড স্বার্থের মধ্যে বিলীন করে, আপন ব্যক্তিগত আমিকে সর্বগত আমির মধ্যে নিমজ্জিত করে, তিনি পেয়েছিলেন পরমার্থের সন্ধান। তাতেই সমাজে বহুবিধ কল্যাণ সৃষ্টির সম্ভব হয়েছে তাঁর কর্মে এবং বাণীতে। এখানেই তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমা। বাংলার সন্তান-সন্ততিগণ যদি প্রফুল্লচন্দ্রের এ মহৎ আত্মত্যাগের অনুসরণ করে আপন জীবনগঠনে প্রয়াসী হয়; তবেই বহু দুরূহ সমস্যার সমাধানে বাংলার ভবিষ্যৎ গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র-সান্নিধ্যে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কৈশোরে তিনজন বাঙালী মনীষী প্রধানের নাম শুনি, এবং ছবিতেও বোধ হয় তাঁহাদের অবয়ব দেখি। তাঁহাদের গুণপণা ও সুকৃতির কথা তখন বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে খুবই শুনিতাম এবং নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাঁহাদের প্রতি মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিত। এই তিনজন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনজনই বাঙালী সমাজে তখনই "আচার্য" পদে সমাসীন। ক্রমে যত বয়স হইতে থাকে অন্য দুজনের মত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের রচনার সঙ্গেও পরিচয় হয়। দেখিতাম তিনি স্বদেশ এবং স্বজাতির জন্য কত চিন্তাকুল। ১৯১৭ সনে কলিকাতায় এনি বেসান্টের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পূর্বে কংগ্রেসের অধিবেশন কালে একটি অল ইন্ডিয়া সোশ্যাল কনফারেন্স বা নিখিল ভারত সমাজ সংস্কার সম্মেলনেরও অধিবেশন হইত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঐ বৎসর এই কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির অভিভাষণ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা পরে অল্প মূল্যে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে থাকে। যতদূর মনে পড়ে বন্ধুবর পরলোকগত শরৎচন্দ্র ব্রহ্মের নিকট হইতে ইহার একখণ্ড লইয়া প্রথম পাঠ করি। পরপর তাঁহার আরও কতকগুলি পুস্তিকা আমার হাতে আসে-যেমন 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার', 'অন্নসমস্যা ও তাহার সমাধান' প্রভৃতি। লেখার ভাষা সহজ সরল অথচ কত গভীর চিন্তায় পূর্ণ! পুস্তিকাগুলি পাইয়া তখন এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতাম। সব যে বুঝিতাম এমন কথা বলি না; তবে পড়িতে খুবই ভাল লাগিত। এবং বাঙালী জাতির সম্মুখে যে কঠোর কঠিন সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহারও আভাস পাইতাম। তদবধি অত বড় প্রফুল্লচন্দ্রকেও আমাদেরই একজন করিয়া ভাবিতে শিখি—তিনি আমাদের কত আপনজন, বাঙালীর ঘরের খবর তিনি কত রাখিয়া থাকেন।

আমি তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি আমাদের গ্রামে চাটুজ্জে বাড়ীতে একজন দারোগা ছিলেন, তিনি চারি মাসের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছেন। দেখি অমৃতবাজার সাপ্তাহিক সংস্করণ তিনি রাখেন। কাগজ পড়ার ঝোঁক আমার বরাবরের। তাঁহার নিকট হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে অমৃতবাজার পত্রিকাখানি লইয়া ধীরে ধীরে পড়িতাম। ইংরাজী তখন কতটুকুই বা বুঝি, তবু পড়িতাম। একদিন দেখি সার পি. সি. রায়ের জনৈক ছাত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা রহিয়াছে সম্পাদকীয় স্তম্ভে। তখন প্রথম মহাসমর প্রবলভাবে চলিয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ঐ সময় জার্মানীতে থাকিয়া গবেষণা কার্য করিতেন। Ghose's Law নামে তাঁহার একটি আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে ইহাতে প্রশস্তি করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের গুণাবলী সম্পর্কেও লিখিত হয়। মনে হয়, এটি প্রফুল্লচন্দ্রেরই কথা- "Chemistry is not of exotic origin" অর্থাৎ রসায়ন বিদেশাগত নহে, ইহার উৎপত্তি ভারতেই- এ বাক্যটিও পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে পাই। Exotic শব্দ আগে কখন পাই নাই। অভিধান দেখিয়া ইহার মানে যখন বুঝিলাম তখন গর্বে কিশোর হইলেও আমার মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল। ইহার পর কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। প্রবেশিকা পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া বাগেরহাট কলেজে পড়িতে যাই। কলেজে প্রফুল্লচন্দ্রের খুব নাম শুনি। কলেজ প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় লোকেরা যথেষ্ট আগ্রহান্বিত ছিলেন বটে কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহায়তায় ইহা তখন স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর হয়। কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সায়ান্স বিভাগ সবেমাত্র নূতন বাড়ীতে খোলা হইয়াছে। সংবাদ আসিল প্রফুল্লচন্দ্র বাগেরহাটে আসিয়া সপ্তাহখানেক থাকিবেন এবং ছেলেদের নিকট রসায়ন সম্বন্ধে প্রতিদিন বক্তৃতা করিবেন। বাগেরহাটের সংলগ্ন দশানি গ্রামে পরলোকগত চন্দ্রনাথ দাসের বাড়ীতে আচার্যদেব আসিয়া উঠিবেন জানা গেল। চন্দ্রবাবু কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ঐ বাড়ীতে নির্দিষ্ট দিনে আসিলেন।

একদিন সকাল বেলা প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে ওখানে দেখা করিতে যাই। দেখিলাম প্রথম আলাপেই তিনি আমাকে কত আপন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার কিল-চড়-ঘুষির কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। আমরা ইহা শুধু প্রত্যক্ষই করি নাই নিজ নিজ দেহে এ সব উপভোগও করিয়াছি। প্রায় সব ছবিতেই আচার্যদেবের রোগাপটকা চেহারা; মনে হইত তিনি কত কৃশ। —তিনি আদতে কৃশ ছিলেন না। দেখিয়া মনে হইত এককালে বেশ শক্তিধর ছিলেন। হাতের কব্জি কত চওড়া, বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার কিল-চড়-ঘুষিতে আমরা কিছু ব্যথা পাইতাম। কিন্তু একটু আগে যেমন বলিয়াছি ইহা ছিল আমাদের উপভোগের বস্তু। আমাকে আপন করিয়া লইলেন। আমাদের মত ছেলেমানুষ হইয়াও যেন কথাবার্তায় রত হইলেন। বৈকালে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইব বলিয়া বিদায় লই। বক্তৃতাও শুনিতে যাই। কিন্তু লোকের কি ভিড়! শুধু ছাত্র-অধ্যাপক নন, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আসিয়া এখানে ভিড় জমাইয়াছেন।

পূর্বে শুনিতাম, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের ক্লাসে রসায়ন বুঝাইতে গিয়া বাংলায় বক্তৃতা দিতেন। এই বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার রেওয়াজ মনে হয় তিনিই আমাদের দেশে প্রথম শুরু করেন। রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বাংলায় পদার্থবিজ্ঞান ছেলেদের বুঝাইয়া দিতেন। বাংলার প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরাগ কলেজ প্রাচীরের মধ্যে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি বিশ্বাস করিতেন বাঙালী ছেলেদের মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দিলে তাহারা দ্রুত ইহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬) যশোহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয় তথাকার প্রবীণ নেতা যদুনাথ মজুমদারের উদ্যোগে। এ অধিবেশনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই মর্মে একটি প্রস্তাব আনিলেন যে, বাংলা দেশের উচ্চতর বিদ্যায়তনগুলিতে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হোক। তরুণ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের কথা ও কাজ একই। তিনি বরাবর বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আমাদের কলেজেও তিনি বাংলায় রসায়ন সম্বন্ধে পরীক্ষা সহযোগে বক্তৃতা দিলেন।

ইহার কিছু আগের কথা। তখন গ্রীষ্মাবসানে বাড়িতে গিয়াছি। অসহযোগ আন্দোলনে ভাঁটা পড়িলেও রাজনৈতিক সভাসমিতি জেলায়, মহাকুমায়, গঞ্জে চলিতেছিল। পিরোজপুর মহকুমায়, বাখরগঞ্জ জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন হইবে স্থির হয়। সভাপতি হইয়া আসিবেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রফুল্লচন্দ্রের কলেজে পড়ি—আবার তিনি আমাদের মহকুমায় আসিবেন। বাড়ী হইতে

ঐ শহর প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। ভোর বেলা রওনা হইয়া একটু বেলায় নির্দিষ্ট স্থলে গিয়া হাজির হইলাম। প্রফুল্লচন্দ্র সম্মেলনের সভাপতি। তিনি এই সময় মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্যের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। তাঁহার পরিধানে মোটা খদ্দরের ধুতি। গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। গলায় ভাঁজ করা একখানি খদ্দরের চাদর। শুধু খদ্দর পরিয়াই ক্ষান্ত নন। তিনি প্রত্যহ নিজে চরকায় সূতা কাটেন। ঐ দিন সকালেই গেটে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। আমার একমাত্র পরিচয়—তাঁহার কলেজের ছাত্র আমি। এই কথা শুনিয়াই তিনি ছাত্রোপযোগী কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। আমি যখন সিঁড়ি বাহিয়া গেটে নামি তাহা পূর্ব মুহূর্তে এক মুসলমান ভদ্রলোককে এই কথা বলিতে বলিতে উঠিতে দেখিলাম যে, আজ বাস্তবিকই ভগবান দর্শন হইয়াছে। মুসলমান ভদ্রলোক ওখানকার খান সাহেব মোক্তার, একান্তই ইংরাজ সরকার-ভক্ত। বুঝিলাম প্রফুল্লচন্দ্র মানুষের চিত্তকে কতখানি জয় লইতে পারেন!

কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিলাম। সায়ান্স কলেজের এত নিকটে থাকি আর এই কলেজেরই একাংশে প্রফুল্লচন্দ্রের বাস; তথাপি কি জানি কেন তাঁহার কাছে গিয়া আলাপ করার ভরসা হয় নাই। তবে সভাসমিতিতে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে দেখিতাম, দূর হইতে তাঁহার কথা যতটুকু পারি শুনিতাম। ইহার পর আর একটি ব্যাপারে তাঁহার সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয় ক্রমে খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে। মৃত্যুর পূর্বে কিছুকাল তিনি অসুস্থ ছিলেন, ইহার মধ্যেও তাঁহার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আমার আলাপাদি চলিত।

প্রবাসী আপিসে ঢুকিয়া পুনরায় পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিলাম। ক্রমে স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় গবেষণাকার্যে লিপ্ত হই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মনীষীদের লইয়া আমার এই গবেষণা কার্যের সূত্রপাত। বাংলার মনীষী বলিতে শুধু বাঙালীই নন, যাঁহারা বাংলা দেশকে আবাসস্থল করিয়া ইহার উন্নতিসাধনে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবন-কথাও আমার এই সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। বাঙালী মনীষী হইতে ক্রমে গবেষণা ক্ষেত্র ব্যাপকতর হয়।

রাধানাথ শিকদার ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন কৃতিত্বসম্পন্ন তেজীয়ান মানুষ। তাঁহার জীবন-কথা ইতিপূর্বে খণ্ডশঃ কিছু কিছু বাহির হইয়াছিল। আমি এ সব পড়িয়া ফেলি এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পত্রপত্রিকা সরকারী ও বেসরকারী পুস্তক পুস্তিকা ও দলিল দস্তাবেজ হইতে একটি জীবনালেখ্য রচনা করিয়া প্রথমে বাংলায় প্রবাসীতে এবং কিছু পরে সংক্ষেপে ইংরেজী মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত করি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রবাসীর নিয়মিত পাঠক। আমার প্রবন্ধটির দিকে স্বতঃই তাঁহার নজর পড়ে। তখন তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি। মাঝে মাঝে ময়দানে বেড়াইবার মুখে তিনি পরিষদ মন্দিরে যাইতেন। এই সময় একদিন মনে হইল তিনি তো আগে আমাকে জানিতেন, আমার লেখা প্রবাসীতে সম্প্রতি বাহির হইয়াছে—একবার এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করি। তিনি তাঁহার সেই ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছেন এই সময় আমি তাঁহার নিকট আমার পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে অবিলম্বে সায়ান্স কলেজে গিয়া দেখা করিতে বলিলেন।

আচার্যদেবের কথামত সায়ান্স কলেজে যাই। তাঁহার পদধূলি লইয়া নিকটে বসিলাম। আমাদের প্রসঙ্গ রাধানাথ শিকদার। তিনি গত শতাব্দীর একজন কত বড় গণিতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ছিলেন তাহার পরিমাপ এ যুগে করা সম্ভব নয়। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার কথা বলিতে বলিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখে প্রথম শুনি রাধানাথ শিকদারের ভ্রাতুষ্পুত্র কেদারনাথ শিকদার তখনও জীবিত। তিনি লোহালক্কড়ের কারবার করিয়া পরে নানা কারণে উহা গুটাইতে বাধ্য হন। আমি যখন কেদারনাথের সহিত সাক্ষাৎ করি—তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কিন্তু একটি কথার উপরে তখন বিশেষ জোর দিলেন। ভারতীয় জরীপ বিভাগের একটি মুখ্য অঙ্গ ত্রিকোণমিতিক জরীপ কার্য। ভারতবর্ষে পাহাড় পর্বতের অন্ত নাই, উচ্চাবচ ভূমি বিস্তার। ইহার জরীপ ত্রিকোণমিতির সাহায্য ছাড়া চলে না। জর্জ এভারেষ্ট কোম্পানীর কর্মীরূপে ভারতবর্ষের জরীপ বিভাগের এই অঙ্গকে নিজ জ্ঞান বুদ্ধি বলে নূতন করিয়া গঠন করেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে তথা বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে এভারেষ্ট সাহেবও তেমনি রাধানাথকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। রাধানাথ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও এভারেষ্ট সাহেব তাহার গুণপনায় মুগ্ধ হইয়া ওঠেন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীতি সম্পন্ন হন। আচার্যদেব বলিলেন, ঝুটা দেশাত্মবোধের মোহে এই সত্যটি ভুলিলে চলিবে না এবং পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গটিকে যে জর্জ এভারেষ্টের নামে আখ্যাত করা হইতেছে ইহা খুবই সমীচীন কার্য। বাস্তবিকই আচার্যদেবের সঙ্গে যতদিন মিশিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে ততদিন তাঁহার কথাবার্তা এবং আচার আচরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, আমাদের দেশাত্মবোধ তথা স্বাজাত্যবোধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত ভাবেই উচিত। প্রফুল্লচন্দ্র স্বাজাত্যবোধের প্রতীক হইয়াও কখন ভাবের ঘরে চুরি করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

আচার্যদেবের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইল। আমি প্রায়ই তাঁহার নিকটে যাইতাম এবং তিনি দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং কিরূপে ইহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় এ সম্পর্কে কত কথাই বলিতেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বহুস্থলে বলিয়াছেন, আমাকেও বলিতে ভোলেন নাই যে, আলস্য ও জড়তা বাঙালীকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতেছে। তিনি একদা বলেন—এই যে দেখ, এত বড় কলিকাতা শহর, দূরদূরান্ত হইতে লোটা কম্বল মাত্র সম্বল করিয়া অবাঙালীরা কলিকাতায় আসিয়াছে এবং অবিরত পরিশ্রমের ফলে আজ ব্যবসায় বাণিজ্য তাহাদের প্রায় একচেটিয়া। ভাবিতেও দুঃখ হয় যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই সাবধান বাণী এখন নির্মম সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার বিবিধ বিষয় গবেষণার কার্যে লিপ্ত হই এবং ক্রমে ইহার ফলাফল পত্রিকাদিতেও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। আচার্যদেব ইহার পরিচয় ইতিপূর্বেই কিছু পাইয়াছেন। তিনি অতঃপর আমার লেখা পত্রিকাদিতে বাহির হইলেই সাগ্রহে পড়িয়া ফেলিতেন। একবার 'দেশ' পত্রিকায় 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে তাঁহার পিতৃদেব হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পর্কে কিছু তথ্য সংকলন করিয়া প্রকাশিত করি। হরিশ্চন্দ্র রাড়ুলি কাঠিপাড়া অঞ্চলে বঙ্গ বিদ্যালয়, স্ত্রী বিদ্যালয়, রঙ্গালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। দেশবাসীর উন্নতিকল্পে রাস্তাঘাট নির্মাণ, জলাশয়

খনন ইত্যাদি কার্যেও তাঁহার প্রচুর দান। ঐ সময়কার শিক্ষা বিষয়ক বাৎসরিক সরকারী রিপোর্টে দেখিয়াছি শিক্ষানুরাগীরূপে তাঁহার খুবই প্রশংসা করা হইত। সংবাদপত্র হইতে সংকলিত তথ্যাদি প্রফুল্লচন্দ্রের স্বতঃই দৃষ্টি আর্কষণ করে। তাঁহার পিতৃদেব সম্বন্ধে আমি এত কথা কাগজে বাহির করিয়াছি- ইহাতে তিনি কতই খুশি! প্রথম সাক্ষাতেই তিনি এ বিষয়টির উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন যে তাঁহার ইংরাজী আত্মজীবনী আগেই বাহির হইয়া গিয়াছে, ইহাতে ইহার অনুবাদ দেওয়া আর সম্ভব হইল না, বাংলা আত্মজীবনী শীগ্রই বাহির হইবে তাহাতে তিনি আমার প্রকাশিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করিয়া দিবেন। যে কথা সেই কাজ। বাংলা আত্মজীবনী তিনি স্ব-নামাঙ্কিত করিয়া একখানি উপহার দেন।

খুলিয়া দেখি, তিনি শুধু সন্নিবেশিতই করেন নাই সঙ্গে সঙ্গে আমার নামও যোগ করিয়া দিয়েছেন। আমি তখন গবেষণা ক্ষেত্রে তরুণ-কর্মী। আমার যে কত আনন্দ হইয়াছিল—তরুণ গবেষক মাত্রই তাহা হয়ত অনুভব করিতে পারিবেন।

আর একদিনের কথা। আপিসে গিয়া দেখি তিনি আমাকে স্বহস্তে আঁকাবাঁকা পঙক্তিতে ইংরেজী বাংলা মিশ্রিত চিরকুট আকারে একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন 'দেশ' সাপ্তাহিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগ তথা হিন্দু কলেজ সম্পর্কে আমার যে প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে তাহা তিনি পাঠ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহার একখানি বইয়ের কথা লেখেন এবং বলেন যে, আমি তাঁহার কপিটি লইয়া যেন উহা পড়িয়া দেখি। অবিলম্বে আচার্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। বইখানি কাছেই রাখিয়াছেন এবং চাহিবা মাত্র উহা আমার হাতে দিলেন। তখন তিনি তাঁহার এডিনবরার ছাত্রজীবনের কথা বলিতে লাগিলেন। এই বিষয় যতটুকু মনে আছে তাহা আজ সংক্ষেপে নিবেদন করি: সাহিত্য এবং ইতিহাস প্রফুল্লচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় বিষয়, কিন্তু মেট্রপলিটন কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সার আলেকজেন্ডার পেডলারের রাসায়নিক পরীক্ষণাদি দেখিতে যাইতেন এবং ক্রমে রসায়নের দিকে তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া এডিনবরায় যান এবং বিজ্ঞান পড়িতে শুরু করেন। ঐখানে অধ্যয়নকালে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়— প্রবন্ধের বিষয় ছিল ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার। প্রফুল্লচন্দ্র খুব খাটিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং প্রতিযোগিতার জন্য যথাসময় প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রবন্ধটি প্রথম স্থান লাভ করিতে না পারিলেও ''সেকেন্ড বেস্ট'' বা দ্বিতীয় সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বলিয়া প্রশংসিত হয় এবং যতদূর মনে হয় তিনি বলেন প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষ নিজ ব্যয়ে এটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। বইখানি আমাকে দিলেন। ইহার নাম 'ইন্ডিয়া বিফোর অ্যান্ড আফটার মিউটিনি'। ইংরাজী শিক্ষা এবং ভারতীয় সমাজে ইহার প্রভাবাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বইখানিতে আছে। এখানে উল্লেখ করি যে গত শতাব্দীর শেষ দশকেই রসায়ন বিষয়ক গবেষণার ফলাফল দুইখানি পুস্তকে বাহির হয়। আর বর্তমান শতকের প্রথমেই তো তিনি 'হিন্দু কেমিস্টি' দুইখণ্ডে লিখিয়া প্রকাশিত করিলেন।

এখন তাঁহার ইংরেজী সাহিত্য চর্চা ও অনুশীলনের কথা একটু বলি। একদিন তিনি ইংরাজী সাহিত্য চর্চা প্রসঙ্গে আমাকে বলেন ''তোমরা কি ইংরাজী পড়? কোন বই আগাগোড়া মুখস্থ

করেছ ? আমি প্যারাডাইস্ লস্ট গোটা বইখানা সেই কতকাল আগে মুখস্থ করে ফেলি। এখনও বুঝি কিছু মুখস্থ বলতে পারি।'' —এই বলিয়া তিনি প্যারাডাইস লস্ট হইতে অনেকখানি অনর্গল মুখস্থ বলিয়া গেলেন। আমি কাণ্ডটা দেখিয়া তো অবাক ! সত্তরের কোঠায় বৃদ্ধ-যুবকের এখনও কি স্মৃতিশক্তি ! কিছুকাল পরে সায়ান্স কলেজে ঘন ঘন যাইতে সুরু করি। একদিন দেখি তাঁহার টেবিলে এখানে ওখানে কতরকম শেক্সপিয়রের সংস্করণ, আর তাহার উপরে লেখা বড় বড় ইংরেজ পণ্ডিতদের সমালোচনা পুস্তক ! তিনি বলিলেন, ''তুমি তো জান না আমি শেক্সপীয়রের কত ভক্ত ; তাঁর নাটকগুলি কতবার পড়েছি, কখন পুরোনো হয় নি। আমি আবার নতুন করে পড়তে শুরু করেছি।'' তাঁহার দৃষ্টিশক্তি তখন, ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এজন্য তিনি একজন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন দুবেলা তাঁহাকে শেক্সপিয়র ও ইহার উপর লিখিত সমালোচনা পুস্তকাদি পড়িয়া শুনাইবার নিমিত্ত।

বিভিন্ন লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠান হইতে এগুলি এসব বই কোন একটি লাইব্রেরী হইতে পাই নাই। বিভিন্ন লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠান হইতে এগুলি আমাকে আনাইতে হইয়াছে। পড়া হইলে ফেরত দিয়া আবার অন্য বইগুলি আনাই। কিছুদিন যায় দেখি 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শেক্সপিয়রের নাটকগুলির প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। পূর্ব যুগেও প্রফুল্লচন্দ্র নানাকার্যের মধ্যে যতটুকু অবসর পাইতেন শেক্সপীয়র অধ্যয়নে রত থাকিতেন। তাঁহার এই শেক্সপীয়র প্রীতির আর একটি কথা বলি। তখন উত্তরবঙ্গ প্লাবনের পর দুর্গতদের সাহায্যকল্পে বিশেষ আয়োজন হয়। প্রফুল্লচন্দ্র আত্রাইয়ে ঘাঁটি করিলেন। তাঁহার সহকর্মীরাও সেখানে। কত কাজ ! ইহার মধ্যেও শেক্সপীয়র পড়া চাই। বন্ধুবর মন্মথনাথ সান্যাল আত্রাই-এ তাঁহার অধীনে একজন সেবাকর্মী। একদিন তাঁহার অধ্যয়ন-প্রীতি দেখিয়া প্রফুল্লচন্দ্র শেক্সপীয়রের একখানি নাটক তাঁহাকে উপহার দেন। আজও মন্মথনাথ এখানি সযত্নে স্নেহের দানরূপে রক্ষা করিতেছেন।

একটি মাত্র উল্লেখ করিয়া আমার অর্ঘ্য নিবেদন শেষ করিব। অনেকেই হয়তো জানেন আমার 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' পুস্তকখানির ভূমিকা তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার এক একটি ফর্মা ছাপা হইত এবং তাঁহাকে দিয়া আসিতাম। ফর্মা ছাপা শেষ হইলে যথাসময়ে তাহার ভূমিকা পাইলাম। তাঁহার স্নেহ প্রীতি আমার জীবনের চড়াই উৎরাইয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপেই আমাকে বলদান করিয়াছে।

প্রফুল্ল-স্মৃতি
অসীমা মুখার্জী

আচার্যদেব নাই। দেশের প্রফুল্লতা আজ অস্তাচলে। এই নিদারুণ বিষাদ-সংবাদে সমস্ত ভারত নিরানন্দ বেদনায় আক্লিষ্ট। সত্যই আমরা যা হারালাম তা আর ফিরে পাবো না। বাঙ্গালার আজ সুবর্ণ দীপটি নির্বাপিত।

আচার্যদেব ছিলেন শিল্পী দার্শনিক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, স্বদেশভক্ত, দেশসেবক, ভারতীয় কৃষ্টির প্রচারক। রসানুভূতিময় অন্তর্দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক অবলোকন ও বিচার-শক্তি ছিল তাঁর অদ্ভুত। তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল-ছাত্র ও ছাত্রীপ্রেমিক, দরিদ্র ও আর্তের অকৃত্রিম মিত্র ও হিতকারী। তাঁর করুণা ধারা যশের আকাঙ্ক্ষা না করেই অনাহূত অনাবিল ভাবে প্রবাহিত হয়ে গেছে। তাঁর জীবনব্যাপী নিশিদিন ত্যাগদীপ্ত, সুকঠোর অক্লান্ত সাধনায় দেশকে সকল দিক দিয়ে তিনি যে জ্ঞানের আলোক দিয়ে গেছেন, ভবিষ্যৎ দেশবাসীরা তা নিয়ে শত সহস্র বৎসর দীপালি উৎসব করতে পারেন। এই মহামহা সম্পদের অধিকারী— এত বড় বড় ধনী, মানী সুসমৃদ্ধ জাতি থাকতেও এই দারিদ্র্য অত্যাচার ও অনাচার-উৎপীড়িত বাঙ্গালা দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন বোধহয় বাঙ্গালীদের দুঃখ না দেখতে পেরে! এজন্য বাঙ্গালী সত্যই আজ গর্বিত।

তাঁর জ্যোতির্ময়ী প্রতিভার বিকাশ সর্বত্রই বিকীর্ণ। এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান—প্রতিষ্ঠান, বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্—এসবই তাঁর নিজের হাতে গড়া। সকল কার্যে, সকল বিভাগে তাঁর কর্মশক্তি ছিল অসীম-তার পরিচয় দেওয়া সামান্য এই ছাপার কাগজে, তাঁর বিরাট অলৌকিক প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করা বাহুলতা মাত্র। তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়েছিলেন নিজের দেশবাসীকে—তিনি যে ছিলেন একান্ত আমাদের নিজেদের—এ তো কারো কাছে অজানিত নয়। তাঁর দানে আমরা পরিপুষ্ট কিন্তু তাঁর যোগ্য কি দিলাম? দেবার চেষ্টাই বা কতটুকু করেছি? আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগা যে এমন বিরাটকে হারালাম।

ভাগ্যক্রমে, জানিনা কোন্ শুভ মুহূর্তে এসে পড়েছিলাম তাঁর সান্নিধ্যে। সেই স্নিগ্ধ জ্যোতির আনন্দমুখর অফুরন্ত উৎসমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে কয়েক বৎসর আগে। তাঁর সহজ সরল ভাষার মধ্যে এত প্রেরণার ক্ষমতা যে চুম্বকের টানের মতন ছুটে যেতাম সেই বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের দ্বিতল কক্ষে। তাঁর কাছে কত গল্প শুনেছি, তাঁর সরস পরিহাস ও কৌতুকভরা কণ্ঠস্বর উপভোগ করেছি—তাঁর স্নেহ ও শাসন দুই—হাত পেতে নিয়েছি, তাঁর চরণকমল স্পর্শ করেছি দুই হাতে, সেই স্মৃতি আজও নিয়ে যায় আচার্যদেবের পদপ্রান্তে যেন নাগার্জুনের পদতলে উপনিষণ্ণা শিষ্যা। তখন মনে হয়, আচার্যদেবের তিরোধান-স্বপ্নের কুহেলিকা মাত্র। সেই স্মৃতির যে-দৃশ্য মনে ভেসে ওঠে, তারই কয়েকটি কথা বল্‌বো যা চিরজীবন আমাকে অনুপ্রাণিত করে রাখবে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তখন আমি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। বন্যায় দুর্ভিক্ষে দেশে হাহাকার। সাহায্যার্থে আমাদের হলো এক অভিনয়—দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন'। টিকিট বিক্রি করে টাকা উঠলো ১৫০০। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে নিমন্ত্রণ করে তাঁর হাতে ঐ টাকা সমপর্ণ করা হলো। সেই হলো তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আচার্যদেব এসেই মেয়েদের পিঠ বেশ জোরে জোরে চাপড়াতে লাগলেন—একেবারে ছেলেমানুষের মতন। তারপর বললেন, "আমাকে সাহায্য করবার জন্য তোদের এ অনুষ্ঠান আমাকে উৎফুল্ল করে তুলেছে, আমার আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না, তোরা সকলে মিলে আমায় নিয়ে একটু বেড়া দেখি। "আমরা খুব হৈ হৈ করতে লাগলাম—হাসলাম, কিন্তু ভয়ে দূরে সরে মজা দেখলাম—সাহস হল না কাছে গিয়ে কথা বলি।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এলাম বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে এম. এস্.সি. পড়বার জন্য। প্রথম দিনেই হলো আচার্য্যদেবের সঙ্গে দেখা। নোটিশ বোর্ডে নোটিশ দেখছি— দূর থেকে আমায় দেখে ছুটে এলেন—এসে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন—ভর্ত্তি হয়েছো? রিসার্চ করবে? —আরও কত কি? একনিশ্বাসে এত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সামর্থ্যে কুলোলো না। শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি মাদ্রাজি?" আমি হেসে প্রশ্নের উত্তর দিলাম- "না, খাঁটি বাঙ্গালী।" শুনে খুব খুশী—বাঙ্গালী মেয়ে পড়তে এসেছে। সব শিক্ষকদের ডেকে আনলেন। বল্লেন, — "ভাল করে যত্ন নেবে যেন এর কোন অসুবিধা না হয়।" প্রত্যহই কলেজে যাই—প্রায়ই ডেকে পাঠান, খবর নেন-–কেমন পড়ছি—আর বলতেন তার সঙ্গে— "ভাল করে পাশ করা চাই কিন্তু ইত্যাদি।" প্র্যাকটিকাল ক্লাশে দেখতে আস্তেন আমরা কি রকম কাজ করছি। খুব উৎসাহ দিতেন। কাজে সাহস আসতো। আর প্রায়ই বলতেন, — "তা বেশ-বেশ, বাপু, ভাল করে কাজ করো।" এই সামান্য কথাগুলিতেই কাজের লিপ্সা দু'হাজার গুণ বেড়ে যেতো। মাঝে মাঝে মিস্ শকুন্তলা শাস্ত্রীকে পাঠিয়ে দিতেন ক্লাসে—আমার খবর নেবার জন্য। আমি বলতাম— "ভালই ত আছি, কষ্ট করে ওঁকে পাঠান কেন?" হাস্তেন আর বল্তেন— "তোমার দিদি খবর নেবেন না?" কাজ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যেতো। তাঁর চাকর মুরারি এসে হঠাৎ খবর দিয়ে গেলো—"রায় সাহেব আপনাকে ডাকছেন।" গেলাম—জিগ্যেস করলাম— "ডাকছেন কেন?" বললেন— "খাবার রেখেছি খেয়ে নাও; কাজ করলে খেতে হয়! আর সব সময় কাজ করে না—All work and no play makes Jack a dull boy." আমি বলতাম— "রিসার্চ বুঝি এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা করলে হয়—তা ছাড়া এসেছি কি বেড়াবার জন্য?" তখন হেসে বলতেন— "ঠিক ঠিক।" মনে মনে চাইতেন খুব কাজ করি—তাই মুখে কিছু না বললেও মনে মনে খুশী হতেন আমার কথা শুনে- মুখটি তার আনন্দে উদ্দীপিত হয়ে উঠতো। যদি বল্তাম "ক্ষিদে নেই খাবো না"—তা হলে খাবার চাপা দিয়ে রেখে বলতেন—"আমি এখন বেড়াতে যাচ্ছি, একটু পরে এসে খেয়ে নেবে।"

ছেলেরা কাজ করছে কি না দেখবার জন্য ভারী এক মজা করতেন। পায়ের চটি খুলে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকতেন—কাজ করলে পিঠে এক ঘুসি। সকালে যখন কাজ করতুম— চুপি

চুপি আসতেন—কাজ করেছি দেখে খানিকটা উৎসাহ দিয়ে সামনের বারান্দায় পায়চারি করতেন। এম. এস.সি. পাশ করে যখন রিসার্চ করতে এলাম—তাঁর নামে Universityতে যে fund আছে তার থেকে আমার বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দিলেন। আমি জানতেও পারিনি যে, তিনি গোপনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই ব্যবস্থা করেছেন। এ-খবর দিলেন এক দিন আমার প্রফেসার ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র। নীরবে অজানিত ভাবে তিনি কাজকর্মের এত সুযোগ-সুবিধা ও এত উৎসাহের প্রেরণা— দিয়েছেন—তা বিশ্লেষণ করলে আপনা হতে তাঁর পায়ে মাথা নীচু হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন পরিশ্রম করতেন অদ্ভুত। নানা কাজের ব্যস্ততায় তাঁর জীবনে কোন দিন ফুরসৎ ছিল না, সর্বক্ষণই চোখে পড়্‌তো তাঁর এই কর্মবহুল জীবন—যা আমাদের প্রাণে কর্মশক্তির সঞ্চার করতো।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে Blood-pressure এ তিনি হয়ে পড়লেন অত্যন্ত অসুস্থ। সেই থেকে ক্রমশঃ নিস্তেজ হতে লাগলেন—জীবনীশক্তিরও হ্রাস হতে লাগলো। তিনি বুঝতে পারতেন, বেশী দিন তিনি আর বাঁচবেন না। তাই যদি জিগ্যেস্ করতাম, "কেমন আছেন?" বলতেন, "বাপু—তোমরা আমায় মরতে দেবে না—ভেজে রাখবে—আর কেন, যেতে দাও।" বলতাম— "না, আরও দেড়শো বছর বাঁচতে হবে।" মজার হাসি তিনি হাসতেন। শেষ কয়েক মাস তিনি আর উঠতে পারতেন না; তবু বলতেন, "খুব ভাল আছি—এই গ্রীষ্মে Bangalore -এ আমার ছাত্রদের কাছে বেড়াতে যাবো।" হঠাৎ মে মাসের শেষে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১৬ই জুন মহাপ্রস্থান করলেন—সকল মায়ামমতা ছিন্ন করে নিজের সাধনোচিত ধামে। কি ক্ষমতা যে এই বিরাট প্রতিভাকে আঁকড়ে ধরে রাখি! উনি তো শুধু আমাদের নন। যুগে যুগে ওঁদের আবির্ভাব—নব নব উদয়াচলে তাঁদের পুনরভ্যুদয়! মৃত্যুতে তাঁদের পরিসমাপ্তি নয়। তাই বিশ্বনিয়ন্তা অন্তকালে হাসছিলেন যখন বলেছিলাম "আপনাকে আরও দেড়শো বছর বাঁচতে হবে।"

১৭ই জুন প্রাতে আচার্যদেবের অন্তিম শোভাযাত্রার সঙ্গে গেলাম শ্মশান ঘাটে। গঙ্গার তটের উপর একখণ্ড জমিতে একটি বটবৃক্ষের তলে শেষ হলো ভস্মে তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ। ফিরে এলাম বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে, বিশালপুরী তাঁর বিরহে একেবারে ম্লান, কোন শব্দ নেই, —একেবারে নীরব! শুধু বাতাসের শোঁ—শোঁ শব্দ—তাও যেন গুমরে কেঁদে ওঠার মত। বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাতা—তাকে যে আজ চিরকালের মতন ছেড়ে চলে গেছেন। এ শোকে সে যেন মুহ্যমান—এ মর্মন্তুদ বিষাদে তার হৃৎস্পন্দন যেন সহসা বন্ধ হয়ে গেছে।

মাসিক বসুমতী : আষাঢ় ১৩৫১।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কীর্ত্তির শিখরোপরি আলো করে চন্দ্রচূড় ছিলে দশ দিশি
প্রাণের পরশ দিয়া টেনেছিলে বক্ষে তব যারা ছিল হেয় ;
তোমার অমৃতবাণী ভাগ্যবিড়ম্বিত এই জাতির পাথেয়
বিশ্বের বন্দিত তুমি সিদ্ধজ্ঞানী নাগার্জ্জুন! রাষ্ট্রগুরু ঋষি !
হলাহল পান করি প্রতিদানে দিলে নিত্য সুধারসায়ন,
মৃত্যুর অতীত হয়ে মৃত্তিকারে দিয়ে গেলে জীবনের গান
জ্যোতির অক্ষরে লেখা মানবের ইতিহাসে তব আত্মদান,
দধিচীর সম তুমি অস্থি দিয়া করে গেছ বজ্রের সৃজন।
প্রতিভার যজ্ঞশালা রুদ্ধ হোলো এ দুর্দ্দিনে তব তিরোভাবে,
মহত্বের বেদী হতে অন্তর্হিত হৃদয়ের আজ্যস্থলী আজ।
গাঢ় ঘন অন্ধকারে চন্দ্রহারা রজনীর বক্ষে পড়ে বাজ,
মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের বিহঙ্গবলাকা শ্রেণী মৌনী মনস্তাপে।
মোরা কাঁদি এই পার অন্ধ আঁখি মায়ার বিভ্রমে,
শাশ্বতকালের যাত্রী চলেছ কি আনন্দ সঙ্গমে !

ভারতবর্ষ: শ্রাবণ ১৩৫১।

আমাদের আচার্যদেব

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এস্.সি.

আচার্যদেব জন্মিয়াছিলেন ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে। সুতরাং প্রায় ৮৩ বৎসর জীবিত থাকিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল গত ১৬ই জুন তারিখে। বাঙ্গালীর পক্ষে, বিশেষত তাঁহার ন্যায় ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির পক্ষে ইহা দীর্ঘজীবন।

কিন্তু তাঁহার শরীরের যে ক্ষীণতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত তাহারই মধ্যে ছিল অপরিমিত চিন্তাশক্তি, অসাধারণ কর্ম প্রেরণা, লোকাতীত জ্ঞানপিপাসা। সর্বোপরি দেশের প্রতি তাঁহার দধীচির ন্যায় অনুরাগ। আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁহার জীবনকথা অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা বেঙ্গল কেমিক্যালের কথাই বেশী করিয়া বলিব।

১২ বৎসর বয়সে ১৮৮২ খৃঃ অব্দে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লইয়া তিনি বিজ্ঞান পড়ার জন্য বিলাত চলিয়া যান এবং সেখান হইতে ডি.এস্.সি উপাধি লইয়া তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। প্রায় এক বৎসর পর প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন সহকারী বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হইলে আচার্যদেব তাহাতে ২৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু অচিরে তিনি ছাত্র সমাজের পরম প্রিয়জন হইলেন, এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা অর্জন করিলেন। পরীক্ষাগারে রসায়নের চর্চা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল যে অন্য দেশে এই বিদ্যা অর্থার্জনের জন্য নিয়োজিত হইতেছে কিন্তু বাঙ্গালীর সে চেষ্টা নাই— বাঙালী কেবল চাকুরীর জন্য লালায়িত।

১৮৯১ খৃঃ অব্দে তিন বৎসর চাকুরীর পর তাহার উপার্জন হইতে ৭০০ টাকা জমিয়াছিল। একজন সহকর্মী রাসায়নিক ও ডাক্তার বন্ধু সঙ্গে লইয়া তিনি রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীতে লাগিয়া গেলেন। ৯১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে তিনি বাস করিতেন। সেখানেই কাজ আরম্ভ হইল। এই সময়েই তিনি টালিগঞ্জে একটি এসিডের কারখানা নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করেন। সার্কুলার রোডের বাড়ীতেই তিনি ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার ঔষধ যোয়ান-কুর্চি প্রভৃতির আরক তৈরী আরম্ভ করেন। ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে ডাক্তারগণ তাঁহার ঔষধ ব্যবহার শুরু করেন। ক্রমে তাঁহার জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার নিকট সমস্ত বাধা ভাসিয়া যায় এবং বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রস্তুত যে কোন বস্তুই অচিরে পৃথিবীর সর্বত্র শ্রদ্ধা অর্জন করে।

১৮৯২-১৯০২—এই দশ বৎসর চলিবার পর বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ রেজেষ্ট্রী করা লিমিটেড কোম্পানী হয়। মূলধন হয় ৫০০০০ টাকা। তারপর তিনবারে মূলধন বৃদ্ধি করিয়া এখন মূলধন হইয়াছে ২২ লক্ষ টাকা। মানিকতলায় যে পুরাতন সালফিউরিক এসিড তৈরীর যন্ত্র আছে তাহা তৈরী হইয়াছিল ১৯০৪-৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং ইহা তৈরীর ব্যবস্থা করিয়াছেন এখানকার রাসায়নিকগণই—বিদেশী কোন ইঞ্জিনিয়ার এজন্য আসেন নাই।

১৯০৮ সালে এই কারখানায় ৭০ জন লোক কাজ করিত। তখন মিস্ত্রিখানা হইয়াছে, ল্যাবরেটরী তৈরী করার কাজ তখনই আমরা করিতাম। ইহার অল্প আগে সুগন্ধি বিভাগ খোলা হইয়াছিল।

১৯২৪ সালে আমরা দেখিয়াছি, তুলা শুকাইবার ঘর এখনকার প্রফুল্ল ভবনের স্থানে মেশিনসপের মধ্যে। এখনকার ল্যাবরেটরীর মধ্যেই সুগন্ধি বিভাগের সব কাজ চলিতেছে। বগেুড ল্যাবরেটরী এখনকার অষ্টমাংশ। সিরাপঘর এখনকার অষ্টমাংশ। বায়লজিক্যাল বিভাগ তখন ছিল না। ছাপাখানা ছিল। এখনকার বাজার—ষ্টোরে ছিল গাছড়া গুদাম। এখনকার তৈল ঘরের একদিকে ছিল বাল্‌ক ষ্টোর, অন্যদিকে থিয়েটার ষ্টেজ। টিফিনের সময় Weighbridge—এর কাছে টিফিন ক্যারিয়ারে করিয়া আনিয়া রতিকান্ত খাবার যোগাইত।

সহসা এই প্রতিষ্ঠান এত বড় হয় নাই। দেশের প্রতি আচার্যদেবের যে মমতা ছাত্র বয়সে বিলাতে "India before and after the Mutiny" প্রবন্ধে দেখা গিয়াছিল তাহা দেশে আসিয়া আরও জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার প্রভাবে তাঁহার এই কর্মক্ষেত্রে কর্মীরা আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতিভার ছায়ায়. তাঁহার নেতৃত্বে তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের কর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। স্বদেশবাসীর দ্বিধা, বিদেশী শাসনের অকৃপা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার অসুবিধা—সম্মুখে কত বিঘ্ন, কত অনিশ্চয়তা। ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হইল। ধীরে ধীরে বিক্রয় বৃদ্ধি পাইল। এখন এক কোটি টাকার উপর আমাদের বিক্রয়। যুদ্ধের আগে ভারতের বাহিরেও আমাদের মাল যাইতেছিল। যুদ্ধের মধ্যেও আমাদের কোন কোন ঔষধ ভারতের বাইরে যুদ্ধক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট পাঠাইয়াছেন।

নানা কার্যে আচার্যদেব ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন। যখন কলিকাতায় উপস্থিত থাকিতেন তখন প্রতি বুধবার তিনি এই কারখানায় আসিতেন এবং বিভাগে বিভাগে যাইয়া সকলের সঙ্গে প্রস্তুত প্রণালী ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। তাঁহার সে স্নেহ পাইয়া আমরা গৌরবান্বিত বোধ করিতাম।

এই প্রতিষ্ঠানের আজ কলিকাতা, পাণিহাটি, বোম্বাই ও লাহোরে ৪টি কারখানা। প্রায় ৩/৪ হাজার লোক ইহাতে বেতনভোগী কর্মী। আরও ৭/৮ হাজার লোক ইহার কাঁচামাল ও তৈরী মালের কেনাবেচায় জীবিকা অর্জন করে। অর্থাৎ প্রায় ১০হাজার লোক ইহা হইতে যাহা উপার্জন করিতেছে তাহাতে বুঝিবা লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতেছে।

আমাদের বিস্ময় বোধ হইতেছে। প্রফুল্লচন্দ্র বিষয়-বিরাগী ছিলেন। অতিশয় স্বল্প আহার করিতেন, বিবাহ করেন নাই, অতি অল্প বস্ত্রাদি পরিতেন—সাংসারিক প্রয়োজন তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। [illegible] এতগুলি মানুষের সাংসারিক প্রয়োজনের দুঃখ মিটাইয়া তাহাদের প্রাণের ঠাকুর হইয়া রহিলেন।

প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজের চাকুরী, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ, পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য, কোম্পানীর শেয়ারের লভ্য—আচার্যদেবের আয় সামান্য ছিল না। নিজের জন্য সামান্য ব্যয় হইত, সর্বদা ৩/৪ জন করিয়া ছাত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিত—আর সব তিনি দান করিয়া গিয়াছেন।

খাদি প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানের গবেষণা, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে দান, ব্যক্তিগত সাহায্য—আরও কত অজানা দান-সব হিসবে লেখা সম্ভব নয়। সম্ভবত সমস্ত একত্র করিলে ১০ লক্ষ টাকার কম হইবে না। কিন্তু টাকার সাহায্যই তো কেবল সাহায্য নহে। তাঁহার সঙ্গে স্বর্গীয় •কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয়ের বান্ধবতা দেখিয়াছি। বিধবা দুঃস্থরা তাঁহার সাহায্য চাহিয়া পত্র লিখিত। তিনি বসাক মহাশয়ের সাহায্যে তাহাদিগকে বিদ্যাসাগর বাণীভবনে আনিতেন অথবা অন্য ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

ব্যবসায় ও দ্রব্য তৈরীর পরামর্শ চাহিয়া তাঁহার নিকট পত্র আসিত। লোক উপস্থিত হইত। তিনি তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিতেন। তাঁহারই ছাত্রগণ সমস্ত ভারতবর্ষে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া Indian School of Chemists সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যবসায়—বিশেষত রাসায়নিকের ব্যবসায় বিষয়ে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী তাঁহারই প্রভাবে প্রশংসাভাজন হইয়াছে।

বস্তুত তাঁহার প্রথম জীবনে "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া যে আন্দোলনের তিনি সৃষ্টি করেন এবং সারাজীবন বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ে উন্মুখ করার জন্য যে উত্তেজনার সঞ্চার করেন তাহা শেষজীবনে তিনি অনেকখানি সার্থক দেখিতে পান। কাঁচ, চিনামাটি, জাহাজ, লবণ, বস্ত্র, কাগজ, এনামেল প্রভৃতির কারখানাও তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সর্বোপরি বলা যায় যে তাঁহাকে দেখিয়াই বিজ্ঞানের দিকে বাঙ্গালী—সন্তান আকৃষ্ট হইয়াছিল। আর আকৃষ্ট হইয়াছিল তাঁহার বিষয়লিপ্সাহীন অনাড়ম্বর সাধারণ জীবনযাত্রার প্রণালী দেখিয়া। মানুষের দুঃখমোচনে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সংকটত্রাণ তাঁহার সেই দক্ষতার ফল। কিন্তু ব্যক্তিগত দাক্ষিণ্য প্রকাশের সময় তিনি অন্তরালে থাকিতেন। তাঁহার এইরূপ দক্ষতা, সাধুতা ও দয়ায় সমস্ত দেশ অজস্রধারে সাহায্য প্রেরণ করিয়া উত্তরবঙ্গ বন্যার কাজে সফলতা আনয়ন করে।

নব নব জ্ঞান অর্জনে তাঁহার অসাধারণ স্পৃহা। পৃথিবীর যেখানে যখন যে আন্দোলন হয় আচার্যদেব তাহা আয়ত্ত করেন এবং আবশ্যক হইলে স্বদেশের উন্নতিকল্পে তাহা নিয়োগ করেন। তাই গান্ধীজির খদ্দর আন্দোলনের তিনি পোষক এবং চীনের ছাত্র জাগরণে তাঁহার চিত্ত অতখানি আলোড়িত হইয়াছিল।

কেশবচন্দ্র দেশে ধর্ম ও জাতীয়তার ঢেউ আনিয়াছিলেন, আর সুরেন্দ্রনাথ আনিয়াছিলেন রাজনীতিক আন্দোলন। সেই আবেষ্টনে আচার্যদেব আসিয়া প্রভাবান্বিত হইলেন। যে গঠনমূলক কাজের কল্পনা তখন দেশে এখানে ওখানে অল্প স্বল্প দেখা যাইতেছিল তাহাতে তিনি নবপ্রেরণা দান করিয়া স্বদেশে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের জন্য উদ্দীপনার সৃষ্টির করিলেন।

আজ আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, শিল্পদ্রব্যের অভাবে দেশ কত অসহায়। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার ভূমি ও তাপ। এদেশের ভূমি এজন্য সবই জন্মাইতে পারে। দেশের খনিজসম্পদও মূল্যবান। কাজ করারও লোকের অভাব নাই। শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার জ্ঞানসম্পন্ন লোকও পাওয়া যায়। এ অবস্থায় যে জাতীয় শিল্পপরিকল্পনার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু এই পরিকল্পনায় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কাজ যে প্রথম গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহাই লক্ষ্য করার বিষয়। এই সম্বন্ধে এই যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে যে সকল রকম শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতেই রাসায়নিক দ্রব্য আবশ্যক। সুতরাং উহাই প্রথম প্রস্তুত করিতে হইবে।

দেশের রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের প্রধান ও বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান এই বেঙ্গল কেমিক্যাল। সুতরাং এই পরিকল্পনার প্রথম ও প্রধানতম দায়িত্ব আমাদের উপরই ন্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। আচার্যদেব আমাদের সে দায়িত্বের সম্মুখীন করিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন সে কর্ত্তব্যপালন করিতে পারি, তবেই তাঁহার আত্মা শান্তি পাইবে, আমরা তাঁহার আশীর্বাদের যোগ্য হইব।

ভারতবর্ষ : ভাদ্র ১৩৫১।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রসঙ্গে

শ্রীনির্মলকুমার বসু

১৯১৭-এ স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া যখন কলেজে ভর্তি হইবার জন্য কলিকাতায় আসি, তখন যে সকল শিক্ষকের দ্বারা অল্পদিনের মধ্যে আকৃষ্ট হই, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অন্যতম ছিলেন। অবশ্য আমি তাঁহার নিকটে সাক্ষাৎ কখনও বিজ্ঞানপাঠের সুযোগ লাভ করি নাই, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা আমাদিগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

যে-লেখাটি প্রথমে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত করে তাহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকার নাম ছিল ''বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার''। সেই বক্তৃতার মধ্যে তিনি যে-কথা বলিয়াছিলেন তাহা হইল,

''স্বাধীন চিন্তা জাতীয় জীবন-নদের উৎস।'' শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন,

''কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিতা ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তো॥''

উল্লিখিত প্রবন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজকে কশাঘাত করিয়াছিলেন এবং নবীন যুবকগণকে মৌলিক চিন্তা এবং যুক্তিবাদকে আশ্রয় করিয়া বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে বলিয়াছিলেন, ইহা সহজেই আমাদের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

বাঙালীর অন্নসমস্যা লইয়া প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তার অবধি ছিল না। বাঙালী যুবক মজুরী করিতে ভয় পায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে নামা অপেক্ষা চাকুরির খাঁচার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিতে চায়, ইহা তাঁহাকে বারংবার ব্যথিত করিত। ছাত্রাবস্থায় তাঁহার এবিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা আমরা শুনিয়াছিলাম। মাড়োয়ার ব্যবসায়ীগণের ব্যবসায় বুদ্ধি, হিন্দুস্থানী মজুরের শ্রমশীলতার বিষয়ে উল্লেখ করিয়া তিনি ছাত্র ও যুবকসমাজকে জাগ্রত করিবার চেষ্টার করিতেন। তাহার মধ্যে একটি সুর সে সময়েও যেন আমাদের নিকট কিঞ্চিৎ বেসুরা বাজিত। বাঙালীত্বের কথা তিনি একটু বেশী করিয়াই যেন বলিতেন; অন্যান্য প্রদেশবাসীর মধ্যে যাহারা ধন সম্পদ আহরণ করিবার জন্য কলিকাতায় ক্ষণিকের বাসা বাঁধিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে তাঁহার বক্তৃতায় তীব্রতা আসিয়া পড়িত। ইহাতে কখনও আমরা অস্বস্তি অনুভব করিতাম, কখনও বা ভালও লাগিত।

অস্বস্তি অনুভব করিবার কারণ ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা বা পত্রাবলীর মধ্যে কোথাও এক অখণ্ড ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর কিছু শুনা যাইত না। বিবেকানন্দ কদাচিৎ বাঙালীর বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন সত্য কিন্তু সে উল্লেখের মধ্যে প্রেম ও তিরস্কার মিশ্রিত ছিল। বাঙালী সমাজের তমোধর্মের বিরুদ্ধের তীব্র কশাঘাত করিয়া হাড়ি-মুচি প্রভৃতি উপেক্ষিত সমাজের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিয়াছেন, তাহারাই প্রকৃত বাংলা দেশ। তাহাদেরই মুক্তি ও মনুষ্যত্ববিকাশের জন্য

নিজের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দেওয়া শিক্ষিত যুবকসমাজের আদর্শ হওয়া উচিত। বিবেকানন্দ ভারতের প্রদেশ-বিশেষকে স্বতন্ত্রভাবে দেখেন নাই। সেই জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা আমাদের কানে কখনও কখনও অল্প বেসুরা বাজিত।

পরবর্তীকালে অবশ্য ইহা অনুভব করিয়াছি যে মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবক সম্প্রদায়কে জাগাইয়া তুলিবার জন্যই তিনি কখনও কখনও আপাত প্রাদেশিকতার উদাহরণ অবলম্বন করিতেন। সমগ্র ভারত বা ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজের সম্পর্কে তাঁহার অন্তরে কোনও সংকীর্ণতার ভাব বর্তমান ছিল না। ইহার প্রমাণ পরবর্তীকাল বারংবার পাইয়াছি।

১৯২১ সালের প্রথমাংশে কলিকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে বহু ভারতীয় শ্রমিক অকস্মাৎ বিদেশ হইতে আসিয়া একত্রিত হন। ইঁহাদের অধিকাংশ ফিজি দ্বীপপুঞ্জ হইতে আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ মরিশস, দক্ষিণ আফ্রিকা, ডেমেরারা, ট্রিনিডাড প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও আসেন। প্রায় দেড় হাজার বা ততোধিক শ্রমিকগণকে আশ্রয় দিবার জন্য একটি শিবির স্থাপিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমরা তিন বন্ধু ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম।

মনে আছে, মেটিয়াবুরুজের সেই শিবিরকে উপলক্ষ করিয়া আমি ব্যক্তিগতভাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রথম দর্শনলাভ করি। শিবির পরিচালনার জন্য সাবান, ঔষধপত্র, খাদ্য ও বস্ত্রের অহরহ : প্রয়োজন হইত। এগুলির ব্যবস্থা বিভিন্ন সংস্থা করিতেন, কিন্তু আমরা পার্শ্ববর্তী ইংরেজী বা দেশী কারখানায় গিয়া মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম, তাঁহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতাম এবং ব্যবহারের জিনিপত্রও আদায় করিয়া লইতাম। তাঁহারাও সানন্দে শিবিরের প্রয়োজন মিটাইতেন।

এতদুপলক্ষে আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া আমরা একদিন এক পেটী ফলের সিরাপের প্রার্থনা করিলাম। তখন গ্রীষ্মকাল। মনে হইল, শ্রমিকদের মধ্যে সরবৎ বিতরণ করা যাইবে। তখন আচার্যদেবের নিকটে বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন বসিয়াছিলেন। তিনি মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক শিবিরের বিষয়ে ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে খবর পাইয়া ছিলেন, এবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ প্রশ্ন করিয়া তাহাদের সব তত্ত্ব লইলেন। কে কোন্ জেলা হইতে আসিয়াছে। কি করিত, কতদিন ছিল, আসিলই বা কেন, ফিরিয়াই বা যাইতেছে কেন, এসব কথার আমরা উত্তর দিলাম। সব শুনিয়া বোধ হয় খুশি হইলেন, এবং অর্থ সাহায্য করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন।

আমরা যে দুইজন গিয়াছিলাম, উভয়ে নিতান্ত ক্ষীণকায় ছিলাম না। আচার্যদেবের এক বাতিক ছিল প্রত্যেক বাঙালী যুবককে সুস্থ ও সবল দেখিতে তিনি ভালবাসিতেন। আবার বলের পরীক্ষাও লইতেন। আমাদের বুকের উপরে সজোরে ঘুঁষি মারিয়া অকস্মাৎ আমার গলা জড়াইয়া কোলে চড়িয়া বসিলেন, এবং আদেশ করিলেন, ঘরের মধ্যে এই অবস্থায় যেন খানিক দৌড়াইয়া আসি। আচার্যদেবের দেহের ওজন অবশ্য খুব বেশী ছিল না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, এবং

যথেষ্ট কৌতুকও অনুভব করিলাম। অতঃপর পর্যাপ্ত পরিমাণে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম।

অনেক বৎসর চলিয়া গেল। কলেজের পড়া ছাড়িয়া আমি সেই সময় হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছি। ১৯৩০ সাল আসিল। গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহের মধ্যে আমরা বহুজন সমেত জড়াইয়া পড়িলাম। সে সময়ে বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদের দায়িত্ব যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং বগুড়ার যতীন্দ্রমোহন রায়ের উপরে ন্যস্ত হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্যে আমার উপরে ভার পড়িল, চিঠিপত্র বা কর্মীগণের নিকট হইতে প্রতিদিনের সঠিক ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সংবাদপত্রে তাহা পরিবেশন করিতে হইবে।

কলেজ স্কোয়ারে আইন অমান্য পরিষদের দপ্তরে ল—ঘরে বসিয়া আমি কাজ করিতাম, বহু সন্ধ্যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রত্যহ সংবাদ সযত্নে শুনিতেন এবং সদর কামরায় সতীশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া সংবাদ-দপ্তরে তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিতেন। আমার বন্ধু বিখ্যাত গঠনকর্মী শ্রীপঞ্চানন বসু তখন পরিষদের কোষাধ্যক্ষ। আন্দোলনে অর্থের প্রয়োজন তো ছিলই, এবং বহুদিন এমন গিয়াছে যখন আচার্য অকুণ্ঠিতভাবে ও অযাচিত অবস্থায় মুঠা মুঠা নোটের তাড়া আন্দোলনে ব্যবহারের জন্য রাখিয়া যাইতেন। কৌতুকভরে কেবল আমাদের সতর্ক করিয়া দিতেন যেন এ সংবাদ ঘুণাক্ষরেও পুলিশের কাছে না পৌঁছায়; পুলিশকে নাকি তাঁহার ভয় ছিল!

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র: জন্মশতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ (খুলনা সম্মিলনী), ১৯৬১।

আচার্য-বাণী

আর একজন ঝাড়ুদারের কথা বলি। লর্ড রেডিং যখন প্রথম বার কলিকাতায় পদার্পণ করেন, তখন তিনি 'ক্যাবিন বয়' হইয়া আসেন। 'ক্যাবিন বয়' মানে এই যে, তাঁহাকে আরোহীগণের ভৃত্য হইয়া জাহাজের ক্যাবিন (বৈঠক ঘর), সেলুন প্রভৃতি ঝাড়পোঁছ এবং আরোহিগণের জুতা বুরুশ পর্যান্ত করিতে হইত। বলা বাহুল্য লর্ড রেডিং যখন দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আসেন তখন আসিলেন রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) হইয়া।

এখন আমাদের শ্রীমানদের কথা বলিতেছি। তাঁহারা কলেজে এমন কি স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে পড়িলেই ঝাড়ু হাতে করা কিংবা হাটবাজার করা মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করেন। কলেজের কোন যুবককে যদি বাজার হইতে হাতে তরিতরকারীপূর্ণ চুবড়ী ও খারাইতে মাছ আনিতে বলা হয়— অবশ্য সঙ্গে চাকর না থাকিলে— তাহা হইলে তিনি বিভ্রাটে পড়েন। পাড়াগাঁয়েও দেখা যায়, সাবেক কালের গৃহস্থগণ নিজেরাই হাটবাজার করেন— কারণ কয়জনের বাড়ীতে চাকর আছে? কিন্তু স্কুলের উচ্চশ্রেণীর শ্রীমানেরা তাঁহাদের বাপখুড়ার ন্যায় ঐ সকল কাজ করিতে নারাজ। আর কলেজের ছাত্রের ত কথাই নাই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভিতরের মানুষটি বৈজ্ঞানিক পি.সি.রায়কে ছাড়িয়ে পরীক্ষাগার ও বিজ্ঞানকলেজের বাহিরে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ব্যাপ্তি কল্যাণকর্মের সূত্রে সম্ভব হওয়ায়, তাঁর জীবনকে অপূর্ব একটি সার্থকতায় মণ্ডিত করেছিল। আমরা আচার্য সম্বন্ধে কয়েকটি অতি সাধারণ কথার উল্লেখ করব। কথাগুলি আমরা জানি। এই রূপ আরও অনেক কথা আরও অনেকে অবশ্যই জানেন।

প্রায় ১০/১১ বৎসর আগেকার কথা। আচার্য কলকাতা বিজ্ঞানকলেজের নৈঋত কোণের ঘরে আছেন। একদিন বিকালে দেখা করতে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, ‘‘মধ্যবিত্ত বাঙালীর উদ্ধারের আশা এখনও করেন কি? আপনি ত এর জন্যে কত প্রচার, কত চেষ্টা করেছেন। ‘অন্নসমস্যা’ থেকে সুরু করে কোন সমস্যারই বিচার ও সমাধানের চেষ্টার বাকি ত আপনি কিছু রাখেন নি।’’ একটু চিন্তিতভাবে আচার্য উত্তর করলেন, ‘‘নাঃ—মধ্যবিত্তের আরো অধোগতিই হয়েছে। প্রচারের কথা তোমার তা মনে থাকবেই। আজও দেখ না, সেই ডিগ্রী ও চাকরির মোহ, আর সেই আলসেপনা।’’ তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, ‘‘রামমোহন রায় কোন্ সনে জন্মেছিলেন বল তো।’’ উত্তর করলুম, ‘‘ঠিক বলতে পারছি না—১৭৭২ কি ১৭৭৪ সালে হবে।’’ তিনি বললেন, ‘‘তবেই বোঝ, সে আর পলাশীর যুদ্ধের কয় বৎসরই বা পরে?’’ আমি বললুম, ‘‘প্রায় ১৬/১৭ বৎসর পরে।’’ একটু গভীর স্বরে তিনি বললেন, ‘‘নদীর একটা বাঁকপথ আর কি?’’ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘সে কি’?

তিনি বললেন, ‘‘বুঝতে পারছ না? সুমুখে নদীর একটা বাঁকপথ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, নদী বুঝি ঐখানেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বাঁকের মুখে এগিয়ে চল। দেখবে, মোড় ঘুরে নদী আবার কোন সুদূরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এ'ও সেই বাঁকপথ। পলাশীর যুদ্ধ তো বাঙালীর চরম দুর্গতির দিন। দেশের প্রধানরা জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় দেশকে একদল বণিকের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। তারপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের করাল কবলে গিয়াছে ১/৩ ভাগ লোক। বাংলায় তখনও শ্মশানের আগুন জ্বলছে। তার উপর আবার ইংরেজ রাজ্য এই বাংলায় সুরু হয়ে, সারা ভারতবর্ষকে গ্রাস করবার জন্য হাঁ করেছে। এর চেয়ে ঘোর দুর্দিন আর কি হতে পারে? মনে হয়েছে, দেশের বুঝি ঐখানেই ইতি হয়ে গেছে। কিন্তু তারপর আর ৪/৫ বৎসর এগিয়ে এসে দেখ, বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে নব্যভারতের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করলেন। এইবার বাঁকপথে পৌঁছে যাওয়া গেল আর কি? তারপর চেয়ে দেখ, সুমুখে নব্যভারত ও ভবিষ্যতের দিকে কত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে রয়েছে। প্রথম সূচনায় দেখ, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কত রকমের কত বড় লোক। কি প্রতিভা। বাঙালীই তো নব্যভারত গঠনের স্বপ্ন প্রথম দেখেছিলেন।’’

একটু চুপ করে থেকে দক্ষিণ হাতখানি বুকের উপর তুলে নিয়ে আমায় বললেন, ''আশা আমি খোল আনাই করি হে। যে দেশের ছেলে একপকেটে রিভলভার, আর একপকেটে পটাসিয়াম সায়নাইড নিয়ে ঘুরতে পারে, পরাধীনতার জ্বালায় জ্বলে, প্রাণের মায়া রাখে না, সে দেশ সম্বন্ধে হতাশ হবার কি আছে? এ'ও সেই বাঁকপথ। পুঁজি আছে দেশে—ঠিকমত খুঁটিয়ে যেতে হবে।'' শ্রদ্ধায়, আনন্দে ও বিস্ময়ে আচার্যের মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

কানাই দত্তর যখন ফাঁসি হয়, তখন আচার্য একদিন কানাইয়ের স্বজাতি এবং আত্মীয়, হুগলী জেলার শ্রদ্ধেয়, স্মরণীয় কংগ্রেসসেবী ডাক্তার আশুতোষ দাসকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাসভরে বলেছিলেন, ''তোমাদের তাঁতিরাই আজ দেশকে বাঁচালে। দেশকে বড় করতে হলে 'মারটারডম' চাই। তোমাদের জাত রক্ত দিয়েছে, আত্মদান করেছে। তোমরা নমস্য।'' আশুতোষ দাস তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন।

১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র লোকসেবার ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। বেঙ্গল রিলিফ কমিটির আপিস খোলা হয়েছে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের দক্ষিণ মহলের নীচের হলের একখানি ঘরে। সারা বাংলায় আর্তত্রাণ-চেষ্টার সাড়া পড়ে গেছে। বন্যাপীড়িতের সাহায্যের জন্য অর্থ ও বস্ত্রাদি—আচার্যের নিজের ভাষায় বলতে হয়—বন্যার মত এসে পড়েছে। কর্মমুখর আপিসঘরে এক পার্শ্বে আচার্যের কাছে গিয়ে বসেছি। বিজ্ঞানাচার্যের সেবাব্রত রূপটি সেই পরিবেশে একটি অপূর্বতা দিয়েছে, আর নূতন আশা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। আচার্য বললেন, তাঁর স্বরে সংযত উচ্ছ্বাস ছিল, ''দেখ হে, বিজ্ঞানমন্দির এখন সেবামন্দির হয়ে সার্থক হয়েছে। দেশের ছেলেদের প্রাণটা একবার দেখ। উৎসাহটা দেখ। জ্ঞান ও কর্ম এমনি করেই মিলিয়ে নিতে হবে।''

আশা—আনন্দ—উৎসাহমিশ্র প্রাণপ্রদ একটা অনুভূতির গভীরতায় ক্ষণকাল স্থির হয়ে আছি, এমন সময় ক'বোঝা কাপড়চোপড় এবং কিছু সংগৃহীত অর্থাদি নিয়ে ক'জন নারী আপিস—ঘরের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হ'ল। এরা বারনারী। ''এস, এস, মা—লক্ষ্মীরা'' বলে আচার্য তাদের আহ্বান করলেন। পিতার সেই অকৃত্রিম স্নেহের আহ্বানে পরিত্যক্তাদের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল অকথিত থাকলেও তাদের মুখের ভাবে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে এমন প্রাণভরা আপন-করা সহজ আহ্বান তারা ত কই আর কখনও শোনে নি।

আচার্য অনেক দিন পর্যন্ত ছুটিতে বাড়ি যেতেন খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে। নিজ গ্রামের গল্প তাঁকে ধীরে ধীরে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে করতে বলতে শুনেছি। একদিন বললেন, ''দেখ, গ্রামে গেলে সকলের বাড়ি গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করতে হয়। আমার চেয়ে সব বয়সে বড় আছেন—কেউ দিদি, কেউ মাসি। বাড়িতে গেলে তাঁরা কাঠের পিঁড়ি পেতে দেন, আদর করে বসতে বলেন। সেসব ভারি মোটা পিঁড়ি। একালে হয়ত তোমরা দেখ নি। ক'পুরুষ ধরে তার ব্যবহার হয়ে আসছে। জ্যেষ্ঠদের নমস্কার করে সেই পিঁড়ির উপর গিয়ে বসি। তাঁরা কত যত্ন করে আম কেটে, আনারস কেটে বড় পাথরের পাত্রে সাজিয়ে দেন। তারপর বসে

বসে খেতে খেতে ঘর—সংসারের নানা সুখদুঃখের গল্প করেন।" কোথায় দেশবিক্রত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আর কোথায় গ্রাম—সুবাদে বর্ষীয়সী মাসী—পিসী, তবু এঁরা যেন একটু বিশেষ করেই পরস্পরের আপনার। এঁদের কথা বলতে আচার্যের মুখে সেই চিরসহজ সম্পর্কের মাধুর্যের স্পর্শ লাগত। আচার্য যেন নিজ গ্রামে একান্তভাবে গ্রামেরই, অপর কারও নন, এ—সম্পর্কে তাঁর জন্মের পূর্ব থেকেই পুরুষানুক্রমে চলে আসছে—জন্মের পরে নূতন করে গড়ে উঠবার অপেক্ষা রাখে নি।

ছাত্রদের সঙ্গেও তাঁর এই নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল—আমি তোমাদের, তোমরা আমার। ছাত্রদের সহজে আপন করে নিতে পারতেন তিনি। তাই দেখা যেত, পরীক্ষাগারের মুহূর্তগুলি আনন্দে, স্নেহ ও ভালবাসায় তিনি ভরে রেখেছেন। এই পথেই তাঁর বিজ্ঞানসাধনা বন্ধু-ছাত্রে সঞ্চারিত হয়ে ব্যাপক ও সার্থক হয়েছে। একদিন পরীক্ষাগারে ভিতর গিয়ে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়েছি। ঈষৎ ঢালু উঁচু একটি টুলের উপর তিনি উবু হয়ে বসে আছেন। ছাত্রগণ নীরবে আপন-আপন কাচের নল, শিশি-বোতল, এসিড প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত। আচার্যের ছোট একটি কাজ আমার হাতে সম্পন্ন হয়েছে বলে পরম খুশীতে তিনি আমার গালে-পিঠে কয়েকটা চড়-ঘুষি দিলেন। তাঁর আদরের এই অত্যাচারে অনেকেই ধন্য হয়েছে। তারপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক ছাত্রের কাঁধের উপর হাত রাখলেন। মুহূর্তেই দেখি, পরম কৌতুক ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে বৃদ্ধ আচার্য বালকের আনন্দে সেই যুবক-ছাত্রের পিঠের উপর চড়ে বসেছেন। ছাত্র সেই আনন্দে ও প্রেরণায় পবিত্র আধারটিকে পিঠে নিয়ে, পরমানন্দে পরীক্ষাগারের অপর প্রান্তে অনুরূপ একটি টুলের উপর নামিয়ে দিয়ে নিজ স্থানে ফিরে এসে আপন কাজে মনঃসন্নিবেশ করলেন।

১৩২৮ সনে মাঘের এক অপরাহ্নে তাঁর ঘরটি ভিতর গিয়ে হাজির হয়ে প্রণাম করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ালুম। খুব আনন্দিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন: "আরে, আরে, এস, এস, কবে বেরিয়েছ জেল থেকে?" উত্তর করলুম, "গতকাল।"

তিনি বললেন, "কেমন ছিলে? পৌষ-সংক্রান্তিটা তাহলে জেলের ভিতরই কেটেছে? এস, এস, পৌষ-পার্বণ তোমার ফাঁক যাবে না। সত্যানন্দ বাবুর বাড়ী থেকে নানারকম পিঠে এসেছে।" এই কথা বলে আলমারি খুলে একটি পাত্রে নিজ হাতে পিঠে সাজিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই চেয়ারটায় বসো। বসে বসে খাও, খেতে খেতে গল্প কর।" এমন আদর-যত্ন ঠাকুরমার দ্বারাই সম্ভব হয়। আচার্যের ভিতর ঐরূপ কেউ একজন ছিলেন, সন্দেহ নেই। সে পরিচয় অনেকেই হয়ত অনেকবার পেয়েছেন।

আর একদিন একটি পাত্রে মুড়ির উপর পয়রা খেজুরে গুড় ঢালতে ঢালতে বললেন, "খেয়েছ কখন এমন জিনিস? আমাদের খুলনার জিরেণের গুড়। কি সু—তারটা একবার দেখ। তোমরা কলকাতার লোক, হোটেলে বসে কেক খেতে শিখেছ, মুড়িগুড় তো তোমাদের কাছে ছিঃ ছিঃ পাড়াগেঁয়ে খানা"— বলে হাসতে লাগলেন। আবার বললেন, "আরে আমি বৈজ্ঞানিক একথা তো মানতেই হবে। আমি বলছি, তোমাদের ঐ চৌদ্দ সিকের এক বাক্স হান্টলি পামারের

সৌখিন বিস্কুট—আর আমাদের পাড়াগাঁয়ের দু'আনার মুড়িগুড় একেবারে সমান—পুষ্টিতে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু তোমরা শহুরে হয়েছ—মুড়িগুড়—জলখাবারে তোমাদের কৌলীন্য নষ্ট হবে।''

এক সন্ধ্যায় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে 'সময়ের সদ্ব্যবহার' সম্বন্ধে এক ঘন্টারও উপর বক্তৃতা দিয়ে, ''চল চল'' বলতে বলতে তাড়াতাড়ি এসে আচার্য তাঁর ছোট ঘোড়াগাড়িখানিতে উঠে বসলেন। বাহিরে হাত বাড়িয়ে, তাঁর সেই সনাতন কড়ির বোতল থেকে জল ঢেলে মাথায় থাবড়ে—থাবড়ে দিতে লাগলেন। এই মাঠে যাওয়া হবে সান্ধ্য ভ্রমণে। আচার্যের মোটর ছিল না ছোট ঘোড়ার গাড়িখানি সম্বন্ধে তিনি বলতেন, ''এ আমার মেডিকেল বিল, প্রত্যহ এই গাড়ি করে এসে মাঠে বেড়িয়ে হাওয়া না খেলে আমাকে ওষুধ খেতে হবে।'' গাড়ির মাথার উপর দুই টুকরি ল্যাংড়া আম দিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে আচার্য বললেন, ''চল, আজ রাতে সায়ান্স কলেজে থাকবে, আম খাবে।'' কলেজে নিজের ঘরটির ভিতর এসে তিনি অবিলম্বে রাত্রের স্বল্পাহার শেষ করলেন। তারপর তাঁর বহুবিক্রুত চৌপয়ের উপর শুয়ে পড়ে বললেন, ''তোমরা সব একজনে গোটা একটা করে আম খাবে।'' ঘর অন্ধকার—মুখ টিপে হাসলুম। কি কৃপণ রে বাবা ? তাঁর মাথায় ও পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি শীঘ্রই নিদ্রাগত হলেন। তারপর আমরা প্রত্যেকে—যতদূর মনে পড়ে—খাবার সময় চার বার গোটা একটা করে আম খেলুম। সকাল বেলা দুষ্টুমি ফাঁস করে দিলে পর তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ''বামুনের ছেলে, পেটুকতা তোমাদের পেশা।''

১৯২০ সালের পূর্বেকার কথা। আচার্য ২/৩ দিনের জন্য পাবনায় চলেছেন। পথে পদ্মা—তীরে পাকশীর রেল—বসতিতে এক ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে মধ্যাহ্নের স্নানাহার সমাপন করা হল। সংবাদপত্রে রামানুজ, এফ.আর.এস-এর অকাল মৃত্যুর সংবাদ পাঠ করে আচার্য বড় ব্যথিত হলেন। মৃত মনীষীর গুণের কথা অনেকক্ষণ বললেন। তারপর কথাবার্তার কালে আচার্যের এক পূর্বতন ছাত্র এসে প্রণাম করলেন। ইনি মুন্সেফ, অনেক বৎসর পূর্বে এম.এস.সি. পাশ করেছিলেন। মুন্সেফ—ছাত্রের গালভরা কাঁচাপাকা গোঁফদাড়িতে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আচার্য সকৌতুকে বলেন, ''তোমাদের এম.এস.সি.বি.এল্‌ কাণ্ডখানা বাপু আজও কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকল না।''

তারপর ষ্টীমারে পাবনায় পৌঁছে সদলে শীতলাইয়ের যোগেন মৈত্রের অতিথি হলেন। মৈত্র মহাশয়ের বাড়িতে ভাল হৃষ্টপুষ্ট গাই-গরু ছিল। গো—সেবার ব্যবস্থা ছিল পরিপাটী। গব্য ঘৃত বাড়ীতেই তৈরী হ'ত। এই সব সুব্যবস্থা দেখে আচার্য খুব খুশী হলেন। পরদিন অপরাহ্নে জনসভায় 'ধান ভানতে শিবের গীত'—মৈত্র মহাশয়ের গব্য ঘৃত সম্বন্ধীয় উদ্যোগের তারিখ করে আচার্য বললেন, ''বাড়ির তৈরি গব্য উঁচু দরের খাঁটি জিনিষ, আমরা অধ্যাপকরা এমন উপাদেয় জিনিষ পেলেই নিয়ে থাকি।'' বলা বাহুল্য, বিদায়—বেলায় মৈত্র মহাশয় আচার্যের গাড়িতে কলসী—ভরা গব্য ঘৃত তুলে দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন। আচার্যের খুব আনন্দ। কলকাতার বাসায়, ছেলেরা যে খাঁটি ঘি চোখে দেখতে পায় না।

সিভিলিয়ান জে, এন, গুপ্ত তখন বর্ধমান বিভাগের কমিশনার, চুঁচুড়ায় থাকেন। কৃষি–প্রদর্শনী খুলতে গিয়ে আচার্য সদলে তাঁর অতিথি। গুপ্ত সাহেবের বাংলোর মেঝের উপর আসন পেতে শাক–সুক্ত, ডাল–ঘালনা, ঝোল প্রভৃতি দিয়ে দেশী মতে আহারের ব্যবস্থা আচার্যের খুব পছন্দ হল। তারপর প্রদর্শনীর কার্য–অন্তে বৈকালিক খাবারের আসরে বসে আচার্য দেখলেন চর্বচুষ্যের ভিড়ে কয়েক ছড়া সোনার–বরণ উত্তম মর্তমান রম্ভা রয়েছে। রুমালখানি পকেট থেকে বার করে দুই ছড়া কদলী তুলে নিয়ে, পরম মনোযোগ সহকারে বাঁধতে বাঁধতে আচার্য বললেন, "ওহে, এ আমাদের অধ্যাপকদের পাওনা—লজ্জা করলে চলবে কি করে?" স্বচ্ছ হাসির লহর তুলে সকলে তখন আচার্যের পাওনা–গণ্ডার হিসাব সম্বন্ধে অবহিত হলেন। তারপর গুপ্ত সাহেব শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে সমস্ত রম্ভাগুলি সযত্নে বেঁধে নিজ হাতে আচার্যের গাড়িতে তুলে দিয়ে কৃতার্থ হলেন।

বক্তৃতায় আচার্য মাঝে মাঝে সেক্সপিয়র ও এমার্সন থেকে বচন উদ্ধার করে দিতেন। একদিন বেলা তিনটা আন্দাজ তাঁর ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, "ওহে, আমাকে ঘন্টাখানেক এই হিস্ট্রি অফ্ ইংলিশ ড্রামার খানিকটা পড়ে শোনাও। পারবে ত?" অগত্যা বেপরোয়া হয়ে, তাঁর হুকুমে হেঁকে পুরা এক ঘন্টা নাট্যরাজ্যে বিচরণ করা হ'ল। পড়া শেষ হতে বললেন "তুমি ত পড় ভাল হে।" যথা লাভ।

একদিন গিয়ে শুনলুম আচার্য স্নানঘরে আছেন—তবে আমি সেখানে যেতে পারি। দরজার ধারে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলুম, তিনি সাবান দিয়ে গেঞ্জি–মোজা–রুমাল সাফ করছেন। আমাকে দেখে খুশী হয়ে বললেন, "দেখ হে, তোমাদের আচার্য সাবান দিয়ে কাচছেন। নিজ হাতে কাজ যে করবে না—সে বাঁচবে না। আমাদের জাতটা কত আলসে। আবার মেয়েরা আজকাল বলতে সুরু করেছেন, রাঁধুনী না রাখলে শ্বশুরবাড়ী যাবেন না। সঙ্গীন ব্যাপার।"

অসহযোগ আন্দোলনের মুখে দেখে যখন চরকা এসে পড়ল আচার্য তখন বলেছিলেন যন্ত্রযুগে চরকার চেষ্টা পাগলামি—সময়ের গতি ফিরিয়ে দেবার মত। কিছুকাল পরে একদিন বিজ্ঞান কলেজে তাঁর ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পাকি–চরকায় তিনি দিব্যি সূতো কাটছেন। আমাকে দেখে বললেন, "দেখ হে, তোমাদের আচার্য চরকা কাটছেন। একদিন চরকার বিরুদ্ধে বলেছিলুম। মহাত্মার যুক্তি যেদিন বুঝলুম যে, আমাদের গরীব দেশে কোটি কোটি লোকের বেকার সময়টা একমাত্র চরকা দিয়েই কাজে লাগানো যায়, আর তাতে দেশজোড়া আলস্য ও অবসাদ ঘোচে, সেদিন থেকেই সূতো কাটতে আরম্ভ করেছি। দেখ তো, সূতা কেমন হচ্ছে?"

গান্ধীজী সে সময় বাংলার কয়েকটা স্থানে যাবেন। ভ্রমণব্যবস্থায় আচার্যের হাত ছিল। একদিন আচার্য বললেন, "নিদ্রা মহাত্মার একেবারে আয়ত্তের মধ্যে। বাস্ রে। ঠিক নেপোলিয়নের মত। ৫টায় সভা আরম্ভ হবে। ৪টা–৪৫মিঃ–এ বললেন—একটু ঘুমিয়ে নেবেন। অমনি নিদ্রাগত হলেন। ৪টা–৫৫মিঃ উঠে বললেন, "এই বার সভায় যাওয়া যাক।" একদিন আচার্য আমায়

ডেকে বললেন, ''ওহে, এক কাজ করতে পারবে? কঠিন কাজ কিন্তু।'' উৎসুক হয়ে উত্তর করলুম, ''কি বলুন।'' তিনি বললেন, ''আমাদের খুলনা অঞ্চলে——আমরা আবার খুলনে বলি——নমঃশূদ্ররা নাপিত পায় না। হিন্দু নাপিত মুসলমান-খ্রীষ্টানকে কামাবে, কিন্তু হিন্দু নমঃশূদ্রকে কামাবে না। এ কোন্ দেশী কথা বাপু! অনেক দুঃখে বিবেকানন্দ বলেছিলেন——আমাদের ধর্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে। সমস্ত জাতটা 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না করতে করতে মরতে চলেছে। তুমি ত বামুন, এখন নাপিত হয়ে খুলনা জেলার নমঃশূদ্র-গ্রামে বসতে পারবে? একাজ বামুনদেরই হাতে নিতে হবে।'' এই কঠিন কাজে হাত দিতে পারি নি।

পল্লীগ্রামের প্রতি আচার্যের প্রাণের টান বরাবর ছিল। পাবনার মৈত্রবাড়ির বাঁধাঘাটে বসে খালি গায়ে খাঁটি সরিষার তেল মেখে দস্তুরমত পাড়া গাঁয়ের ধরণে আনন্দে অবগাহন স্নান করতে তাঁকে দেখেছি। একবার নদীয়া জেলার ঝাউডাঙ্গা গ্রামে পল্লীপ্রান্তস্থিত হরিজন-পাঠশালার মেটে ঘরে শীতের রাত্রি যাপন করে ভোরবেলা তিনি চৌপয়ের উপর বসে আছেন। আমরা পল্লীর অভ্যন্তরে গৃহস্থ-বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ ও রাত্রিযাপন করে, তাড়াতাড়ি মাঠ পার হয়ে তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হতেই তিনি বলে উঠলেন, ''লোটা হাতে খুব ভোর ভোর মাঠ করে এসে বাঁচলুম——আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে।''

পল্লী-পাঠশালার বোধোদয় বইখানাও বোধ করি সেই জন্যে তিনি পরিণত জীবনেও ভুলতে পারেন নি। ১৯২০ সালের ২১শে নবেম্বর তারিখে কেম্ব্রিজ থেকে এই জ্ঞানতপস্বী একখানি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন: ''ছেলেবেলায় বোধোদয়ে পড়িতাম অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম অভিজ্ঞতা এবং তাহাই আহরণ করিবার চেষ্টায় আছি।'' মনের যৌবন বটে।

১৯১৮—১৯ সালের কথা। একবার ওঁদের গ্রামের কুলপুরোহিত—ঘরের এক ছেলের অনেককাল কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আচার্য সেই ফেরারি বিপ্লবীর জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন, ''সে ভাল আছে এই খবরটুকু পেলে, আমাদের গ্রামে তার বাড়ীতে জানিয়ে দিই। তা হলেই তার বাড়ীর লোক আশ্বস্ত হবে।'' আমি বললুম, ''তবে খবর পাঠিয়ে দিন, সে ভাল আছে।'' আচার্য আশ্চর্য হয়ে বললেন, ''তাই বলি, তোমাদের ভেতর এইসব স্বদেশীর গোলমাল আছে বাপু। ঠিক খবর জান ত?'' আমি বললুম, ''আজ্ঞে হ্যাঁ।'' আচার্য খুশী হয়ে তখনই খুলনার বিপ্লবী ফেরারি শ্রী সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে তার কুশলবার্তা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তাঁরই আদেশে আমাকে একদিন চন্দননগরে শ্রী মতিলাল রায়ের প্রবর্তক আশ্রমে সতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর অগ্রজের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

১৯৪০, এপ্রিল মাস। একদিন আমার কথার উত্তরে আচার্য বললেন, ''তা, তোমাদের বালি ত এই কাছেই। একদিন গেলেই হবে।'' আমি বললুম, ''আপনি ক'বছর আগে যাবার কথা দিয়েছেন। এখন আবার ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ এসে পড়লো। আমাকে আরামবাগের পল্লীতে সত্যাগ্রহ শিবিরে গিয়ে থাকতে হবে।'' আচার্য বললেন, ''আচ্ছা, পরে সে কথা হবে একদিন।''

প্রণাম করে বিদায় নিয়ে দরজার বাহিরে গিয়েছি, তিনি হেঁকে বললেন, "শোন, শোন।" ফিরে গেলুম। তিনি বললেন, "কি জানি বাপু, কখন আবার তোমাদের জেলখানায় চালিয়ে দেবে। তার পরের ব্যাপারে তো অনিশ্চিত। তার চেয়ে চল, বুধবার বালি যাই, কথা দিয়েছি যখন। কিন্তু দুদিনেই ব্যবস্থা করতে হবে।" সে দিন ছিল রবিবার। আমি খুব আনন্দিত হয়ে উঠলুম। তিনি বললেন, "কিন্তু গাড়ীর বন্দোবস্ত করতে হবে। কার গাড়ী পাবে তুমি? অসুবিধা হবে না ত?" আমি বললুম, "ডাক্তার পঞ্চানন চাটুয্যের গাড়ী পাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "তার গাড়ী কি করে পাবে?" আমি বললুম, "আজ্ঞে, তিনি যে আমাদের বালির লোক।" বালি আসবার দিন বিজ্ঞান—কলেজে পঞ্চানন চাটুয্যের মজবুত লম্বা চেহারা দেখে আচার্য খুব খুশী হলেন। বললেন, "আমি তো নামতে পারি না। তুমি আমাকে নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?" "আজ্ঞা হ্যাঁ, দেখুন না" বলে ডাক্তার চাটুয্যে আচার্যদেবকে পাঁজাকোলা করে তুলে অবলীলাক্রমে নীচে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর গাড়ীতে বসিয়ে দিলেন।

আচার্য হাসতে হাসতে বললেন, "কিছু ত জানতেই পারলাম না। তুমি মজবুত বটে।"

বালিতে গঙ্গা তীরের মাঠে সভা হয়। আচার্য সেখানে কথা রাখতে গিয়ে ছিলেন, কথা বলতে নয়—সভায় দাঁড়িয়ে কথা বলবার শক্তি তখন আর তাঁর ছিল না। আচার্যের পরণে সেদিন ছিল লুঙ্গি আর কোট, হাতে লাঠি।

এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে আচার্যের বক্তৃতা লিখে নিতেন। আচার্য তাঁকে বলতেন "এই আমার গণেশ।" গণেশের হাত ধরে পিছনে পিছনে সভায় প্রায় টেনে নিয়ে যেতন। উদ্যোক্তদের বলতেন, "এই আমার গণেশ, বসবার জায়গা দাও, যেন হাওয়া পায়। গণেশ না লিখলে আমার বক্তৃতা পণ্ড হবে।"

শেষের ক'মাস আচার্যদেব শয্যাগত ছিলেন। একদিন অপরাহ্নে তাঁর কাছে গিয়ে বসেছি। মোজা পরা শীর্ণ পা-দুখানিতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তিনি মাঝে মাঝে এক আধটা কথা বলছেন। তাঁর এক বন্ধু পাশে চেয়ারে বসে ছিলেন। বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করা হয়?"

আচার্য আমার দিকে চাইলেন। আমি চট্ করে কিছু জবাব দিতে পারলুম না। কারণ আমরা কিযে করি তার কিছু ঠিক নেই——আবার কিছু যে করি না তাও ত ঠিক নয়। বৃদ্ধ আবার সেই প্রশ্ন করলেন। তখন বুদ্ধি জুগিয়ে গেল। আমি বললুম, "আজ্ঞে, স্বদেশী করি"।

শেষের দিনে সন্ধ্যাবেলা যখন পদপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আচার্যদেব তখন সংজ্ঞাহীন! প্রায় এক ঘন্টা পরে তিনি চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন! মেঘলা সেই সকালটায় বিজ্ঞান কলেজে সেই পুঞ্জীকৃত দুঃখের কথা মনে পড়লে আজও চোখে জল আসে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র : জন্মশতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ : (খুলনা সম্মিলনী), ১৯৬১।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

রায়বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আচার্যদেবের মহাপ্রয়াণে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত যে শোকের ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি তাঁহার বিজ্ঞানসেবা, জনসেবা ও দেশভক্তির গুণে বাঙালীর হৃদয়ে এমন একখানি গৌরবের আসন পাতিয়াছিলেন যাহার তুলনা বিরল। বিজ্ঞানের চর্চায় তিনি যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আকস্মিক নহে। আমরা ছাত্রজীবন হইতে তাঁহার পৃথিবীব্যাপী যশোজ্যাতির কথা শুনিয়া আসিতেছি। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক রো (F. J. Rowe), সাহেবের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। তিনি আমাদের ক্লাসে আসিয়া প্রায়ই বলিতেন যে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ জগদীশচন্দ্র এবং তাঁহার পরেই প্রফুল্লচন্দ্র। তৃতীয় স্থান বিদ্রূপের সহিত তিনি বাগ্মীবর সুরেন্দ্রনাথকে প্রদান করিতেন। জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন বিজ্ঞানের সাধনায়। কিন্তু কোনও বৈজ্ঞানিক জনসেবা বা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ছাত্রজীবনে রসায়ন শাস্ত্রের উপদেশের সঙ্গে তিনি ছাত্রদের মনে যে স্বাধীনতা স্পৃহা ও দেশভক্তি জাগাইয়া তুলিতেন, তাহা তাঁহার অনেক ছাত্রই বলিতে পারিবেন। বিজ্ঞানের যন্ত্রগৃহ তাঁহার আত্মাকে একান্তভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই—এখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। প্রফুল্লচন্দ্র আচার্য জগদীশচন্দ্রেরই মত বিজ্ঞানকক্ষে নিরালা হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। কখনও কোনও সভা সমিতিকে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলে তিনি পারতপক্ষে তাহা এড়াইয়া চলিতেন। কিন্তু তাহার মধ্যে দেশসেবার যে দুর্দমনীয় স্পৃহা ছিল বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্র তাহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার বিজ্ঞানসেবার সঙ্গে যে স্বাদেশিকতার সংমিশ্রণ করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় তাঁহার ইংরেজি গ্রন্থ 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে' পাওয়া যায়। তিনি রসায়নতত্ত্ব ভালবাসিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় এই ভালবাসা অপেক্ষা তাঁহার আত্মমর্যাদা জ্ঞান ছিল অতি প্রখর। তিনি কোনও ক্ষেত্রেই আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই বিষয়ে তাঁহার মধ্যে যে তেজ দেখিয়াছি, যে সুতীব্র অনুভূতির পরিচয় পাইয়াছি তাহা বাঙালীজাতির একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিরূপে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের নানা প্রতিষ্ঠানের নেতা রূপে তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি যে অমায়িকতা ও সৌজন্যের অবতার, কোমলস্বভাব প্রফুল্লচন্দ্র সত্যনিষ্ঠায় অমিততেজা ছিলেন। তিনি যখন রাজসাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, আমি তাঁহার একজন সঙ্গী ছিলাম। এই সম্মেলনে দলাদলি প্রসঙ্গে তিনি যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল।

আজীবন ব্রহ্মচারী, সংসারে অনাসক্ত এই মহাপুরুষ কর্মজীবনে যে নিরলস সেবার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। নিজের জন্য ভাবনাশূন্য এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কিরূপে পরের ভাবনার বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে আমরা আশ্চর্য হইয়া যাইতাম। বন্যাপীড়িতের জন্য, দুর্ভিক্ষক্লিষ্টের জন্য, আর্তের জন্য তাঁহার আর্তির অন্ত ছিল না। লোকের

দুঃখ কষ্ট মোচনের জন্য তাঁহার যে ব্যাকুলতা, তাহা তাঁহার বিপুল দানে এবং বিপুলতর সহানুভূতিতেই পরিসমাপ্ত ছিল না। লোকের দুঃখকষ্ট অন্নাভাব কিসে দূর হয়, এই চিন্তা তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া ছিল। বাঙালী যুবকদিগকে সচেতন করিতে, সতর্ক করিতে, প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে তাঁহার চেষ্টার অবধি ছিল না। নিজেদের দেশের ধন যদি অপরে লুটিয়া লইয়া যায়, আমাদের স্বল্পবিত্ত যদি আমরা স্বেচ্ছায় বিদেশে ছড়াইয়া দি, তবে আমাদের লোকেরা দুমুঠো খাইতে পারিবে কি করিয়া? আমরা শুধু আইনজ্ঞ হইয়া নিরন্নের সংখ্যা বাড়াইতেছি, কেরাণীগিরি বা শিক্ষকতা করিয়া দিন চালাইতে অক্ষম হইতেছি আর অন্য প্রদেশ হইতে চতুর ব্যবসায়ীরা আসিয়া লক্ষপতি হইয়া দেশে ফিরিতেছে—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্য আর কি হইতে পারে? আচার্যদেব মর্মে মর্মে ইহা অনুভব করিয়াছিলেন এবং বঙ্গের শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী যাহাতে ইহার প্রতিরোধের জন্য বদ্ধপরিকর হয় সেজন্য তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। দেশের অর্থনীতিক সমস্যা সমাধানের জন্য এরূপ উৎকণ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতাদিগের মধ্যে বিশেষ ছিলেন না; 'বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার' পুস্তক লিখিয়া এবং বহু প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সাহায্যে তিনি এই কথাই তাঁহার দেশবাসীর নিকট অমোঘবাণীতে শুনাইয়া গিয়াছেন। আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের বাণী যেমন কালের অস্পষ্ট সোপানরাজি বাহিয়া চলিয়া আসিতেছে, প্রফুল্লচন্দ্রের বাণীও তেমনি বহুকাল ধরিয়া বাঙালীর মানসকে প্রভাবিত করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি আমাদের বর্তমান শিক্ষার নিন্দা করিয়া গিয়াছেন,— যে শিক্ষা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত হই— যে শিক্ষাদানে তাঁহার নিজেরও একটি প্রকাণ্ড অংশ ছিল—সে শিক্ষাকে তিনি অসন্দিগ্ধ ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। বস্তুতঃ যে শিক্ষা স্বাবলম্বন শিক্ষা দেয় না, যে শিক্ষায় জনসাধারণের অন্নকষ্ট ঘুচে না, যে শিক্ষায় পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙালী টিকিয়া থাকিতে পারিবে না, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপ্রাণ প্রফুল্লচন্দ্রের বিচারে সে শিক্ষার কোনই মূল্য ছিল না।

তিনি শুধু আমাদের কেরাণীগিরির তকমাধারী যুবকদের নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু প্রকাণ্ড ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে বাঙালীর মস্তিষ্ক শ্রমিক শিল্পের সাধনায়ও অপটু নহে। প্রফুল্লচন্দ্রের জনসেবার মূলে যে ব্যাপক দৃষ্টি ছিল, তাহার সঙ্গে এক তীব্র ব্যাকুলতার মিশ্রণ হইয়া অপূর্ব সার্থকতায় পরিণত হইয়াছিল। দেশের যুবকদের সম্বন্ধে এরূপ নিবিষ্টভাবে অপর কেহ চিন্তা করিয়াছেন কিনা জানি না। তিনি আজীবন দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু যে সকল ছাত্র তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করেন নাই, তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহচ্ছায়ালাভ ব্যর্থ হইয়াছে, তাঁহাকে এরূপ দুঃখ করিতে শুনিয়াছি। তিনি যে দেশের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল এই আদর্শবাদ। তিনি একজন সরকারী বেতনভোগী কর্মচারী হইলেও তিনি রাষ্ট্রনেতার গৌরবময় আসন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন এই জন্য যে, তিনি দেশের জন্য চিন্তা করিতেন, দেশের দুঃখ-মোচনের জন্য সর্বস্বপণ করিতেন এবং তিনি যে অমূল্য উপদেশ দিতেন হাতে কলমে তাহার সার্থকতা দেখাইয়া দেশবাসীর প্রকৃত শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতেন। মহাত্মা গান্ধীর খদ্দর-নীতি তিনি বিশেষ বিচার করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একবার যখন তিনি ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে

পারিলেন, তখন হইতে অসামান্য অধ্যবসায়ের সহিত ইহার প্রচারকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে একবৎসরের কিঞ্চিদূর্দ্ধ কালের মধ্যে তিনি বৃদ্ধ বয়সে ত্রিশ হাজার মাইল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এই প্রচারকার্যের জন্য! রাষ্ট্রনেতা হইতে হইলে এইরূপ নীরবকর্মীর প্রয়োজনই এখন বেশি। বক্তৃতার দিন চলিয়া গিয়াছে; কাজ করিবার এই একান্ত প্রয়োজনের সময় প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় এক মহান আদর্শ লাভ করিয়া বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্রের অবসরবিনোদন ছিল সাহিত্য-চর্চায়। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইলেও সাহিত্য চর্চায় তাঁহার আগ্রহ কম ছিল না। শেক্‌সপীয়র সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ পত্রে তাঁহার ধারাবাহিক চিন্তাশীল প্রবন্ধ দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামের সহিত উপাধি সংশ্লিষ্ট না থাকিলে কেহ কেহ হয়ত তাঁহাকে অন্য লোক বলিয়া সন্দেহ করিত। এমনই নিপুণভাবে তিনি সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণ মানব হইতে হইলে যে সব গুণের সমবায় থাকা অবশ্যক এবং যাহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহারই মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সিনেট সভায় এবং অন্যত্র তিনি যখন বক্তৃতা করিতেন, তখন তাহার মধ্যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উচিত এবং শ্রোতা অনেক সময় ভুলিয়া যাইত যে প্রফুল্লচন্দ্র একনিষ্ঠ রসায়নবিৎ অথবা প্রবীণ সাহিত্যিক। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁহার বক্তৃতা ও রচনা অপূর্ব রসশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিত। স্মরণ রাখিতে হইবে, তিনি প্রথম যখন গিল্‌ক্রিষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাতে গমন করেন, তখন তাঁহার পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যই ছিল প্রধান। জীবনের প্রথমে কবিতা নাটক প্রভৃতি তাঁহার মনে যে মোহ বিস্তার করিয়াছিল প্রফুল্লচন্দ্র কখনও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রিয় নদী কপোতাক্ষীর তীরে তাঁহার জন্মগ্রহণ করা যে ব্যর্থ হয় নাই, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে।

বাঙালী আজ তাঁহার দিব্যমূর্ত্তির পাদপীঠতলে সমবেত হইয়া যদি তাঁহার বাণী মূলমন্ত্র স্বরূপে গ্রহণ করে, তাহা হইলেই এ জাতির উপকার হইবে। তিনি জীবনে নিন্দা বা প্রশংসার জন্য কখনও লোভ করেন নাই। মর্মর মূর্ত্তি রচনা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিলে তাঁহার পূজা সার্থক হইবে না। তাঁহার পূজা সার্থক হইবে অন্নহীনকে অন্ন দিলে, দরিদ্র শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সুযোগ দিলে এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেই তাঁহার পুণ্য স্মৃতির প্রতি পুষ্পচন্দন অর্পিত হইবে।

ভারতবর্ষ: শ্রাবণ, ১৩৫১

নবযুগ-নাগার্জুন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

মানুষের জন্ম মৃত্যু অনাদি এ সৃষ্টির বিধান ;
মৃত্যু করে বারে বারে জীবকোষে নব জন্মদান।
অমৃতের পুত্র তারা মর্ত্ত্যলোকে চির-মৃত্যুহীন ;
হলেও নশ্বর দেহ কালধর্মে পঞ্চভূতে লীন
আত্মা চির অবিনাশী— নিত্যমুক্ত-অনন্ত পুরুষ ;
জাতির জীবনে তাই চিরন্তন মাটির মানুষ।

এসেছিল নাগার্জুন বিস্মৃত সে কোন যুগে কবে—
ধন্য করি পুণ্য দেশ মনীষার অতুল গৌরবে,
রসায়নী রসতন্ত্রে নব নব সৃজিয়া বিস্ময়,
চলে গেছে স্বর্গলোকে; বিশ্ব তারা আজো গাহে জয়!
মৃত্যু-জয়ী নাগার্জুন বেঁচে আছে কীর্ত্তি মাঝে তার
মানুষের অমরত্ব গুণ কর্মে ভুবনে প্রচার।

ডুবেছে শতাব্দী শত একে একে কালস্রোতে ধীরে,
সমাহিত সুধী কত, অতীতের স্মৃতির মন্দিরে
নবীন আচার্য এল এ প্রাচীন জগতে আবার
বিকশিল রসার্ণবে জ্ঞান-পদ্ম দিব্য প্রতিভার ;
নব নব বর্ণ বিভা বিজ্ঞানের রসায়নলোকে
বিকীর্ণ করিল সে যে রসঘন নূতন আলোকে।

পৃথিবী পরালো তারে বহুমানে যশের মুকুট ;

আপনি ইন্দিরা দিল স্বর্ণে মুদ্রা ভরি করপুট;
ত্যাগী সে, নির্লোভচিত্ত, সদাব্রতী, নহে স্বর্ণে বশ,
রসের সন্ধানে মত্ত আত্ম-ভোলা বিজ্ঞান-তাপস;
অসহায়ে বুকে নেয়, নিরাশ্রয়ে স্নেহে ধরে হাতে
জাতি ধর্মে নাহি ভেদ, আত্মীয়তা বসুধার সাথে।
উচ্চারি' স্বাতন্ত্র্য মন্ত্র বিজ্ঞানের বহিয়া পতাকা
দারিদ্র্যের পঙ্ক হতে উদ্ধারিয়া অবরুদ্ধ চাকা
ভারতের প্রাণ-রথে চেয়েছিল দিতে অগ্রগতি-
দানবীর-কর্মবীর-নিখিল নমস্য মহামতি!
নির্বাণ লভেছে সেই তপঃসিদ্ধ রসায়ন ঋষি
স্মৃতির অরণি যার তেজোদীপ্ত রবে দিবানিশি।

হারাইয়া তারে জানি সর্বহারা হল আজি দেশ;
গৌরবের শেষ চূড়া ভাগীরথী-কূলে বিনিঃশেষ।
তবু জানি নহে ইহা সাধকের সমাপ্তি চরম
কঠোর তপস্যা তাঁরে সার্থকতা দিয়েছে পরম।
প্রেম রসায়নে তাঁর সোনা হয়ে গেছে আজ যারা
সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভারতের গড়ে যাবে তারা।

দিগন্তে নবীন সূর্য সমুদিত যার তূর্য রবে
জ্ঞানের অরুণ-বিভা বিচ্ছুরিত অপূর্ব গৌরবে,
তাঁহার আদর্শ বরি' শোক-অশ্রু করিয়া মার্জনা
জননীর মুক্তি লাগি সারা দেশ করুক সাধনা;
নবযুগ-নাগার্জুন অনন্তে হবার আগে লয়,
সঞ্জীবনী প্রাণ-মন্ত্রে সবারে যে দিয়েছে অভয়!

'ভারতবর্ষ': শ্রাবণ ১৩৫১

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৮৮৮ সাল। একটি জাহাজ এসে কলকাতা বন্দরে থামল। জাহাজ থেকে নামলেন এক যুবক। ছ'বছর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে সেখানকার ডি.এস.সি. উপাধি লাভ করেছেন, আর তাঁর প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ার পঞ্চাশ পাউন্ডের এক পুরস্কারও পেয়েছেন। সে টাকাটা পুরোই লেগে গেল জাহাজ ভাড়া প্রভৃতি খরচায়। পৌঁছলেন একেবারে কপর্দকহীন। জাহাজের কোষাধ্যক্ষের কাছে জিনিষপত্র রেখে তাঁর কাছ থেকে ধার করে নিলেন আটটি টাকা। পরণে সাহেবী পোষাক, সে পোষাকে তো আত্মীয়স্বজনের কাছে যাওয়া চলে না! নেমেই ছুটলেন এক বন্ধুর বাড়ি। বন্ধু হলেন জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁর কাছ থেকে ধুতি, পাঞ্জাবি চেয়ে নিয়ে তা পরলেন। এখন এলেন নিজ বাড়িতে। এই হলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

তখনকার দিনে বিলেতে পরীক্ষায় যাঁরা কৃতিত্ব দেখাতেন, তাঁরা সেখান থেকেই চাকুরির যোগাড় করে দেশে ফিরতেন। প্রফুল্লচন্দ্র সে-রকম কিছু করে আসেন নি। একটি বছর এখানে বেকার থাকতে হলো, তারপর জুটল প্রেসিডেন্সি কলেজে সরকারী অধ্যাপকের পদ। আই. ই. এস. তো নয়ই, বি.ই.এস-ও নয়; শ্রেণীর বাইরে আড়াই-শ' টাকা বেতনের এক পদ।

নিজের কথায় আসি। কলকাতার স্কুলে Mercurous nitrite আবিষ্কৃত হয়েছে, হিন্দু রসায়নবিদ্যার ইতিহাস লেখার মালমশলা সংগৃহীত হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চলেছে কি করে বক্তৃতার দ্বারা, বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকে ছাত্রদের কাছে মনোজ্ঞ করে তোলা যায়। সফলকাম হতে বিলম্ব হলো না; আর পাশের ঘরে রইলেন তাঁর জুটি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু। অন্য কলেজের ছাত্রেরা দলে দলে এসে এঁদের বক্তৃতা শুনে যেত। সে সময় প্রেসিডেন্সী কলেজ বললেই তো বোঝাত জে.সি.বোস- পি.সি.রায়।

নিজের কথায় আসি। কলকাতার 5th Class থেকে পড়ছি। এই দুই মহাজ্ঞানীর নাম চারদিকে, কিন্তু কি দুদৈব! এফ-এ পাস করলুম, আজও এঁদের দর্শন লাভের সুযোগ ঘটল না।

১৯০১ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিক। আজ থেকে ঠিক ষাট বছর আগের এক দিন। আর কে ঠেকায়, আজ তো প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখব, খুব কাছ থেকেই দেখব, সপ্তাহে তিনচার দিন করে দেখব। তিনি যে আমাদের ক্লাস নেবেন! প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি।

১১টা থেকে ১২টা একটা ক্লাস ছিল। ঘন্টা বাজল, আমরা বারাণ্ডা দিয়ে ছুটতে থাকলুম, কে সামনে গিয়ে বসতে পারে। সব গিয়ে হাজির হলুম। দ্বিতীয় ঘন্টা পড়ল, দরজা খুলে বেয়ারা ঢুকল, হাতে তার রেজিষ্টারি। টেবিলের উপর রেজিষ্টারি খানা রেখে পাশে গিয়ে সে দাঁড়াল। উদ্‌গ্রীব হয়ে ওই দরজার দিকে সকলে তাকিয়ে আছি, স্মিতমুখে প্রবেশ করলেন

অধ্যাপক মশাই। বিলেত ফেরৎ, অথচ টাই বাঁধা নেই, গলাবন্ধ একটা কোট পরা, কোটটা সুতির, সাদা-কালো চৌখুপিওয়ালা ছিটের। রেজিষ্টারি খুলে নাম ডাকলেন, ছাত্রদের একটু-আধটু পরিচয় নিতে থাকলেন। কিন্তু সে কথা থাক। যেটা বিশেষভাবে চোখে পড়ল সেটা হলো এই— তাঁর গায়ে যে রকমের কোট অবিকল সেই রকমের কোট ওই বেয়ারার গায়ে।

বিকাল প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কথাটা পাড়লুম গুপীবাবুর কাছে। স্যার, এটা কি রকম হলো, অধ্যাপকের গায়ে যে রকমের কোট ওই বেয়ারার গায়ে অবিকল সেই রকমের কোট!

হাসতে হাসতে গুপিবাবু বললেন,— হ্যাঁ, হে, একটা থান কিনে চারটা কোট করিয়েছিলেন, দুটো বেয়ারাকে দিয়েছেন, দুটো নিজে পরেন। একটা কথা চল্‌তি আছে, একজন লোকের চেহারা দেখে, তার বেশভূষা দেখে, ভিতরের মানুষকে চেনা যায় না। কিন্তু এই তো প্রথম দিনেই চেনা গেল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে।

এর বহু বছর পরে এক দিনের এক ঘটনা— জ্যৈষ্ঠ মাস, ভীষণ গরম, সকাল থেকে গুমোট করে রয়েছে। বেলা ৮টা সাড়ে ৮টা হবে। সতীশ মিত্র, আমার এক ছাত্র, এসে বলল— পি.সি.রায়কে আমি কাছ থেকে দেখিনি, আমাকে নিয়ে চলুন তাঁর কাছে, আলাপ করিয়ে দিন। আচার্যদেব এখন থাকেন বিজ্ঞান কলেজের দোতলায় দক্ষিণ দিকের এক ঘরে। ঘর খোলা থাকে, অবারিত দ্বার, যার যখন ইচ্ছে যাচ্ছে। আমরা ঘরে ঢুকলুম, দেখলুম তিনি শুয়ে শুয়ে পড়ছেন সেক্সপীয়র। বললেন,—'বোস, শোন এই জায়গাটা'— বলে কিছুটা পড়ে গেলেন। তারপর, কি মনে করে, বল। আমি বললুম— এই ছেলেটি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের পৌত্র, আমাদের কলেজ থেকে বি.এস.সি পাশ করেছে। অনেকক্ষণ ধরে নানা কথাবার্তা হলো। আমরা চলে এলুম। বাইরে বারাণ্ডায় এসে সতীশ আমাকে বলল— দেখলুম ওঁর ঘরে পাখা নেই, আমি আজ দুপুরে একখানা পাখা ও একজন মিস্ত্রী সঙ্গে করে এসে ওঁর ঘরে পাখা টাঙিয়ে দিয়ে যাব। আমি বললুম,— দাঁড়াও, ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি। এ আর কি জিজ্ঞেস করবেন! না, হে, না, জিজ্ঞেস করা ভালো! দুজনে আবার ফিরে গেলুম তাঁর ঘরে। সতীশের প্রস্তাবের কথাটা তাঁকে জানালুম। দমাস্ করে একটা কিল পড়ল আমার পিঠে। দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন— এটা কোন্ দিক? কেন, স্যার, দক্ষিণ দিক। তবে! আমি চুপ করে রইলুম। এই 'তবে' কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারছিলুম না। এখন তিনি বলে চললেন— দরজা খুলে রাখলে প্রচুর হাওয়া আসে, পাখার কোন দরকার হয় না। বলে নিজের স্থানে ফিরে গেলেন। আমরা হতবাক্। ঘরের দক্ষিণ দিকে একটা দরজার থাকলে সে ঘরে পাখার দরকার হয় না, সেটা বুঝতে একটু দেরি হচ্ছিল। চুপচাপ যে যার বাড়ির দিকে রওনা হলুম।

একদিন দুপুর বেলা আচার্যদেবের কাছে গেলুম। সেদিন ছিল রবিবার, সুতরাং পরীক্ষাগারে থাকতেন না, তাঁর ঘরেই তাঁকে পেলুম। কাজ সেরে চলে আসছি। ওই ঘরের মধ্যেই ছোট একটু ঘেরা জায়গায় কুকারে তাঁর রান্না চড়েছিল। সামনে বেয়ারা ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলুম—

আজ কি রান্না হচ্ছে? বললো— ভাত, মুশুরির ডাল, আলুসিদ্ধ। আমাদের কথাবার্তা বোধ হয় আচার্যদেবের কানে পৌঁছেছিল। তিনি এগিয়ে এসে বললেন মাখন দিয়ে আলুসিদ্ধ খেয়েছ? চমৎকার! একেবারে অমৃত! আমি মাঝে মাঝে খাই। বলে ফিরে গেলেন। 'মাঝে মাঝে খাই'। রোজ খাবার পয়সা কোথায়! সাতশ টাকা মাসে মাইনে, তার সবই তো প্রায় যায় ছাত্রদের দিতে। বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর হিসেবে যা পান তা তো সেখানকার কর্মীদের ক্লাবে দিয়ে আসেন, তারা আমোদ-আহ্লাদ করবে। আর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষক হিসেবে যা আসে তা যায় অন্য এক প্রতিষ্ঠানে। বাড়তি টাকা আর কটা!

তাই যখন তাঁর সত্তর বছর বয়স পূর্ণ হলো তখন যারবেদা জেল থেকে মহাত্মাজী লিখে পাঠিয়েছিলেন—

It took my breath away when I heard that out of his princely salary he kept only a few rupees for himself and the rest he devoted to public uses and particularly for helping poor students.

পারের দিকে এক পা এগিয়ে দিয়েছি। দ্বিতীয় পদক্ষেপের আর বিলম্ব নেই। সেখানে পৌঁছলে সেখানকার অধিকর্তা যখন জিজ্ঞেস করবেন— পৃথিবীতে পাঠালুম, কি দেখে এলে?

উত্তরে বলব— পৃথিবীর খুব বেশি কিছু দেখি নি, তবে দেখেছি—

একটি ধানের শিষের উপরে

একটি শিশির বিন্দু।

আর মানুষ দেখেছি খুব বেশি নয়। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন— প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

রাজনীতি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মধ্যে মতভেদ ছিল গভীর। প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলতেন— Researches can wait, industries can wait, but Swaraj cannot wait আর রবীন্দ্রনাথের কথা ছিল,— The complete man must not be sacrificed to the patriotic man, or even to the merely moral man.

কোন্ কথাটা ঠিক, ভাবীকাল তার বিচার করবে। কিন্তু এই দুই মহাজ্ঞানীর মধ্যে একটা বিষয়ে মিল ছিল, সেটা হলো গঠন কর্ম। তাই একজন গড়লেন বেঙ্গল কেমিক্যাল, অপরজন প্রতিষ্ঠিত করলেন শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন।

১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করে যখন তিনি বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন তখন এই কলেজ থেকে তাঁকে যে বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হয়— তাতে বলা হয়েছিল— বিজ্ঞান কলেজ এবং রাসায়নিক গবেষণা যেন দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার অক্লান্ত সেবায় ও উৎসাহে শক্তি লাভ করে। উত্তরে আচার্যদেব বলেন—

যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার কার্যকাল শেষ হইবার সময় আমি কি মূল্যবান সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা হইলে প্রাচীনকালের কর্নেলিয়ার কথায়

আমার ছাত্রদিগকে দেখাইয়া আমি উত্তর দিব— এরাই আমার রত্ন।

তাইতো তাঁর সত্তর বছর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হোত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবশক্তি। আচার্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

সেদিন প্রফুল্লচন্দ্রকে পাশে বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ কথাগুলি বলেছিলেন। আজ তাঁদের কেউই নেই। আজ উভয়ের জন্মশতবার্ষিকে উভয়ের জয়ধ্বনি করে আমরা ধন্য হই, কৃতকৃতার্থ হই।

আচার্য-বাণী

স্যার অ্যাস্‌লি ইডেন যখন বাংলার ছোটলাট ছিলেন, তখন তিনি বৎসরে ৫০০ পাউণ্ড খরচ করিয়া দুইটি কৃষিবৃত্তির প্রবর্তন করেন। এই বৃত্তিদ্বারা প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন সর্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান হইত। এক একজন ছাত্রের পিছনে ২৫০ পাউণ্ড খরচ হইত। তখনকার দিনে একশত পাউণ্ডের মূল্য এখনকার তিনশত পাউণ্ডের সমান। প্রথম বারে যান একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু। মুসলমান ভদ্রলোকটি বিহারের সৈয়দ সহকৎ হোসেন। হিন্দু ভদ্রলোকটির নাম অম্বিকাচরণ সেন। তাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়া যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাদের অর্জ্জিত কৃষিবিদ্যা কোন কাজে লাগাইবার সুযোগ হইল না। তাঁহারা হইলেন ষ্ট্যাট্যুটারি সিভিলিয়ান—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা জর্জ। তারপর ক্রমে ক্রমে গেলেন অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল রায়, নৃত্যগোপাল মুখার্জি ও ভূপালচন্দ্র বসু প্রভৃতি। ইঁহারা আমার সমসাময়িক। ফিরিয়া আসিয়া ইঁহাদের অধিকাংশেরই করিতে হইল ডেপুটিগিরি। ব্যোমকেশ বাবু হইলেন ব্যারিষ্টার। আর গিরীশবাবু স্কুলমাষ্টারির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের কৃষিশিক্ষা দেশের কোন কাজেই লাগিল না। এই প্রকারে দেশের কয়েক লক্ষ টাকা অকারণ অপচয় হইল।

পুণ্য স্মৃতি

জনাব মহম্মদ শহীদুল্লাহ

চার দশক আগেকার কথা। ইংরাজী ১৯১৯ সাল। কলকাতা মহানগরীর বুকে আপার সার্কুলার রোডের এক বিশাল অট্টালিকা। তারই ছোট্ট কামরায় বাস করেন শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ। মাথার চুল-গুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। মুখমণ্ডল কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফে ভর্তি। সাধাসিধে বেশভূষা, তেমনি চেহারা, আর ঠিক তেমনি স্বভাব। বাহ্যিক আড়ম্বর বা জাঁকজমক তাঁর জীবনে কখন স্থান পায়নি। ঘরের আসবাবপত্র আরও সাধারণ। একখানা ছোট চৌকি (দড়ির খাটিয়া) আর দুটো ছোট ছোট কাঠের আলমারি; তাও একে বারে আজে বাজে কেরোসিন কাঠের তৈরী। বৃদ্ধের জীবন-ইতিহাসে বিশ্রাম ও বাবুগিরি বলে কোন কথা লেখা ছিল না। তবুও দিন-রাত-চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে পাঁচ কি ছয় ঘন্টা অবসর মিলতো তাও কাটাতে হ'ত দড়ির খাটিয়ায়। কাঠের দুটো আলমারিতে থাকতো সারা সপ্তাহের খোরাক। চিড়ে, মুড়ি, গুড়, নারকেলের সন্দেশ অথবা এমনি ধরণের ঘরে-তৈরী একেবারে আটপৌরে কোন খাবার।

সপ্তাহের শেষের দিকে শনি-রবিবারের মধ্যে ডাক বিভাগ ও লোক মারফত বর্মা থেকে শুরু করে পাঠান অঞ্চল, নানা জায়গা থেকে খাবার এসে যেত। তাছাড়া অনেক সময় ভারতের বাইরে থেকেও খাবার আসতো। যেমন নানাপ্রকার খাবারে ভরে উঠতো ছোট্ট কাঠের দুটো আলমারি তেমনি বৃদ্ধের মনও ভরে উঠতো খুশীতে। হা কপাল! রবিবার হলেই আসতেন একজোড়া বিরাট গোঁফের অধিকারী—·গোঁফজোড়ার অনুপাতে দেহটাও তেমনি। ইনি শুধু গোঁফের মালিক ছিলেন না। যেমনি গোঁফ জোড়া, তেমনি দেহ, তেমনি বিদ্যা আর ঠিক তেমনি ছিল তাঁর মনের বিরাটত্ব। তাছাড়া সবচেয়ে মজার জিনিস ছিল তাঁর খাবার বহর। দু'তিন ঘন্টার মধ্যে তিনি একাই সাবাড় করে দিতে পারতেন পুরো দুটো আলমারির চিঁড়ে, গুড়, মুড়ি, সন্দেশ।

বৃদ্ধের ঘরের পাশে ছিল আরও দুটি স্বল্প পরিসর কামরা। সেখানে থাকতেন কয়েকটি ছাত্র। এঁরা দরিদ্র ছিলেন এবং ঐ বৃদ্ধের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থেকে তারঁই কাছে লেখাপড়া শিখতেন। বৃদ্ধের কাছে লক্ষ্মী-সরস্বতী দুজনাই বাঁধা পড়েছিলেন। অবশ্য একথা বললে একটুকুও বাড়িয়ে বলা হবে না যে, বৃদ্ধের আজীবন সাধনা ছিল এক হাতে লক্ষ্মী আর হাতে সরস্বতী বিলিয়ে যাওয়া। কুড়িয়ে নাও যে যত পার।

একদিন একটা বড় মজার ব্যাপার ঘটেছিল বৃদ্ধের পাশের কামরায়। পাশের কামরার ছাত্রকয়টি কলেজ থেকে ফিরে এসে যে-যার জামাকাপড় ছাড়তে ব্যস্ত। প্রায় সবারই জামাকাপড় ছাড়া হয়ে গেছে। হঠাৎ তাদেরই ঘরের মধ্যে কোন মানুষের একটা গোঁ গোঁ শব্দে সবাই চমকে উঠলো। ব্যাপার কি ? মনে হচ্ছে কে যেন একটা বিপদে পড়ে বেশ কষ্ট পাচ্ছে। হয়তো কিছুতেই বিপদ মুক্ত হতে পারছে না। তাই এই কাতরানি! সবাই উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে দেখে তাদেরই একজনার গায়ের জামা কেন জানি আর খুলতে চাইছে না!

এই দৃশ্য দেখে বাকী ছাত্র কয়টির আর আনন্দ ধরে না। বিনাপয়সায় ঘরে বসে বহুদিন বাদে এমন সুন্দর সার্কাস দেখা হচ্ছে! বেচারির দুঃখে সমবেদনা জানানো ত' দূরের কথা, এরা আনন্দে হেসেই কুটিপাটি।

এমনি সময় ব্যাপার দেখতে, বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ। কিশোর বয়সী কয়টি ছাত্র তাদের সহপাঠীকে তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারলো না— তাই এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ বিপদগ্রস্ত ছেলেটিকে বিপদমুক্ত করতে। দেখেই বৃদ্ধ বুঝলেন ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘোরালো! এখন কি উপায়ে গায়ের জামা খোলা যাবে? যে দর্জি জামা তৈরী করছে সে কি বোকা! সামনের দিকে কয়েকটি বোতাম লাগিয়ে রেখেছে। যতবার জামা খোলো আর পরো ততবার বোতাম খোলো আর লাগাও। এত কি সব কাজের কথা মনে রাখা সম্ভব। আর সময়ই বা কোথায় এত। তাও এই বয়সে! বয়স বাড়লে হয়ত চিন্তা করা যাবে ওসব কথা। বৃদ্ধ ছাত্রটির সার্টের সামনের দিকের বোতাম কয়টি খুলে দিয়ে পিট চাপড়ে সহাস্যে বললেন, 'আস্ত একটি দার্শনিক নিয়ে মুস্কিলে পড়েছি।'

আজ আর কেন— এবার পরিচয় করিয়ে দিই। শীর্ণকায় বৃদ্ধ ছিলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন বিজ্ঞানচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। মস্তবড় গোঁফ জোড়ার মালিক ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। দার্শনিক (!) ছাত্রটি ছিলেন মানিকগঞ্জের অধিবাসী, ঢাকার জুবিলী স্কুলের ছাত্র বিজ্ঞানবিদ ডক্টর মেঘনাদ সাহা। বাকী ছাত্র কয়টি হলেন— ডক্টর জ্ঞান ঘোষ, ডক্টর জ্ঞান মুখার্জী, শ্রীচারু মুখার্জী ও শ্রীরাসবিহারী দাস। এঁদের দানের কথা সর্বজনবিদিত।

ছেলেবেলায় লোকমুখে শুনেছিলাম "লক্ষ মুদ্রা মূল্যে ডাঃ পি.সি.রায়ের মাথা বিক্রী হয়ে গেছে।" এই ছোট্ট গ্রাম্য কথাটির তাৎপর্য ঠিক তখন বুঝতে পারিনি। সেবার বৈশাখে যখন শুনতে পেলাম প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ডাঃ রায় কিছুদিনের অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে স্বগ্রামে আসছেন, তখন আগে থেকেই তৈরী হতে শুরু করলাম তাঁকে দেখবার জন্য। বিশেষভাবে, তাঁর মাথা দেখতে হবে। কি ধরণের তৈরী, না জানি কতবড় সে মাথা, যা' দু'দশ টাকা নয় একেবারে লক্ষ টাকায় বিক্রী হ'ল!

ডাঃ রায়ের চেহারা-ছবি, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে একটা কল্পনা করে রেখেছিলাম। যদি আমার সে কল্পনা শেষ পর্যন্ত একবিন্দুও সত্য হয়নি। তাই, প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নাই নিজের চোখ নিজের কানকে। কল্পনার আংশিক সত্য হওয়া ত' দূরের কথা— একেবারে বিপরীত। ভেবেছিলাম হয়ত দেখতে পাব হ্যাট, কোট, প্যান্ট পরা এক সাহেব। তার পরিবর্তে দেখতে পেলাম এক অতি শীর্ণ, দীর্ঘকায়, শান্ত-শিষ্ট প্রশান্ত বৃদ্ধকে।

মুখময় কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে ভর্তি, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া, পরণে মোটা সূতার একখানা ধুতী, তাও হাঁটু ঢেকেছে মাত্র। পায়ে তালতলার চটি। চেহারা থেকে শুরু করে অশন-বসন, আহার-বিহার, চাল-চলন, কথা-বার্তা কিছুতেই তাঁর সাহেবিয়ানার বা বাবুগিরির চিহ্ন নাই।

খট্‌খট্‌ করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন বৃদ্ধ তাঁরই প্রিয় শিষ্য তৎকালীন কপিলমুনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস মহাশয়ের কাঁধে ভর দিয়ে। বিদ্যা, বুদ্ধি, সামর্থ্যে যাঁর দেহের প্রতি অণু-পরমাণু উজ্জ্বল, তাঁর আবার কিসের প্রয়োজন বাহ্যিক অলঙ্কারের ?

তাঁর কাছে জাতি, ধর্ম, ইতর, ভদ্র, দেশ কাল বা পাত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। দরিদ্রের জন্য তাঁর লক্ষ্মী-ভাণ্ডারের দ্বার সব সময়ে উন্মুক্ত ছিল। ১৯২১ সালে দক্ষিণ খুলনার দুর্ভিক্ষ ও ১৯২২ সালে মধ্য ও উত্তরবঙ্গের বন্যায় তাঁর সাহায্য বা দানের ফিরিস্তি দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বাঙ্গালী জাতির কিসে উন্নতি হবে, কেমন করে তারা স্বাধীন হবে, শিক্ষিত হবে এই ছিল তাঁর আজীবন সাধনা।

প্রতি বছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসাধিককাল অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে স্বগ্রাম রাড়ুলীতে কাটাতেন। তাঁর সখের মধ্যে ছিল— প্রতিদিন বৈকালে নৌকা ভ্রমণে যাওয়া। জনসাধারণ ও তাঁর নৌকা ভ্রমণের মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল। নৌকায় চড়ে তিনি নিজেই দাঁড় টানতেন। জরাজীর্ণ বৃদ্ধের দেহে ছিল বল ; দেহের বল অপেক্ষা মনের বলই ছিল তাঁর বেশী। আর সেই মনের বলের জোরেই তিনি এমনি ধরণের কঠিন কাজ সমাধা করতে পারতেন। প্রতিদিন এমনি করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কপোতাক্ষ' নদীতে নিজে দাঁড় টেনে নৌকাবিহারে বের হতেন। একদিন হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো সালকিয়ার কাছে। ঝড়ের বেগ সামলাতে না পেরে নৌকা ডুবলো। তার সঙ্গে পড়লেন ডাঃ রায় জলে। অনাথনাথ রায় নামে একটি যুবক আচার্য রায়ের একখানা পা ধরে তাড়াতাড়ি তাঁকে ডাঙায় তুললো।

১৯২১ সালের দক্ষিণ খুলনার দুর্ভিক্ষের কথা সর্বজনবিদিত। দেশময় হাহাকার। লোকের পেটে ভাত নাই, পরণে নাই কাপড়, দেহ কঙ্কালসার। অনাহারে অর্ধাহারে মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। গাছে ফল নাই, এমনকি অনেক গাছের পাতাও নাই। খাল-বিল শুষ্ক। মাছ সিদ্ধ করে যে খাবে লোকে, তারও উপায় নাই। এমনি দিনে তৎকালীন সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে খুলনার কালেক্টর ফকাস (L. R. Faucas) নামীয় একজন ইংরেজ আই.সি.এস.কে তদন্তের রিপোর্ট কি হবে পূর্বাহ্নে তা শিখিয়ে পড়িয়ে তদন্ত করতে পাঠান। নদীপথে যেতে যেতে কেওড়া নামক একপ্রকার জংলী ফলভর্তি গাছ দেখে তিনি পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী তদন্তের ফলাফল সরকারকে জানান— "গাছে ফল, ফুল ও পাতা ভর্তি, অতএব দুর্ভিক্ষের প্রশ্ন ওঠে না।"

তার ফলে বৃদ্ধ বয়সে ডাঃ রায়কে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বের হতে হয়। যখন তিনি আশাশুনি নামক স্থানে চাল, ডাঃ কাপড় বিতরণ করছিলেন সেই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ফকাসের। তীব্রকণ্ঠে তিনি রিপোর্টের বিরোধিতা করাতে ফকাস বলেছিলেন, " কি করতে পারি স্যার, আমার ওপর এমনি হুকুম আছে।" ডাঃ রায় জিজ্ঞাসা করলেন " Why have you reported like that"—উত্তরে ফকাস বলেন— "What can I do sir, if it is the policy of the Govt."—

এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আশা করি শ্রদ্ধেয় চারুবাবু দিয়েছেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্ত কর্মী বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে অতীব বিরল ছিল। এই দুর্ভিক্ষে তাঁর, অবশ্য আচার্যদেবের প্রেরণার অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক— তিনি বম্বে থেকে বহু অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করেন।

আচার্য—বাণী

শ্রমবিমুখতাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। কোন কাজ করিব না, হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব বা আরাম-চেয়ারে শুইয়া কেবল অন্যের সমালোচনা করিব! অথচ দেশকে অগ্রসর করাইব। আমরা আজকাল 'বাঙালী জাতি' বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু জাতি-গঠনের জন্য যে কত মালমসলা ও উপকরণ দরকার তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। অস্পৃশ্যতা-রূপ পাপ বক্ষে ধারণ করিয়া, আজ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া তাহার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে, ভাবিয়া দেখা যাক্। বাঙ্গালার লোকসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান। যিনি যাহাই বলুন না কেন, ইঁহাদের ধমনীতে হিন্দু রক্ত প্রবাহিত। কেবল আমাদের অনুদারতা ও অস্পৃশ্যতারূপ পাপের ফলে আজ ইঁহাদিগকে আমরা হিন্দু সমাজ হইতে হারাইয়াছি। আড়াই শত-তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যখন মুসলমান বীরগণ তাঁহাদের জয়পতাকা তুলিয়া 'মানবের ভ্রাতৃত্ব ও একত্ব' ঘোষণা করিয়াছিলেন; তখন ঝাঁকে ঝাঁকে তথাকথিত 'নিম্নবর্ণের' হিন্দুগণ ইস্‌লামধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এখনও তাহার অবশেষ পল্লীসমাজে দেখা যায়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রতিবেদন

১৬ই জুন বাঙ্গলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে বাঙ্গলার বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মানব দেশহিতে নিবেদিত প্রাণ সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আবার বর্ত্তমান বৎসরে ঐ দিনেই বাঙ্গলার বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ত্যাগী, কর্ম্মী, ঋষি, আচার্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিটের সময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। গত ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে আচার্যদেবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় হইতে তিনি প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়িতেছিলেন.... ঐ সময়ে শ্রীপুরে যাইয়া ৩ মাস কাল তিনি তথায় বাস করিয়াছিলেন। অরবিন্দবাবু তার গৃহ উদয়াচলে ঐ সময়ে আচার্যদেবের বাসের জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন।.... শরীরের নানারূপ গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় তিনি একস্থানে অধিকদিন থাকিতে ভালবাসিতেন না, সে জন্য তাঁহাকে পুনরায় বিজ্ঞান কালেজে আসিতে হয়। কিন্তু ৫/৭ দিন পরেই তাঁহার দেশের বাড়ীতে যাইবার জন্য আগ্রহ দেখা যায় ও শ্রীপুর হইয়া নৌকাযোগে তিনি রাড়ুলী গমন করেন। ঐ সময়ে তথায় তাঁহার এক জয়ন্তী-উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল– ১৯৪৩ সালের ২৪ এপ্রিল তথায় উৎসব হয়। তদবধি প্রায় এক বৎসর কাল তিনি বিজ্ঞান কালেজের গৃহেই বাস করিয়াছিলেন। এই এক বৎসর কাল তিনি সর্ব্বদাই কোন না কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করিতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছিল, স্পষ্ট করিয়া কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। এমন কি সকল সময়ে নিজে বিছানার উপর উঠিয়া বসিতেও পারিতেন না। গত ২১শে মে তিনি সহসা জ্বরে আক্রান্ত হন। কয়েকদিন জ্বর ভোগের পর আবার কয়দিন একটু ভাল ছিলেন। পুনরায় ৮ই জুন তাঁহার জ্বর হয় এবং চিকিৎসকগণ নিউমোনিয়া বলিয়া প্রচার করেন। শেষের কয়েকদিন প্রত্যহ সংবাদপত্রে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বুলেটিন প্রকাশিত হইত। শুক্রবার সকাল হইতে তাঁহার অবস্থা খারাপ হয়; ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিকাল ৪টার সময় তাঁহাকে শেষবারের জন্য দেখিয়া যান। . ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু তাঁহার সম্মুখে প্রার্থনা আরম্ভ করেন। প্রার্থনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শেষ নিশ্বাস বহির্গত হয়। .. পরদিন শনিবার সকালে তাঁহার শবের শোভাযাত্রা কলিকাতার বহু রাজপথ ঘোরাইয়া নিমতলা শ্মশানঘাটে গমন করে ও তথায় তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়। এই আত্মভোলা মানুষটির মধ্যে উচ্চ ও নিচের যেমন ভেদাভেদ ছিল না তেমনি তাঁহার কোন বিষয়েই অভিমান ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় সহজ সরল মানুষ, বর্ত্তমানকালে শুধু বিরল নয়—দুর্লভ। ...

ভারতবর্ষ শ্রাবণ, ১৩৫১

আচার্য রায়ের ময়দান ক্লাব

অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের ময়দান ক্লাব কলিকাতার ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজে এক সময়ে প্রায় সর্বজন-পরিচিত ছিল। আমি সেই ক্লাবের একজন অতি আদি ও অকৃত্রিম সভ্য ছিলাম বলিয়া দাবী করিতে পারি। সুতরাং সেই বিচিত্র সান্ধ্য-সমাবেশের বার্তা আমি কিছু কিছু দিতে পারি।

আজিকার দিনে সেই বার্তা দিবার আর বেশী লোক অবশিষ্টও নাই— কালের অমোঘ প্রবাহে সেই ক্লাবের সদস্যগণের অধিকাংশই আজ ওপারে চলিয়া গিয়াছেন। তাই ইচ্ছা হয়, যতটুকু মনে আছে তাহার কিছু কিছু সাধারণ্যে পরিবেশন করি। আশা করি একেবারে অদেয়মপেয়ম গ্রাহ্যং বিবেচিত হইবে না।

।। আচার্যদেবের সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত ।।

কি প্রকারে আমি আচার্যদেবের ময়দান ক্লাবে প্রবেশের অধিকারী হইয়াছিলাম, তাহার একটু বিবরণ আবশ্যক। আমি কলেজ জীবনের প্রারম্ভে কলিকাতার ছাত্র ছিলাম না, ছিলাম বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র; সেখান হইতে আই-এ. পাশ করিয়া কলিকাতায় বি-এ. পড়িতে আসি। সে-ও ভর্ত্তি হই সিটি কলেজে, প্রেসিডেন্সী কলেজে নহে। সুতরাং গোড়াতে আচার্য রায়ের সঙ্গে পরিচয়ের কোন কারণ ছিল না। প্রথম পরিচয় হইল একটু অন্যভাবে। আমরা ব্রজমোহন কলেজ হইতে আগত কয়েকজন ছাত্র মিলিয়া একটা মেসে থাকিতাম— ১০ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়ীতে। তখনকার মেসের—অন্ততঃ আমাদের মেসের—আবহাওয়া ছিল স্বদেশী-বিবেকানন্দী-ব্রজমোহনী-মিশান। পূজা-অর্চনা-কীর্ত্তন, রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ, বেলুড় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত— তদুপরি স্বদেশী ত আছেই। এইসব লইয়াই আমরা মশগুল থাকিতাম। সময় সময় কিন্তু এই ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস ও কীর্ত্তনানন্দের আতিশয্য পাড়ার লোকের কর্ণপীড়া উৎপাদন করিত। একবার এই রকম একটি ঘটনা উপলক্ষ্যে পাড়ার লোকদের সঙ্গে আমাদের মেসের ছেলেদের প্রায় রীতিমত মারামারি ঢিল-ছোঁড়াছুঁড়ি লাগিয়া গিয়াছিল। এই কলহ ব্যাপার হইতেই মেসের ছেলেদের সঙ্গেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয়ের সূত্রপাত।

।। আচার্য রায়ের বাসভবন ।।

ছেলেদের মধ্যে দুই একজনের কিছু যাতায়াত ছিল আচার্য রায়ের বাসভবনে। তিনি তখন থাকিতেন ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। সেখানে ছিল বেঙ্গল কেমিক্যালের একটি

গুদামের মত— সামনের বিস্তৃত উঠান ভর্ত্তি নানাবিধ কেরাসিন কাঠের বাক্স, পিপা ইত্যাদি ছড়াইয়া থাকিতে দেখিতাম। বাড়িতে উঠিতেই একটা কাঠের সিঁড়ি; দোতালায় উঠিয়াই সামনে যে কক্ষটি তাহাই আচার্যদেবের বাসগৃহ— একখানি লোহার খাটের উপর ছিল তাঁহার শয্যা। এখন সেই ৯১নং বাড়িতে S. Antool & Co. তাহাদের আস্তানা করিয়াছে। আর উত্তরে ৯২ নম্বরে তখন ছিল স্যার তারকনাথ পালিত মহাশয়ের দোতলা বাড়ী। তখন National Council of Education সেই বাড়ী ব্যবহার করিতেন Bengal Technical Institute- এর জন্য, এবং এখন তথায় University College of Science- এর বিশাল হর্ম্য স্থাপিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে আচার্যদেব সেই বিজ্ঞান-কলেজভবনের দোতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরটি দখল করিয়া লইয়া ৯১ নং বাড়ী হইতে ডেরাডাণ্ডা তুলিয়া সেই ঘরটিকেই তদীয় বাসভবনে পরিণত করিয়া লইলেন এবং আমরণ তিনি তথায়ই ছিলেন এবং সেইখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। একদিন মনে আছে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান কলেজ ভবন দেখিতে আসিয়াছেন— ঘুরিতে ঘুরিতে আচার্য্য রায়ের কক্ষে উপস্থিত, এবং বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের আসবাবপত্র বিছানা-সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা দেখিয়া ত অবাক্। আচার্যদেব কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইলেন না—পরন্তু সদম্ভে স্যার আশুতোষকে বলিলেন— Well, I live in the biggest bed-room in Calcutta! আমি তখন সেখানে উপস্থিত। এই বক্তৃতা শুনিয়া ত আর হাসি চাপিতে পারি না। স্যার আশুতোষ হোঃ হোঃ করিয়া উঠিলেন। যাক্, এ অনেক পরের কথা—কথাপ্রসঙ্গে উঠিয়া পড়িল।

।। বিবাদভঞ্জন ও পরিচয় ।।

মেসের কয়েকটি ছেলে আচার্য রায়কে গিয়া ধরিয়া পড়িল। বলিল, স্যার আপনি আমাদের মেসে গিয়া এই ব্যাপারের একটা বিহিত করুন, গোলমালটা মিটাইয়া দিন, পাড়ার লোকেদের ডাকিয়া। আচার্য রায় ব্রজমোহন কলেজের ছেলে ও অশ্বিনী দত্তের চেলা বলিয়া ইঁহাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাই তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া বলিলেন, তথাস্তু। অবিলম্বেই আমাদের সেই মেসে চলিয়া আসিলেন, পাড়ার মাতব্বরদের ডাকাইলেন ও তাহাদের বলিলেন, "দেখুন, আমি এই মেসের ছেলেদের চিনি; ইহারা কেহই দুষ্ট ফাজিল বা হল্লাবাজ ছেলে নয়; অশ্বিনী দত্তের চেলা কিনা এরা তাই একটু ধর্ম্ম পাগলা ও স্বদেশী-বাতিকগ্রস্ত, এবং অতিশয় সচ্চরিত্র ও নীতিনিষ্ঠ। আপনারা উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমিও এদেরকে বলিয়া দিতেছি যে বাড়াবাড়ি করিয়া আর আপনাদের শান্তিভঙ্গ না করে।" বলা বাহুল্য, গোলমাল মিটিয়া গেল। আর ও মেসে থাকিতে পাড়ার লোকেদের সঙ্গে কোন গোলযোগ হয় নাই। আচার্য্য রায়ের ন্যায় সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় ও বিখ্যাত লোক এই মেসে আসিয়াছেন এবং তিনি এখানকার ছেলেদের চেনেন এবং ভাল করিয়া জানেন, ইহাতেও পাড়ার লোকরা খুবই impressed হইয়াছিলেন। মেসের ছেলেদের সঙ্গে আচার্য রায়ের বিশেষ পরিচয়ের ইহাই সূত্রপাত। মেসে আসিলে স্বভাবতঃই আমার দিকেও তাঁহার নজর পড়িল- কারণ মেসের ছেলেরা আমার পরিচয় করাইয়াছিল।

ভাল ছেলে বলিয়া তকন আমার খুব নাম- বিশেষত: দুই দুই বার অর্থাৎ ১৯০৮-এ এন্টান্স পরীক্ষায় ও ১৯১০-এ আই-এ পরীক্ষায় University তে 1st হওয়া সত্ত্বেও আমি তদানীন্তন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম সরকার কর্তৃক সরকারী বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, এই কারণে আমার notoriety সমাধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আচার্যদেব আমাদের বলিলেন, তোরা মাঝে মাঝে আমার ওখানে যাস্ না কেন? সুতরাং খোলা পরোয়ানা লইয়া আমরা তাঁহার ওখানে (অর্থাৎ ৯১ নং বাড়ীতে) যাতায়াত সুরু করিলাম।

।। ৯১ নম্বরে চপ খাওয়া ।।

এই উপলক্ষ্যে আর একটা ব্যাপার হইল, তাহার ফলে আমাদের অন্তরঙ্গতা আরও নিবিড় হইয়া উঠিল - কারণ ইংরাজীতে একটা কথাই আছে, the way to an Englishman's heart is through his stomach. বোধকরি রচনাটি শুধু ইংরাজ মনুষ্যের কেন, সব মনুষ্যের উপরেই খাটে। ব্যাপার হইল এই, একদিন আচার্য্য রায় বলিলেন, "দেখ, তোরা ত মেসে থাকিস, গরীব মানুষের ছেলে, মাংস-টাংস ত খাইতে পাইস না, তা একটা কাজ কর্ না। আমাদের বেঙ্গল কেমিক্যালে ত Raw meat juiceতৈয়ারী হয় মাংস হইতে; রস নিষ্কাসনান্তে মাংসগুলি ত প্রায় ফেলাই যায়। আমি বলিয়া দিব সেই মাংসের কিমা করিয়া চপ বানাইয়া রাখিতে- তোরা মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া সেই চপ খাইয়া যাইস। কেমন, পারবি ত?" ফলাফল ত সহজেই অনুময়- পালা করিয়া মেস হইতে আমরা ছেলেরা আসিয়া চপ খাইয়া যাইতে লাগিলাম। পরিচয় ঘনীভূত হইল।

।। আচার্যদেব ও অশ্বিনীকুমার সাক্ষাৎ ।।

একদিন বরিশাল হইতে প্রাত:স্মরণীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় কলিকাতায় আসিলে আমাদিগের নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য। আমরা বলিলাম, তার আর ভাবনা কি? আমরাই আপনাকে ডাক্তার রায়ের নিকট লইয়া যাইব। সেই বন্দোবস্তই ঠিক রহিল। দশবারটি ছেলে একত্র হইয়া অশ্বিনীবাবুকে আমরা ৯১ নম্বর বাড়ীতে লইয়া গেলাম। আচার্য রায় তখন-প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়-তাঁহার দোতলার কামরায় ছিলেন। বোধহয় নীচের বাহিরের উঠানে, বালখিল্যদের কলরব শুনিয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইয়া থাকিবে। মোট কথা, তিনি তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন-কিন্তু ব্যাপার কি ঠিক ঠাহর করিতে পারিলেন না- শুধু দেখিলেন যে বালকদল পরিবেষ্টিত একটি প্রৌঢ় বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন। তখন অশ্বিনীবাবুর আন্দাজ ৫৫ বৎসর বয়স হইবে। আমরা ত মজা দেখিতেছি- দুইজনই নমস্য ব্যক্তি, দেশজোড়া তাঁহাদের উভয়েরই খ্যাতি, উভয়ের কীর্ত্তি কাহিনী ঢের শুনিয়াছেন কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় তদবধি হয় নাই। আচার্য রায় একটু দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া অশ্বিনী বাবু নিজেই আত্মপরিচয় দিয়া ফেলিলেন; বলিলেন,

I am Aswini Kumar Datta of Barisal- আর তৎক্ষণাৎই এই দুই মহাপুরুষের নিবিড় আলিঙ্গন ও অভিনন্দন-It was a sight for the Gods to see! আর আমাদের সুফল হইল এই মহাপুরুষদ্বয়ের সঙ্গমে ইহাই যে আমরা যে অশ্বিনী দত্তর চেলা তৎসম্পর্কে আচার্য্য রায়ে আর কোন সংশয়ে অবকাশ রহিল না। তখন হইতে তাঁহার ভবনে সদর-অন্দরে আমাদের অবারিত প্রবেশ।

।। ময়দান—পরিক্রমার সূত্রপাত ।।

আচার্যদেব বলিলেন, "দেখ্ তোরা সন্ধ্যাবেলা কি করিস?" আমি বলিলাম, সন্ধ্যাবেলা বেড়াই— "বিশেষত: গোলদীঘি অঞ্চলে। তিনি বলিলেন, তা বেশ, কিন্তু গোলদীঘিতে বড় ভীড়-বেজায় Congestion;তোরা ময়দানে যাস না কেন?The Maidan is the lungs of Calcutta-অত উন্মুক্ত প্রশস্ত প্রান্তর—সেইখানে সন্ধ্যার পরে যা,-একেবারে Bay of Bengal এর হাওয়া-Ozone অজস্র পরিমাণে পাবি, বুঝলি, বুঝলিনা?" পরামর্শটা ভালোই মনে হইল-তদুকরি আমার হাঁটবার অভ্যাস- রোজ সন্ধ্যায় দুইচারি মাইল আমি হাঁটি! তাই ভাবিলাম, বেশতো! হাঁটিয়াই ময়দানে যাওয়া যাউক। আমাদের মেস ঝামাপুকুর অঞ্চলে—মোটে ত মাইল দুয়েক এর পথ। তাই করা যাউক। আচার্য রায় প্রায় রোজই সন্ধ্যায় বেঙ্গলকেমিক্যালের ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া যখন ময়দানে গিয়া রেড রোড—এর উপর গাড়ি থামাইয়া নামিয়া পাদচারণা করেন, তখন ময়দানে গিয়া তাঁহার দলে ভিড়িলেই হইবে। আমার ময়দান- পরিক্রমার এই সূত্রাপাত। ততদিনে আমি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়াছি। ১৯১১-১২ সাল।

।। সত্যানন্দ বসু ।।

এই সময়ে আচার্য রায়ের সঙ্গে প্রায় প্রত্যহই থাকিতেন সত্যানন্দ বসু মহাশয়। তিনি থাকিতেন ৭৮ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে। গল্প শুনিয়াছি এ বাড়ির অনেকটা অংশ ভাড়া দিয়া নিজে প্রায় বিনা- ভাড়ায় এই বাড়িতে থাকিতেন, এবং আমরা দেখিতাম যে দোতলায় প্রকাণ্ড হলঘর সমেত অনেকগুলি ঘর তাঁহার নিজেরই দখলে ছিল। সত্যানন্দবাবু পূর্ববঙ্গের লোক—ঢাকাজেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিখ্যাত মালখাঁনগরের সম্ভ্রান্ত বসুঠাকুর বংশে তাঁহার জন্ম। অতি সম্মানিত সুপরিচিত ব্যাক্তি—দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভক্ত ও সহকর্মী—সেই যুগের কংগ্রেসের বাঙ্গালার একজন কর্ণধার— National Council of Education- এর অন্যতম সম্পাদক হিসাবে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহকর্মী— বেঙ্গল কেমিক্যালের একজন Director-- বয়সে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অপেক্ষা বছর পাঁচেক ছোট— কিন্তু বহু যুগ ধরিয়া উঁহাদের উভয়ের সৌহার্দ। ময়দানে যাইবার পথে আচার্য্য রায় সত্যানন্দ বাবুকে তাঁহার ধর্ম্মতলার বাসা হইতে গাড়িতে তুলিয়া লইয়া যাইতেন। আবার ফিরিবার পথে ঐ গাড়িতে করিয়াই সত্যানন্দবাবুকে তাঁহার বাড়িতে নামাইয়া দিতেন।

আর বাড়ির গাড়ি চড়িয়া আসিতেন আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু— বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। তিনি আচার্য রায় অপেক্ষাও ছিলেন অনেকটা বয়োজ্যেষ্ঠ— বোধ হয় বছর ১০/১১ বড়। তিনি আচার্য রায়কে 'প্রফুল্ল' বলিয়া ডাকিতেন, এবং 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমাদের বালখিল্য দলের বড় কৌতূহল ও আশ্চর্য্য বোধ হইত— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকেও তুমি বলিতে এমন লোকও তবে আছে? গিরিশবাবু ত বাংলার শিক্ষিত সমাজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ— স্বপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীনচেতা তেজস্বী ব্যক্তি; এবং অত্যন্ত আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ও দেশভক্ত। তিনি ছিলেন বিলাত-ফেরত; এবং সেই যুগের বিলাত-ফেরত—প্রায় আশি বৎসর পূর্বেকার—যখন বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেই রীতিমত ফেরঙ্গ-রোগগ্রস্থ হইয়া কালো সাহেব বনিয়া যাইতেন— তৎসত্ত্বেও চিরকাল তাহার পরিধানে ধুতি-চাদর ছাড়া সাহেবী পোষাক দেখি নাই। তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী— একই সময়ে বিলাত গিয়াছিলেন Cirencester College Of Agriculture- এ অধ্যয়ন করিতেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ত ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া উভয়েই দিগ্বিজয়ী ব্যারিষ্টার হইলেন কলিকাতা হাইকোর্টে। শ্রীঅরবিন্দের শ্বশুর, অর্থাৎ মৃণালিনীর পিতৃদেব, ভূপালচন্দ্র বসু ও বিখ্যাত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (D. L. Roy) ইঁহারাও Cirencester কলেজে গিয়েছিলেন। গিরিশবাবুর অপেক্ষায় ইহারা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ভূপাল বাবু দেশে ফিরিয়া Agriculture Department এই বড় পদে নিযুক্ত হইলেন এবং আসামে তাঁহার Service Career সমাপ্ত হইল। আর দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন— পরে তো তাহার কবিত্ব-প্রতিভা স্ফুটিত হইল— বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার হিসাবে পরিগণিত হইলেন। (অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কৃষিবিদ্যায় নিদর্শন স্বরূপ একখানা পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন ((The Crops of Bengal)। গিরিশবাবু ইঁহাদের উভয়কেই বিশেষ স্নেহ করিতেন— বিশেষতঃ ভূপাল বাবুকে ত কনিষ্ঠ সহোদরের মত জ্ঞান করিতেন। গিরিশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সদস্য ছিলেন— প্রায় সকল বিষয়েই তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল এবং তাহা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিতে কখন দ্বিধাসংকোচ করিতেন না। নির্ভীক স্পষ্ট বক্তা লোক ছিলেন তিনি। তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণধার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না।

।। বালখিল্যের দল ।।

বালখিল্য বা চ্যাংড়া দলে ছিলেন যাঁহারা তখন, তাঁহারা অধিকাংশই আচার্য্য রায়ের ছাত্র— প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে। আমি বোধ করি একমাত্র exception বা ব্যাতিক্রম— কারণ আমি কোন সময়ই উঁহার ছাত্র ছিলাম না। বি-এ ত পাশ করিলাম সিটি কলেজ হইতে; এম.এ প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িলাম বটে কিন্তু Mixed Mathematics এ; সে বিষয়ে ক্লাস বসিত কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণের পশ্চিমপার্শ্বে একটা ঘোড়ার আস্তাবল ছিল— তারই দোতলায়। কাঠের সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিতে হইত। Dr. Cullis ও Dr. D. N.

Mallik মহাশয়দ্বয়ই আমাদের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ক্বচিৎ কদাচিৎ দুই-একটি ক্লাস আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজের main building এ করিয়াছি। সুতরাং সে দিক দিয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার কোন সুযোগই আমার হয় নাই। কি প্রকারে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল তাহা ত পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। রায়ের ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রায়ই ময়দানে গিয়া আমাদের সঙ্গে জুটিতেন তখন তাঁহারা যুবক ছিলেন— উত্তরজীবনে তন্মধ্যে অনেকেই যশস্বী হইয়াছেন। গভীর পরিতাপের বিষয় যে আবার প্রায় সমসাময়িক সেইসব কৃতী যুবকদিগের অনেকেই অকাল কালগ্রাস পতিত হইয়াছেন। কয়েক জনের নাম প্রথমেই মনে পড়ে— জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor), জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (আচার্য রায় ইঁহাদিগকে বড় জ্ঞান ও ছোট জ্ঞান বলিয়া ডাকিতেন), নীলরতন ধর, হেমেন্দ্রকুমার সেন, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রভৃতি। ইঁহারা সব আচার্য রায়ের নিজের Favourite বিষয়, অর্থাৎ Chemistry রই ছাত্র। একেবারে উঁহার খাস তালুকের 'প্রজা' বলিলেই হয়। আর ছিলেন মেঘনাদ সাহা, নিখিলরঞ্জন সেন, জীবনরতন ধর (নীলরতন ধরের অগ্রজ) প্রভৃতি; সত্যেন্দ্রনাথ বসুও দুই-একদিন আসিতেন— কিন্তু কদাচিৎ; স্নেহময় দত্তও এইরূপ কদাচিৎ।

।। ক্লাবের স্থাবর: লর্ড রবার্টের মূর্ত্তি—পাদদেশে ।।

ক্রমে ক্রমে সভ্যসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ততদিন ক্লাবও যাযাবর অবস্থা অতিক্রম করিয়া স্থাবরে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কিছুদিন লর্ড লরেন্সের মূর্ত্তির গোড়ায় যে মস্ত বড় উচ্চ বাঁধান চাতাল ছিল— চারিপাশে হেলান দেওয়া আলিশা Government Place (রাজভবন Holy Carpet) এর ঠিক oppsite দক্ষিণ দিকে ময়দানে ঢুকিতেই— সেইখানে বসিতাম— বিশেষতঃ জলবৃষ্টি হইয়া ঘাস ভিজা থাকিলে সকলের স্থান কুলাইত না— Lawrence Statue র নিম্নেই বসা হইত। (সেই মূর্ত্তি ও তার চাতাল এখন আর নাই। সব সমতল হইয়া গিয়াছে)। কিন্তু ক্রমশঃ নানাস্থানে সন্ধান করিবার পর নির্ব্বাচিত হইল লর্ড রবার্টস- এর ষ্ট্যাচুর পাদদেশে নীচু চাতালটি। রবার্টস সাহেবের মূর্ত্তি যে স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান, সেই স্তম্ভের চারিপার্শ্বে গাত্রে আরও সেনানীর মূর্ত্তি আছে— লেখা বা inscriptionও আছে— আর একেবারে পাদদেশে চারিদিক ঘিরিয়া প্রায় হাত তিনেক চওড়া বাঁধান চাতাল, আর স্তম্ভের গায়ে ধাপের (ledge এর) মত কাটা। সে ধাপের উপর বসা যায়— চাতালে পা রাখিয়া; আর তা ছাড়া চাতালের উপর কিছু কিছু বসা যায়; উহা নীচে ঘাসের অপেক্ষা সামান্য উচ্চে। কবিরাজ মহাশয়ের গালিচাও সময় সময় এখানে পাতা হইত; কিন্তু সেটা অতিরিক্ত বড় ও চাতালের উপরে প্রায় অনাবশ্যক বিধায়— ওখানে বিশেষ পাতা হইত না।

।। আচার্য রায়ের উল্টান অয়েল ক্লথ ।।

পাতিবার জন্য আচার্য মশায় একখণ্ড অয়েল ক্লথ আনিতেন তাহা ঘাসের উপরও চলিত—

চাতালের উপরও চলিত। কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, অয়েল ক্লথখানা উল্টো করিয়া পাতা হইত— অর্থাৎ সাধারণতঃ খোলা দিকটাই নীচে থাকে, আর উপরে থাকে তৈলাক্ত দিক; কিন্তু আচার্য্য পাতিতে বলিতেন তেলা অংশটা নীচে এবং খোলা অংশটা উপরে, এবং তদুপরেই উপবেশন বা শয়ন করিয়া থাকিতেন। আম বিস্মিত হইয়া এরূপ উল্টা পাতিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "তোমাদের মোটে সায়েন্সের জ্ঞান নেই। বাড়ীতে যে দেখ অয়েল ক্লথ-এর তৈলাক্ত দিকটা উপর দিকে রাখিয়া বাচ্চাদিগকে তার উপর শোয়ান হয় তার কারণ বোঝ না? বাচ্চারা পেচ্ছাব করিলে অয়েল ক্লথ-এর তৈলাক্ত অংশ ভেদ করিয়া বিছানা ভিজিতে পারে না এবং অয়েল ক্লথ-এর উল্টা পিঠও শুকনাই থাকে। এই জন্য এরূপ করা হয়। আর এখানে দেখ, ভিজা ঘাসের উপর আমাদের বসিতে হয়— ড্যাম্পটা নীচ দিক হইতে আসে। তাই আমি তৈলাক্ত দিকটা মাটীর দিকে দিতে বলি, আর আমরা খোলা দিকটাতে বসি। কাজেই ঘাসের ভিজা দিকটা আমাদের স্পর্শ করিতে পারে না।" অয়েল ক্লথ-এর বিপর্য্যয়ের এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় চমৎকৃত হইলাম। বলা বাহুল্য আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে উল্টাভাবেই অয়েল ক্লথ পাতা হইতে লাগিল। এই অয়েল ক্লথখানা আচার্যদেব গাড়ীতে সঙ্গে করিয়াই আনিতেন। তাঁর সঙ্গী দুই-একটি ছেলে প্রায়ই থাকিত, তাহারাই বহন করিত।

।। নূতন সভ্যগণ ।।

যাঁহারা ক্রমশঃ ক্লাবের একরকম অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং প্রায় প্রত্যহই আসিতেন, তন্মধ্যে কবিরাজ মহাশয়, সত্যানন্দবাবু, গিরিশবাবু ও পূর্ব্বোল্লিখিত যুবকবৃন্দ ছাড়াও অনেকের নাম মনে পড়ে। যতদূর স্মরণ কিছু কিছু নাম করিতেছি। বিখ্যাত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ বসাক (ইনি একসময় লক্ষ্ণৌতে থাকিতেন এবং তথায় সাংবাদিক ছিলেন, চমৎকার বিশুদ্ধ হিন্দী বলিতে পারিতেন), নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রেসিডেন্সী কলেজের শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপক) ও তাঁহার দুইজন সহকর্ম্মী বন্ধু নরেন্দ্রনাথ বসু ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র সোম (সুভাষ বসুর মাতুল বলিয়া পরিচয় দিতেন), একজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক—হীরাজহরতের কারবারী—চুনীলাল আগরওয়ালা, ভূধর হালদার (যশোহরে) বাড়ী, হাইকোর্টের উকীল, (তিনি মাঝে মাঝে তাঁহার বন্ধু যশোহরের বিখ্যাত নেতা রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের জামাতা খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন), ইত্যাদি প্রায়ই আসিতেন। ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (জে, এন, রায়, বিখ্যাত Criminal Lawyer), মৌলবী এরফান আলি, ডাক্তার বনোয়ারীলাল চৌধুরী (Dr. B. L. Chaudhuri) প্রায়ই আসিতেন। ব্যারিষ্টার ইন্দুভূষণ সেনও মাঝে মাঝে হাইকোর্টের ফেরত বাড়ীর পথে ময়দান ক্লাবে আসিয়া বসিতেন। জ্ঞান ঘোষ, জীবনরতন ধর, প্রভৃতি বৌবাজারের নিকট ১১০ নং কলেজ স্ট্রীটের মেসে থাকিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে মেসের অন্যান্য ছেলেরাও সময়ে সময়ে আসিতেন। আমার সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে আমারও আত্মীয় ও বন্ধু কতিপয় যুবক ময়দান ক্লাবে আসিয়া ইহার

মধুতে আকৃষ্ট হইয়া রীতিমত মেম্বর হইয়া পড়িলেন। তন্মধ্যে দুইজনের কথা খুব মনে পড়ে— একজন ধীরেন্দ্রচন্দ্র বসু (তখন সেন্ট পল্‌স কলেজে বি-এ পড়েন; পরে আবগারী বিভাগে চাকুরি লয়েন এবং শেষ জীবনে আবগারী সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর পদে উন্নীত হন— ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে ইঁহার বাড়ী ছিল), আর একজন জ্ঞাতিসম্পর্কে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র— নাম হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—উত্তরজীবনে সাংবাদিক হিসাবে বেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং পাবলিসিটি বিভাগে উচ্চপদ লাভ করিয়া এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আবার মেসের ছেলেরাও কেহ কেহ মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে যাইত। এইসব নিয়মিত মেম্বর ছাড়া fluctuating সদস্য তো কতই ছিলেন। গিরিশবাবুর সোদরতুল্য বন্ধু ভূপালচন্দ্র বসু মহাশয় কলিকাতায় আসিলে গিরিশবাবুর সঙ্গে যোগ দিতেন। তখন হইতেই ভূপালবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়। এই পরিচয়সূত্রে তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

।। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ।।

১৯১২-১৩ সনের কথা বলিতেছিলাম। ক্লাব ততদিনে বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। লর্ড রবার্টস-এর স্ট্যাচুর পাদদেশে সান্ধ্য-মজলিশ বেশ জমিয়া উঠিয়া রীতিমত প্রসিদ্ধিই লাভ করিয়াছিল। নিন্দুক পরিহাসপ্রিয় অনেকে ইহাকে ডাঃ রায়ের Night Club বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়িলেন না। যাহা হউক সেও একরকম notoriety তো! কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল বিশ্বব্যাপী মহাসমর— ১৯১৪ সনের আগষ্ট মাসে— First World War - আমরা যাহাকে কাইজারের যুদ্ধ বলিতাম। (পঁচিশ বৎসর পরের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে বলিতাম হিটলারের যুদ্ধ।) সবাই সচকিত, সন্ত্রস্ত, কখন কি হয় বলা যায় না। বঙ্গোপসাগরে জার্মান, লাইট ক্রুজার Emden এর উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, খবরের কাগজে সকাল বেলাকার সংবাদে লোকের মন তৃপ্ত হয় না— আরও টাটকা খবর প্রত্যাশা করে। ফলে চৌরঙ্গীর মোড়ে হোয়াইটওয়ে লেডল এন্ড কোম্পানীর গায়ে স্টেট্‌স্‌ম্যান অফিসের সামনে দেয়ালের গায়ে বোর্ডে সন্ধ্যার সময়ে 'Stop Press' নাম দিয়া শেষ সংবাদ-স্লিপ আঁটিয়া দেওয়া হইত— পথচারী লোকেরা সেই সব সংবাদ উৎসুকভাবে পড়িত। স্টেট্‌সম্যান অফিস এখন আর সেখানে নাই— অদূরে ধর্ম্মতলা মস্‌জিদের উত্তর দিকে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

।। আমার নূতন ভূমিকা : জেনারেল মাকেনজেন ।।

এই যুদ্ধের হিড়িকে আমারও নূতন একপ্রকার খ্যাতি জন্মিল। ছেলেবেলা হইতেই সংবাদপত্রের খবর—বিশেষতঃ উত্তেজনামূলক খবর—পড়িবার দিকে আমার খুব ঝোঁক। তদুপরি যদি কোন যুদ্ধ-বিগ্রহাত্মক সংবাদ হয়, তবে তো ভালো করিয়া মানচিত্র মিলাইয়া ভৌগোলিকভাবে সেগুলি পড়ি। এখন এবার হইল কি—আমি ময়দানে হাঁটিয়া আসিবার পথে স্টেট্‌স্‌ম্যান অফিসের

সামনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া 'স্টপ প্রেস' খবরগুলি পড়িতাম। সকাল বেলাকার সংবাদপত্রের খবর তো পড়াই ছিল, এই সব সংবাদ আমার মাথার ভিতর কিলবিল করিতে থাকিত—আর আমি আচার্য রায় ও অন্যান্য সমবেত বন্ধুদের নিকট গিয়া সেইসব সংবাদ বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করিতাম। শ্রোতাদিগেরও শুনিবার খুব আগ্রহ তো ছিলই। ফল দাঁড়াইল এই যে, অনেকে নিজেরা সংবাদপত্রের উপর নির্ভর না করিয়া আমার মুখ-নিঃসৃত সংবাদ জানিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেন। আমাকে আসিতে দেখিলেই দূর হইতে রব উঠিত—এই তো আমাদের গেজেট আসিতেছেন। তদপেক্ষা অধিক খ্যাতি ও সম্মানও আমার ভাগ্যে ছিল। সেটাও বিবৃত করি। তখন জার্মান সেনাপতি হিন্ডেনবুর্গের খুব নাম—তিনি Eastern Front-এ রুশদিগের উপর প্রকাণ্ড জয়লাভ করিয়াছিলেন টানেনবর্গের যুদ্ধে; কিন্তু তৎপর বৎসর ১৯১৫ সনে আর এক জার্মাণ সেনাপতি মাকেনজেনের খুব নাম হইল। তিনিও Eastern Front-এর আর এক অংশে পোলাণ্ড অঞ্চলে রুশদিগকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন; তারপর বৎসর একবার ইটালীতে, একবার বাল্কান অঞ্চলে নানাদিকে মাকেনজেন অভূতপূর্ব্ব বিজয়লাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ এমনটা দাঁড়াইল যে মাকেনজেন-এর সামনে কেহ যেন তিষ্ঠিতেই পারে না। এদিকে ময়দান ক্লাবের যুদ্ধের সংবাদদাতা হিসাবে আমার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। আমি প্রায় The greatest armchair strategist East of Suez বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলাম। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং আমাকে General Mackensen নামে অভিনন্দন করিলেন। আমায় তখন আর পায় কে! সে সময়কার বন্ধুরা জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেন প্রভৃতি এখনও আমার সেই ভূমিকা স্মরণ করেন।

।। রঙ্গরস ও কৌতুক ।।

এইভাবে দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। ওইখানে বসিয়া কত বিষয়ের যে আলোচনা হইত তার ঠিক নাই। যদি কেহ যত্ন করিয়া বস্ওয়েলের ন্যায় বা শ্রীম'র (৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ন্যায় দিনের পর দিন কথবার্ত্তার নির্যাসটুকু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তবে নিঃসন্দেহে তাহা অতি উপভোগ্য সামগ্রী হইত। কত রাজা-উজীর যে আমরা মারিতাম তার ইয়ত্তা নাই—তবে সবই যেন good-humoured and light vain-এ হইত। সত্যানন্দবাবু ও গিরিশবাবু মাঝে মাঝে বেশ কৌতুক করিতেন। এক বার মনে আছে বৈজ্ঞানিক চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন (সি. ভি. রামন, যিনি পরে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন) বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যোগদান করিতেছেন না। গিরিশবাবু টিপ্পনী করিলেন, রামন আসিতেছে না কেন জান? প্রফুল্ল এখানে আছে বলিয়া। দেখ না, একটু মজা করা যাক। রামনকে লক্ষ্য করিয়া গিরিশবাবু বলিলেন, Well, Prof. Raman what brings you here? রামন উত্তর করিলে গিরিশবাবু বলিলেন, Well Just come along and sit down with us- your chief Sir P.C.Ray is here এই কথাতে রামনসাহেব কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, My Chief! who is my chief? গিরিশবাবু ক্ষেপাইবার জন্য আবার বলিলেন, — Well Sir

P.C. Ray isn't he your chief ? I Suppose he is your principal. এবার আর যায় কোথা! একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া রামন সাহেব হাত-পা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে শুরু করিলেন, In Science College there is no Principal We are equals! সে এক রীতিমতো scene —একেবারে কিস্কিন্ধ্যাকান্ড। আমরা তরুণের দল তো আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারি না।

।। ময়দান ক্লাবের যাযাবর অবস্থা ।।

এইরকম সময়ে—অর্থাৎ ক্লাবের প্রথম পর্য্যায়ে—ক্লাব ঠিক দানা বাঁধিয়া উঠে নাই—অর্থাৎ নামেরই প্রকৃত অধিকারী হয়না ;কারণ ইহার নির্দিষ্ট কোন বসিবার স্থান বা Local habitation ছিল না—নাম ত ছিলই না। তখনও ইহার যাযাবর বা nomadic অবস্থা। আমরা যাহারা ছেলেমানুষ বা যুবক, তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতাম কোথায় আচার্য রায় সদলবলে পাদচারণা করিতেছেন। দলভারী হইলে নানা স্থানে পাদচারণা করা হইত। কোন কোন দিন একবারে রেড রোড হইতে যাত্রা করিয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর সামনে গিয়া উত্তীর্ণ হইতাম। সেখানকার পুকুরের পাড়ে বসিয়া সলিলশীকরসিক্ত বায়ু সেবন করিতাম ; ঘন্টাখানেক সেখানে কাটাইয়া একটু রাত্রি হইলে ৮/৮/৩০টা আন্দাজ আবার পদব্রজে রেড রোড-এ যেখানে ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে সেইখানে আসিলে আচার্য রায় সত্যানন্দবাবুকে (ও কোন সহচর যুবককে) সঙ্গে লইয়া গাড়িতে চড়িতেন। আমি প্রায়ই হাঁটিয়া ঝামাপুকুরের মেসে ফিরিতাম—সেই সময় (১৯১২) আমাদের মেস ছিল ১০নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের প্রায় opposite ৬৮/১ নং বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীটের বাড়িতে। (এই উভয় বাড়ির মধ্যে যে গলিটি গিয়াছে এখন তাহার স্বতন্ত্র একটা নাম হইয়াছে—গোপাল বসু লেন।)

।। কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন ।।

গাড়িতে চড়িয়া আরো দুইজন আসিতেন। একজন হইলেন কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন—কলুটোলার বিখ্যাত চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের পুত্র, দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর। বিস্তৃত ছিল ইঁহাদের ব্যবসায় C.K. Sen & Co.— বিশেষতঃ জবাকুসুম তৈলের জন্য বিখ্যাত। তদ্ব্যতীত বিখ্যাত আরোও ব্যবসায়ে ইঁহারা লিপ্ত ছিলেন। "হিতবাদীরই" সাপ্তাহিক পত্র (অধুনালুপ্ত) বহু বৎসর ধরিয়া ইঁহারা চালাইয়াছিলেন। এই হিতবাদীরই সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যাঁহারা বিখ্যাত স্বদেশী গান—

যায় যেন জীবন চলে শুধু কাজে জগৎ মাঝে বন্দেমাতরম ব'লে—

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙ্গলার মাঠে-ঘাঠে-বাটে অহরহ শুনা যাইত। অন্যতম সহকারী সম্পাদকঃ ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত সখারাম দেউস্কর, যাঁহারা রচিত "দেশের কথা" পুস্তকখানি স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে পঠিত ও রক্ষিত হইত। সুরেন্দ্রনাথের Bengalee দৈনিকের সহিতও

ইঁহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সংবাদ পরিচালনায় ইঁহারা শ্রম ও যত্ন ব্যয় করিতেন। কবিরাজী ব্যবসায় ছাড়াও ইঁহারা বাঙ্গলা দেশের Public Life-এ খুব সম্মানিত ও সুপরিচিত ছিলেন। তাহাড়া আগ্রায় ইঁহাদের একটা লেদার ট্যানারী ফ্যাক্টরী ছিল। আমরা যখন প্রথম দেখিয়াছি (১৯১১-১২আন্দাজ) তখন উপেন্দ্র কবিরাজ মহাশয় বেশ বৃদ্ধ হইয়াছেন। মাঝে মাঝে সাবেকী বালাপোষ গায়ে দিয়া আসিতেন। আর সঙ্গে আনিতেন একখানা প্রকান্ড গালিচা---যখন পায়চারী করিতে করিতে একটু ক্লান্তি আসিত, তখন ময়দানের ঘাসের উপরই একটা ভাল শুকনা জায়গায় পাতিতেন। গালিচাটির নামকরণ করিলেন The Holy Carpet of Mecca! যখন কিছুদিন পরে যাযাবর অবস্থার পর ক্লাব একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিতে আরম্ভ করিল, তখন সেখানেই এই Holy Carpet আস্তৃত থাকিত। উপেন্দ্রবাবু ছিলেন রীতিমত ধনী লোক এবং একটু রাশভারী লোক---ধীরে ধীরে কথা কহিতেন, এবং সময়ে সময়ে মজার মজার টিপ্পনী ঝাড়িতেন।

।। সুভাষচন্দ্র বসু ।।

একবার মনে আছে সুভাষ বসু আসিয়াছিলেন। তখন ১৯১৭ সন ; পূর্ব্ব বৎসর (১৯১৬ সনে) অধ্যাপক ওটেন সাহেবের উপর হামলার ব্যাপারে সুভাষ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া রাষ্টিকেডেট অবস্থায় ছিলেন ; কি যে করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। আমরা ময়দানের মধ্যেই সেদিন ঘাসের উপর কবিরাজ মহাশয়ের কার্পেটের উপর সবাই বসিয়াছিলাম, সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে সুভাষ আসিয়া উপবেশন করিলেন।আমি তখন সুভাষকে চিনিতাম না। আচার্য রায় চিনিতেন। বিষণ্নবদনে সুভাষকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আচার্য্যদেব তাঁহাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন আছ ? কি করিবে ঠিক করিয়াছ ? সুভাষ ধীরে ধীরে বলিলেন, কিছুই তো বুঝিতেছি না, স্যার ? এক বৎসর তো আরও বসিয়াই থাকিতে হইবে---কলেজে পড়া হইবে না। তারপর দেখি বাবা কি বলেন ? সেই বিষাদমলিন তরুণ সুভাষের চিত্রটি এখনও মনে পড়ে।তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর। তখন কে কল্পনা করিতে পারিত যে সেই আশাহত মনঃক্লিষ্ট যুবক একদিন বিশ্ববিখ্যাত নেতাজী সুভাষচন্দ্রে পরিণত হইবেন---যাঁহার বীরত্ব, তেজস্বিতা ও দেশভক্তির তুলনা ইতিহাসে দুর্লভ।

।। আনুষঙ্গিক লাভ ।।

যাক, এরকম কত ছোটোখাট ঘটনা ময়দান ক্লাবের মজলিশে ঘটিয়াছে। আনুষঙ্গিক লাভও আমরা যাহারা বাল্যখিল্য ছিলাম তাহাদের হইয়াছে মন্দ নয়। কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমাদের খুবই স্নেহ করিতেন। যখন তাঁহার প্রাসাদোপম বাড়ি নির্ম্মিত হইল লোয়ার সার্কুলার রোডের উপর ক্যাম্পবেল হাসপাতালের প্রায় বিপরীতদিকে---সেই বাড়ির গৃহ-প্রবেশের দিন তিনি একটি নিমন্ত্রণের আয়োজন করিয়াছিলেন। বলাই বাহুল্য যে আমরা ময়দান ক্লাবের

দল একেবারে সবাই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, এবং তাঁহার ত্রিতল হর্ম্যে বসিয়া চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়াছিলাম। ১৯১৭ সনের কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সভানেত্রীরূপে শ্রীযুক্তা এনি বেসান্ট কলিকাতা আসিয়া এই বাড়িতেই উঠিয়াছিলেন।

।। ভাঙ্গাহাট ।।

বৎসরের পর বৎসর ময়দান ক্লাব চলিতে লাগিল। সদস্যদিগের পরিবর্তন হইতে লাগিল। কার্য্যব্যপদেশে কেহ অন্যত্র চলিয়া গেলেন কলিকাতা ছাড়িয়া—-যেমন নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, হেমেন্দ্রকুমার সেন প্রভৃতি। কত জন তো একেবারেই লোকান্তরিত হইলেন। দুই একজন নূতনও যে আমদানী না হইল তাহা নহে। তবে ভাঙ্গনের দিকই বেশী। আমি নিজে প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল নিয়মিতভাবেই একপ্রকার ক্লাবে যোগ দিয়াছি বলা যায়। পূজার ছুটিতে ও গ্রীষ্মাবকাশে কিংবা অন্য দুই এক সময়ে যখন কলিকাতা থাকিতাম না---তা ছাড়া প্রায় রোজই আমার ময়দান ভ্রমণ চলিত এবং ময়দানে যাওয়া মানেই আমার পক্ষে আমাদের ময়নান ক্লাবে যাওয়া।১৯১১ হইতে ১৯৪১ সন পর্যন্ত আচার্য রায় ও অনান্য পূজনীয় ব্যক্তিগণের সাহচর্য্য করিবার সৌভাগ্যলাভের পর ১৯৪১ সনে আমি কলিকাতা ছাড়িয়া রঙ্গপুর চলিয়া গেলাম তত্রত্য কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া। ছুটিতে মাঝে মাঝে কলিকাতা আসিতাম বটে, কিন্তু ততদিনে আর ময়দান ক্লাবের অস্তিত্ব ছিল না। আচার্য্য গিরিশচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন ---আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যিনি ছিলেন মধ্যমণি তিনি নিজ কক্ষে রোগশয্যায় শায়িত। সত্যানন্দবাবুও স্থবির হইয়া পড়িয়াছেন। আরও অনেকেই লোকান্তরিত, নয় দেশান্তরিত। আমাদের সেই অতি আনন্দের সান্ধ্যসমাবেশ ততদিনে স্মৃতি মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

।। তে হি নো দিবসা গতাঃ ।।

ইহার পরও ময়দানে একাকী অনেকবার গিয়াছি। লর্ড রবার্টস-এর স্ট্যাচুর শূন্য জনহীন চাতালের উপর সন্ধ্যার অন্ধকারে অনেকক্ষণ বসিয়া স্মৃতি রোমন্থন করিয়াছি। সেই সব দিনের স্মৃতিগুলি কত কৌতুক কথার টুকরা, কত কলহাসের রোল যেন সুদূর অতীতের যবনিকা ভেদ করিয়া কানে পৌঁছিয়াছে—আর কিরকম যেন একটা রোমাঞ্চের সঞ্চার করিয়াছে। আক্ষেপ করিয়া ফল নাই ; কালের গতি কেহ ঠেকাইতে পারে না। "তে হি নো দিবসা গতাঃ"—স্মৃতিটুকুই আমাদের অবলম্বন। আজ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর দিনে তাঁহার মহৎ জীবনের এই কৌতুককর অংশটুকুর স্মৃতি আহরণ করিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীমনোমোহন সেন

ছেলেবেলা থেকেই 'পি.সি.রায়' এই নাম উচ্চারণে যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনন্দ ও গৌরব মিশিয়ে আছে তা কি প্রকাশ করতে পারব? যদিও ওই নামের অন্তরালে যে 'দেবতুল্য চরিত্র, জীবনব্যাপী আত্মত্যাগ, পরদুঃখকাতরতা, পরদুঃখ দূরীকরণের চেষ্টা, সত্যের সন্ধান ও অপূর্ব্ব কর্ম্মতৎপরতার বিপুল প্রকাশ রয়েছে, তা আজ দেশবাসীর অবিদিত নেই। আমার যখন তাঁর অতি নিকটে আসবার সৌভাগ্য হল, তখন মন ভক্তিতে অবনত, চিত্ত সঙ্কোচে পূর্ণ। সকলেরই দেখেছি তাঁর নিকটে এলে তাঁর প্রতি ভক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়েছে। কারণ তাঁর জীবনে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, মুখোস ছিল না। সহজ সরল স্বচ্ছতা তাঁর প্রত্যেক ব্যবহারে প্রত্যেক কাজে এবং তা গম্ভীর আন্তরিকতায় পূর্ণ। তাই আত্মীয়তায় মন অধিকতর আকৃষ্ট হ'ত, মুগ্ধ হত Plain living and high thinking যা এযুগে সাধারণতঃ স্কুলপাঠ্য প্রবন্ধ-রচনার বিষয়মাত্র হয়ে আছে সেই উপদেশমূলক সত্য তাঁর জীবনে এমন পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছিল- যা না দেখলে ধারণা করা শক্ত! দীর্ঘ ৮৩ বৎসরে তিনি দেখিয়ে গেলেন Plain living ও high thinking এর যোগাযোগ জীবনে কত দূর সহজসাধ্য, এবং শুধু চিন্তা নয়, জ্ঞান নয়, এ দু'য়ের সঙ্গে তিনি যোগ করলেন অক্লান্ত কর্ম্ম। আমার যখন অভিজ্ঞতা সুরু হয় তখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নিয়ে পালিত প্রফেসর হয়ে ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিয়েছেন। বিজ্ঞান কলেজেই একটা ঘর নিয়ে ছিলেন। ঘরেই একটু আড়াল করে রান্নার ব্যবস্থা এবং সামনের বারান্দাটা ঘিরে তাঁর আশ্রিত ছাত্রদের আস্তানা। আসবাব-পত্রের মধ্যে থাকত একটা দড়ির খাটিয়া (যা দারোয়ানেরা ব্যবহার করে), একটি চেয়ার ও টেবিল আর কয়েকটি বইয়ের আলমারী। খাটিয়াটিই ছিল সবচেয়ে প্রিয়। গবেষণা ও নানাবিধ কার্যের অবসরে সেই খাটিয়াতেই অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় পড়াশুনা করতেন। আজকাল সামান্য অবস্থার লোকদেরও চাল বজায় রাখবার জন্য অর্দ্ধভুক্ত থেকে গৃহ ও দেহের সাজসজ্জা ও অনাবশ্যক আড়ম্বর পূর্ণ ব্যবস্থা দেখার পর এই রিক্ত ঘরটিকে একটি পবিত্র আরাধনার জায়গা বলে মনে হত। দেহের সজ্জা আবার ঘরের সজ্জার কাছেও লজ্জা পেত। খাদির মন্ত্র তিনি গ্রহণ করেছিলেন অন্তরের সঙ্গে এবং খাদি ছাড়া কিছু পরতেন না। যতদিন শক্তি ছিল নিজের কাপড় নিজেই কেচে নিজেই শুকোতে দিতেন। কখনো নিজেকে পরমুখাপেক্ষী হতে দেননি। বালতি হাতে স্নানাগারে যাওয়া ও আসা নিত্য নৈমিত্তিক দৃশ্য ছিল। লুঙ্গী পরে একটা উচ্চ টুলে বসে গবেষণাগারে নিজে কাজ করতেন এবং ছাত্রদের কাজ দেখাতেন। যাঁরা ওকে পূর্ব্বে দেখেননি এমন অনেকে এসে ওঁর নিতান্ত সাদাসিধা বেশভূষার জন্য চিনতে না পেরে খুঁজে পেতেন না। একবার একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক ঘুরে ঘুরে বিপন্ন হয়ে আমাদের শরণাপন্ন হলেন। ওঁর ঘরটা নির্দেশ করাতে বললেন, সেখানে ত কাউকে দেখলুম না। ''সেকি উনি একটা টুলে বসে কাজ করছেন যে!'' তিনি ত মহা অপ্রস্তুত! কারণ টুলে উপবিষ্ট ব্যক্তিটিকে তিনি গ্রাহ্যই করেননি। বাহিরের অনুষ্ঠানন ও আড়ম্বরের প্রতি এই অবহেলার মূল কারণ

ছিল তাঁর একাভিমুখী সাধনা। একাগ্র বিজ্ঞানচর্চ্চা, যার ফল য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ট পত্রিকাগুলিতে স্থান পেয়েছে এবং য়ুরোপের সুধীমণ্ডলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর প্রধান কীর্ত্তি বহু শতাব্দীর পর তিনি (ও স্যার জগদীশ) ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার পুনরায় সূত্রপাত করলেন। সে জন্য অনেক বাধা-বিঘ্ন, অনেক অসুবিধা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। তাঁর আরো বড় কৃতিত্ব, তিনি শুধু নিজেই গবেষণা করে ক্ষান্ত হননি। অন্যের ভিতরও এই সত্যান্বেষণের পিপাসা জাগিয়েছেন। স্বহস্তে কত গুলি বিশিষ্ট ছাত্র তৈরী করেছেন- যাঁরা আজ বিজ্ঞান জগতে উচ্চস্থান অধিকার করেছেন। কত ছাত্র যে ওঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছে, উৎসাহ পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আজ যে ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে গবেষণার সাড়া পড়ে গিয়েছে, আজ যে আমরা বিজ্ঞান জগতে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে ও চলতে পারছি তার মূলে তিনি ও তাঁর একাগ্র চেষ্টা। গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত হবার আগে তিনি তাঁর ছাত্রদের বেশ ভাল করে যাচাই করে নিতেন। চাইতেন একনিষ্ঠতা। বলতেন, "এ খোন্তা কোদালের কাজ নয়।" যে বিবাহ করেছে, বিশেষ ভাবে বাল্যকালে, তার একাগ্রতার প্রতি সন্দিহান হতেন। যে সব ছাত্র অনেক পরে এসেছিলেন তাঁদের আদর করে বলতেন এরা আমার রাসায়নিক নাতির দল। কত ছাত্র যে নিয়মিত সাহায্য পেত, প্রত্যহ কত ছাত্র যে ওঁর কাছে অন্ন গ্রহণ করত, তার শেষ নেই। নিজেকে বঞ্চিত করে সর্ব্বস্ব দান করতেন। মাঝে মাঝে ওঁর কাছে ভক্তদের কাছ থেকে মিষ্টি প্রভৃতি আসত (ওঁর উপযুক্ত পরিমাণে)। গুরুকে নিবেদন করে আহারের চিরন্তন প্রথার বিপরীত উনি ছাত্রদের বন্টন করে নিজের জন্য যৎসামান্য রাখতেন। আহার্য্য পরিমাণে অল্প, ছাত্রদের ক্ষুধা প্রচন্ড । বলতেন, "দাঁড়া আগে গর্ত্ত ভর্তি করি।" বেরুত প্রথমে মুড়ি,—যা ওঁর খুব প্রিয় ছিল। স্বদেশী বলে, গরীবের বলে—তাতে মিশত বেঙ্গল কেমিকেল থেকে আনানো সিরাপ। 'গর্ত্ত' কিছু ভরেছে ব্যাঘ্রেরা যখন কিঞ্চিৎ শান্ত , তখন বেরুত সন্দেশ। আর অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যগুলি অচিরে ছাত্রদের পেটে অন্তর্দ্ধান হ'ত। ভক্তরা নিশ্চয় এই পরিণাম জানতে পারলে দুঃখিত হতেন, কিন্তু যাঁকে নিবেদন তিনি ছাত্রদের তৃপ্তিতেই বেশী আনন্দ পেতেন।

তাঁর একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল ছাত্রদের কৃতিত্বে তিনি যে রকম আনন্দ ও গৌরব অনুভব করতেন নিজের কৃতকার্য্যতাতেও বোধ করি ততটা নয়। এতেই বোঝা যায় ছাত্রদের প্রতি স্নেহ তাঁর কত আন্তরিক এবং গবেষণা-কার্য্যের প্রতি তাঁর কত প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কাজকে বড় করে নিজেকে আড়ালে রাখতেন। যদিও জীবনব্যাপী রসায়ন শাস্ত্রের সেবা করে এসেছেন এবং এই তাঁর অতিপ্রিয় শাস্ত্র তবু অন্যান্য বিষয়ে বিশেষতঃ ইতিহাস রাজনীতি ও অর্থনীতি তাঁর অবসরের সঙ্গী ছিল। তাঁর পুস্তকাগারে দেখলেই বোঝা যেত তাঁর অনুসন্ধিৎসা কত সর্ব্বতোমুখী ছিল। নিজেকে কেবল গবেষণাগারে আবদ্ধ রাখেননি দেশের সকল অবস্থার সঙ্গেই তাঁর গভীর সংযোগ ছিল। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙ্গালীকে বাঁচতে হলে চাকরীর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে ব্যবসা অবলম্বন করতে হবে। আজ যে ব্যবসার প্রতি বাঙ্গালীর ঘৃণা অনেক পরিমাণে দূর হয়েছে তার পিছনে রয়েছে তাঁর পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী চেষ্টা। চাকরীর উমেদারদের উনি সর্ব্বদাই ব্যবসায়ে উৎসাহিত করতেন। শুধু ব্যবসা করার পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। নিজে পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন। বাঙ্গালীর প্রথম বড় ব্যবসা বাঙ্গালীর গৌরব Bengal

Chemical তাঁরই স্বহস্তে সযত্নে তিলে তিলে গঠিত। আজ Bengal Chemical - এর অনুকরণে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু তখন এর সম্ভাবনা কল্পনাতীত ছিল। কোথাও কোনো বাঙ্গালীকে নিজের চেষ্টায় ব্যবসায় উন্নতি করতে দেখলে, তিনি বিশেষ আনন্দিত হতেন। শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের কৃতিত্বে বিশেষ গৌরব বোধ করতেন। তিনি যে কেবলমাত্র বড় বড় প্রতিষ্ঠানেরই অনুকূল ছিলেন তা নয়, কুটীরশিল্পও তাঁর সহায়তায় বঞ্চিত হয়নি। গান্ধীজীর সঙ্গে উনিও পরম উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন ঘরে ঘরে সূতো কাটার সম্বন্ধে। তারই ফলে খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। তিনি নিজে প্রত্যহ সকালে নিয়মিত চরকায় সূতো কাটতেন। কোনো বিষয়ে উপদেশ মাত্র দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না, নিজে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতেন। ওঁর বহির্জগতের কর্মতৎপরতা শুধু ব্যবসার উন্নতিসাধনেই আবদ্ধ ছিল না। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল লোকের দুঃখ দূর করা। এই পরদুঃখকাতরতাই তাঁর জীবনকে ব্যাপ্ত করেছিল। এর জন্য তিনি সন্ন্যাসীর জীবন অবলম্বন করেছিলেন। এর জন্য তিনি সারাজীবন ধরে সর্ব্বস্ব দান করতেন। যখনই দেশে দুর্ভিক্ষ, প্লাবন বা অন্যকোনো দৈব দুর্ব্বিপাক ঘটেছে উনি এগিয়ে এসেছেন দেশকে রক্ষা করতে। কেবলমাত্র ওঁর নামের মহিমায় অর্থ অযাচিত ভাবে স্রোতের মত এসে পড়েছে। আজ সেই বিশাল হৃদয় নিস্পন্দ। পরের দুঃখে কাঁদবেন না, পরের দুঃখ দূর করার জন্য প্রাণপাত করতে আর তিনি ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে আসবেন না! আজ সেই ঋষিতুল্য মানব সাধনোচিত ধামে চলে গিয়েছেন, রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্য এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত আর আনন্দপূর্ণ সান্ত্বনা যে, তাঁর মত দেবতুল্য চরিত্র ও কর্মনিষ্ঠ জীবন দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল! ভারতে সন্ন্যাসীর অভাব কোনো কালে ছিল না। মানুষ জগৎ থেকে দূরে সন্ন্যাস জীবনে সিদ্ধি থাকতে পারে; কিন্তু তাতে জগতের বাস্তব কল্যাণ নেই। তাঁর আদর্শ জীবনের কাছে সকলেই নত মস্তক। এই আদর্শই যেন হয় আমাদের লক্ষ্য- সেই হবে পরম তৃপ্তি। সেই হবে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য-অঞ্জলি।

'মাসিক বসুমতী'-শ্রাবণ ১৩৫১।

আচার্য—বাণী

'আমরা যে বিদেশী ডিগ্রীর জন্য ব্যস্ত হই, সেটাও আমাদের দাস মনোভাবের ফল। আসল জিনিস হচ্ছে জ্ঞান—স্পৃহা।

পড়াশুনা করতে চাইলে আমাদের যে সব লাইব্রেরী আছে তাতেও যথেষ্ট বই পাওয়া যায়। কলিকাতার Imperial Library ও University Library থেকে আমি বছরে অন্ততঃ এক হাজার বই নিয়ে পড়ি। পড়ি, নোট করি—যেন
রাত পোহালে আমার এম.এ.এগ্‌জামিন। দেশে যে সব লাইব্রেরী আছে তারও সদ্ব্যবহার দেশের লোক করে না। সারবান বই খুব কম লোকেই পড়ে।

আচার্য-স্মরণে

শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত

উনিশ বছর আগে যে দিনটিতে দেশবন্ধুকে আমরা হারিয়েছি, সেই শোকতপ্ত দিনে আচার্য রায়েরও কর্ম্মমুখর জীবনের অবসান হ'য়ে গেল। বাংলার এই দুই মহাপ্রাণ কর্মীর অন্তরে যে আদর্শগত মিল ছিল তাই যেন আজ সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,-

"...হয়তো আমার প্রিয় বিদ্যা (রসায়ন) চর্চ্চায় আজীবন লিপ্ত থাকার ফলে আমার দৃষ্টি অস্বচ্ছ ও চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ সাধনার মূলে আমার একটি মাত্র অভিলাষ ছিল, ইহা দ্বারা আমি দেশের সেবা করিব। তাঁহার (দেশবন্ধুর) ও আমার একই আকাঙ্ক্ষা। ভগবান জানেন,ইহা ব্যতীত আমার জীবনে দ্বিতীয় কার্য নাই।" [দেশবন্ধুর কারাবরণে শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লিখিত পত্র, ডিসেম্বর ১৯২১।]

আচার্য্যের জীবন-সায়াহ্নে (১৯৩২) অল্পদিন হলেও ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁর সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে কখনও এখানে-সেখানে গেছি, থেকেছি। তাঁর সরল, অনাড়ম্বর জীবনের কথা কে না জানে? সেই পুণ্য জীবন-চরিত রসায়নের মত সকলেই খুলে দেখার অধিকারী ছিল। কত অল্পে তাঁর প্রয়োজন মিটে যেত দেখেছি। মনে হয়েছে তাঁর সামান্য প্রয়োজনটাই আসলে তাঁর অসামান্য ঐশ্বর্য। যতদিন অশক্ত হয়ে পড়েননি, কিছুতে পরের সাহায্য নিতে চাইতেন না। জুতোটি পর্য্যন্ত নিজে ঝেড়ে নিতে দেখেছি। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-সভায় একবার বলেছিলেন, "আমি আরও অগ্রগামী। আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি এদেশে সেই প্রাচীন শিক্ষাধারায় ব্রহ্মচর্য সংস্কারের পুনরুজ্জীবন করিতাম, যাহা শিক্ষার মূলে থাকিয়া বীর্য্যবান ও আত্মপ্রতিষ্ঠ শিক্ষিত মানবকে উত্তর জীবনের সকল প্রতিকূল বায়ুর মধ্যে স্থির থাকিতে সক্ষম করিত। আমি চাহিয়াছি যে শিক্ষার্থী, সে সকল প্রকার বিলাস বর্জন করিবে, দৃঢ়কক্ষ খদ্দর পরিয়া থাকিবে, আপনার ঘর ঝাড়িবে। কাপড় কাচিবে, বাসন মাজিবে এবং সর্ব্বতোভাবে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিবে।" আপনার জীবনে এই বাণী তিনি কত দূর সার্থক করেছিলেন, অনেকেই তা নিজের চোখে দেখেছেন।

চিন্তায়, কথায় ও কাজে ঐক্য রেখে তিনি যে স্বাধীন বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন, বর্ত্তমান যুগের অগণিত দেশবাসী তাঁর দ্বারা নানা ভাবে প্রভাবান্বিত। তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য সম্পর্কে অপ্রভাবিত প্রত্যক্ষদর্শীর মত এদেশে পাওয়া কঠিন। দু'এক জন বিদেশীর উক্তি পাওয়া যায়।

উত্তর-বঙ্গের বন্যার সময় (১৯২২) 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ দাতা বিধ্বস্ত অঞ্চলে আর্ত্তত্রাণকার্য্য দেখতে এসেছিলেন। তখন সরকারী চেষ্টা অনুপযুক্ত দেখে বেসরকারী সমিতি খুলে আচার্য রায় সেবাকার্য্য পরিচালনার ভার নিয়েছেন। সায়ান্স কলেজে সমিতির আপিস খোলা হয়েছে। সংবাদদাতা লিখছেন,—

"... সায়ান্স কলেজে স্যার পি.সি. রায়কে দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমার মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি, কেন তাঁর দেশবাসী তাঁর উপর এতটা বিশ্বাস রাখে। একদিন দেখলাম আর্ত্তের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের সংগ্রহ করা পর্ব্বতপ্রমাণ নতুন ও পুরানো কাপড়ের স্তূপ তিনি পরম আগ্রহে দেখে ফিরছেন। পরের দিন দেখি তাঁর গবেষণাগারে দুটি তরুণ ছাত্রকে কোনও রাসায়নিক পরীক্ষায় সাহায্য করছেন। দেখে বোধ হ'ল সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে স্নেহের সম্পর্ক আছে। তাঁর কাছ থেকে নিন্দে শোনার আগে আমি এঁর আজ্ঞা পালন করতাম। তাঁর মত দৃপ্ততেজা উদ্যোগী পুরুষে কখনও নিখুঁত সমালোচক হন না। কিন্তু তাঁর নিন্দার কশাঘাতের মধ্যেও তৃপ্তি আছে, যে, এই ব্যক্তি কাজ এগিয়ে দিলে কাজ ঘাড়ে নিতে ভয় পান না, এবং কাজ নিলে যে কোনও সমর্থ ব্যক্তিরই মত, হয়ত তার চেয়ে আরও একটু ভাল ভাবেই সে কাজ সুসম্পন্ন করতে পারেন।"

সেই দীর্ঘ উজ্জ্বল কর্মজীবনের পরিচয় এখানে দেওয়া অনাবশ্যক, রসায়নে তাঁর ব্যাপক গবেষণা দেশে অগ্রগণ্য রসায়নীর দল সৃষ্টি করা, তাঁর হিন্দু রসায়নী বিদ্যার ইতিহাস, তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল দেশীয় শিল্পের উদ্বোধন, দেশের বড় বড় বিপদে সেবাকার্য। তাঁর সর্ব্বতোমুখী কর্মধারার পরিচয় দিয়ে খ্যাতনামা রাসায়নিক সার এডোয়ার্ড থর্প মন্তব্য করেছিলেন " সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে প্রফুল্লচন্দ্র ক্রমশ দেখিবেন তিনি সর্ব্ব সাধারণেই সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতেছেন।... এই ক্ষুদ্র শীর্ণ মানুষটি তাঁহার দুর্ব্বল স্বাস্থ্য ও জীবন-ব্যাপী অজীর্ণ রোগ লইয়া দেশের সেবায় নিঃশেষিত হইয়া যাইবেন। তাঁহার জীবদ্দশায় দেশে উন্নতির দিন আসিবে না। কিন্তু সেই সেবার স্মৃতি অক্ষয় হইয়া রহিবে।"

হাসিমুখ কর্মঠ যুবক চিরকাল তাঁর নয়নের আনন্দ ছিল। সে আনন্দ তিনি ভাষায় ব্যক্ত করতেন না। কিল-চাপড়ে অনেকেই তা অনুভব করে ধন্য হয়েছেন। অগ্রগামী বলিষ্ঠ চিন্তাধারায়, সংস্কারমুক্ত বিচারে, সাহসে ও উৎসাহে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে দেশের শক্তির অগ্রদূত বলা হ'ত। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের কথা বলছি। তখন ছিয়াত্তর বৎসর তাঁর বয়স বৈকালিক পাঠ সেরে নিয়ে বেরোবার আগে আমার সঙ্গে গল্প হচ্ছিল, "এখনও তোদের মত হয়েই বাঁচতে চাই। পাছে বুড়ো হয়েছি মনে হয়, আরসিতে মুখ দেখিনে। কখনো পার্কে যাইনে সেখানে বুড়োদের সভা; সেখানে সেই 'ছিল বটে আমাদের কালে, অমুক সাহেব। বাবু বলতে প্রাণ যেত... সি. আর. দাশ.ই ত দেশটার সর্ব্বনাশ করলে' শুনিসনি?" বলে হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন।

জীবনের শেষ পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যা তাঁর জাগরণের চিন্তা, নিদ্রার স্বপ্ন হয়েছিল। এক এক সময় অধীর হয়ে বলতে শুনেছি এ জাতি লুপ্ত হয়ে যাবে। তার প্রতিবাদ করেছি, বলেছি এতদিন বীরের সংগ্রাম করে শেষে পরাজিতের বাণী যদি আমাদের জন্যে রেখে যান, তবে তেমন অভিজ্ঞতার কথা আমাদের না-ই জানিয়ে গেলেন। তিনি বলেছেন, "ষাট বছর হয়ে গেল সমস্ত চোখ দিয়ে মন দিয়ে দেশকে দেখছি। কী সম্পদ ছিল তোরা তা দেখিসনি, কী আছে আমি তা দেখতে পাচ্ছি...

"বাঙালী হয়ে জন্মেছি বলে আমি গর্ব করি। বাঙালীর চরিত্রে অনেক উন্নত গুণের সমাবেশ দেখেছি। কিন্তু এক অত্যন্ত দরকারী কাজে সে সাংঘাতিক অপারগ, তার নিজের অন্নের সংস্থানে দেখেছি তার আপন জন্মভূমিতেই সে প্রতিযোগিতা রোধ করে দাঁড়াতে সবচেয়ে অসমর্থ। দেশের গ্রামে ঘুরে ঘুরে আমাদের ছেলেদের যুবকদের লক্ষ্য করি। তাদের শরীরে বাড় নেই। দেহে রক্ত নেই, চোখে দীপ্তি নেই। কতদিন ভালো খেতে পায়নি। তাদের অসহায় মুখে নিরাশা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দিন দিন তারা ডুবে গেল। যে জাতির যৌবন অবশ অবসন্ন তার ভবিষ্যতের আশা নেই। তবু জীবনের এই সন্ধ্যাবেলায় আমি আশা ছেড়ে দিতে পারব না...।"

"বাঙালী রসায়নীর জীবন ও অভিজ্ঞতা" বইয়ে তিনি আপনার জীবনের অনেক ঘটনা চেষ্টা ও আকাঙ্খার কথা প্রকাশ করে গেছেন। শেষ জীবনেও যে আশা তিনি ছাড়তে পারেননি, আমরা যেন তাকে জলাঞ্জলি না দিই। আমাদের যোগ্যতা যে কত তুচ্ছ, গত দুর্ভিক্ষে তা দেখা হয়ে গেছে। তবু ভাবি, তাঁর মত যোগ্যতার রাজমুকুট নিয়ে যে কোনো দেশে কম মানুষই জন্মগ্রহণ করেন। বেশীর ভাগ মানুষকেই আপন দুঃখবিপদের জ্বালা সহ্য করে করে অল্পে অল্পে যোগ্য হয়ে উঠতে হয়। বর্ত্তমান যুগে আমরা সেই ভাগ্যহীনদের জাতি।

'মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৫১।

আচার্য—বাণী

'অপাঙ্‌ক্তেয়' শব্দ আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সমাজের নিয়ম যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ দেবপূজা করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি কোন ব্রাহ্মণ সুবর্ণবণিক অথবা অন্য কোন জল-অনাচরণীয় জাতির দেবপূজা করে, তবে তাহারা বর্ণের ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। 'বর্ণের ব্রাহ্মণ' হেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয়। এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে? ইহার অর্থ কি ইহাই নয় যে, নিম্নজাতিকে আমরা দেবপূজার অধিকার হইতে প্রকারান্তরে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি?"

আধুনিক রাসায়নিক মৌলিক গবেষণায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্থান

শ্রীগণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতে আধুনিক রাসায়নিক মৌলিক গবেষণার প্রধান হোতা ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যাগত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে মৌলিক রাসায়নিক গবেষণার দীপে যে প্রাণ-শিখার সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা সহস্রধারায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ দীপের সমুজ্জ্বল শিখা বিশ্ববিজ্ঞান-জগতে ভারতের নাম গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতবর্ষ বিজ্ঞান জগতে শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল। তাহার পর পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান-চর্চার দ্রুত উন্নতির সহিত ভারত ধাপে ধাপে নামিয়া আসিয়াছে। Swedish রাসায়নিক Savantc Arrheneus -এর মতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্রম-অবনতি আরম্ভ হয় এবং কয়েক শত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান-আলোচনা ভারতে লোপ পায়।

মহামতি Jones- এর কলিকাতা সমাগমনের সহিত ও তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৭৭৪ খৃঃ Asiatic Society- র জন্ম ও ভারতে পুনরায় বিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত হয় ১৮৮০ খৃঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক Sir Alexander Pedler- এর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে। পেডলারের পূর্বে ভারতের বিভিন্ন শিক্ষায়তনে বিজ্ঞান-আলোচনার তেমন ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই হয়। প্রথমে পেডলার ও পরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঐকান্তিক উদ্যমে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রাসায়নিক মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা অল্প-স্বল্প হয়। কথিত আছে যে, তদানীন্তন সরকার বাহাদুর বিজ্ঞান-চর্চার সুযোগ ও সুবিধাদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত দায়িত্ববোধ সম্পন্ন উদ্যোক্তার অভাবে ইহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সরকার বাহাদুরের এইরূপ যুক্তির প্রথম সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন পেডলার ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর এক বৎসর যাবৎ— তদ্বিরের ফলে মাত্র আড়াইশো টাকা মাহিনায় প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পেডলারের অস্থায়ী সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন।

১৮৭৩ খৃঃ পেডলার প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও তিনি মৌলিক গবেষণার প্রবৃত্ত হন। কেউটে সাপের বিষের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণায় ফল পেডলার ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে Royal Society-র পত্রিকায় প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করেন।

পরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে Chemical Society র পত্রিকায় পেডলারের রাসায়নিক গবেষণা মূলক তিনটি প্রবন্ধ বাহির হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্রকে সহকারিরূপে পাইয়া পেডলার দ্বিগুণ উৎসাহে প্রেসিডেন্সি কলেজে রাসায়নিক গবেষণার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য গভর্ণমেন্টকে তাগিদ দিতে থাকেন এবং উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফলে গভর্ণমেন্ট মেধাবী ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক মৌলিক গবেষণার জন্য কয়েকটি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। এই ব্যবস্থার ফলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যোগ্য ছাত্রদের রাসায়নিক মৌলিক গবেষণায় প্রবৃদ্ধ করিবার সুযোগ পান। ইহার পূর্ব্বে পেডলার এবং প্রফুল্লচন্দ্রকে রাসায়নিক পরীক্ষামূলক সকল প্রকার কার্য্যই নিজহস্তে অপরের সাহায্য-ব্যতিরেকে করিতে হইত।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রসায়নশাস্ত্র-সঙ্গত যে সকল মৌলিক গবেষণা হইত তাহা অত্যন্ত প্রাথমিক ধরণের, স্বল্প পরিসর এবং তাহাদের ব্যাপকতা ও ধারাবাহিকতার সমধিক অভাব ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-দশকে মৌলিক রাসায়নিক গবেষণার সুযোগ ও সুবিধা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র Science Convention of the Indian Association for the Cultivation of Science- এর রসায়ন-শাখার সভাপতিরূপে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যে উক্তি করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।— "When I first joined the Presidency College in 1889, Mr. Peddler, now Sir Alexander Peddler was the solitary worker on the subject. It was he who prepared the way. He had to clear the jungles and prepare the soils for the abad (আবাদ). The pursuit of Chemistry has since been very active and highly encouraging. It was about the year 1901 that the Govt. of Bengal for the first time instituted a few research scholarship tenable at the various colleges, open to graduates who want to continue their studies and to research"

এই সূত্রে স্যার উইলিয়ম র‍্যাম্‌শে ১৭৭৪ হইতে ১৮৭৪ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণার পরিসর ও পরিস্থিতির সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। "That (Chemistry) is a subject which can be prosecuted only in the laboratories. In India until recently, there have been but a few laboratories worth the names, and we have had but few competent men with leisure to devote to lenghthened chemical Research"— [Centenery review of Reseearches of the Asiatic Society of Bengal, Part iii, P 101]

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করিবার পর কয়েক বৎসর প্রফুল্লচন্দ্র খাদ্য-বস্তুর ভেজাল নিবারণ-মানসে ঘী, সরিষার তৈল প্রভৃতি খাদ্য-বস্তুর রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহার তিন বৎসরের গবেষণার ফল Asiatic Society পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধের আকারে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ পায়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে mercurous nitrite আবিষ্কার করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। Ruescce, Berthelot, Victor Meyer, Vollard প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত পাশ্চাত্য রাসায়নিকেরা আচার্য রায়ের তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি কলেজের পরিমিত যৎসামান্য সাজসরঞ্জামের সাহায্যে এই অদ্ভুত আবিষ্কারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৮৯৭ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধাতব nitrite ও hyponitrite সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা করেন; এই গবেষণার ফল ১৩টি প্রবন্ধে Chemical Society র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে গভর্নমেন্ট-বৃত্তিভোগী একটি ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে গবেষণার জন্য নিযুক্ত হয়। প্রত্যেক ছাত্রটির বৃত্তিভোগ তিন বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ সেন সর্ব্বপ্রথম বৃত্তিভোগী ছাত্র হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসেন। এযাবৎ কাল প্রফুল্লচন্দ্রকে গবেষণার জন্য সকল পরীক্ষা একাকী করিতে হইত।

বৃত্তিভোগী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আচার্য রায় তাঁহার জীবনীতে যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য।

"...From 1900 on, one scholar was always attached to my department, who in the early probationary stage, co-operated with me in my line of research but later on was allowed to develop in his own ways and strike out a line of his own. In this manner some of these scholars were not only to secure Doctorate on presentation of a thesis but also won the blue ribbon of the Calcutta University—the Premchand Roychand scholarship."

সুতরাং বৃত্তিভোগী ছাত্ররা যে কেবল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁহার গবেষণায় সাহায্য করিত তাহা নহে, পরন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশে ও নির্দ্দেশে স্বাধীন ভাবে নিজেদের স্থিরীকৃত বিষয়ে গবেষণা করিবার সুযোগ পাইত। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর বহু ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভার সন্নিকটে থাকিয়া ও তাঁহার সহযোগিতায় রাসায়নিক গবেষণায় প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং পরে অন্য শিক্ষায়তনে নিযুক্ত থাকিয়া রাসায়নিক গবেষণার প্রসার বৃদ্ধি করেন।

আজ যে ভারতে সর্ব্বপ্রদেশে রাসায়নিক মৌলিক গবেষণার বহুল প্রসার দেখা যায়, তাহার মূল উৎস ছিলেন আচার্য রায়। যে সকল ভারতীয় ছাত্র আজ বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বরেণ্য হইয়াছেন, ছাত্রজীবনে আচার্য্য রায়ের প্রগাঢ় উৎসাহ ও প্রবল উদ্দীপনা না থাকিলে হয়ত তাঁহাদের জীবনের ধারা ও কর্মক্ষেত্র ভিন্ন দিকে চালিত হইত।

১৯০৩ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার ছাত্রদের সহযোগিতায় বিভিন্ন ধাতুর সহিত নাইট্রিক এ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। ১৪টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ London Chemical Society ও American Chemical Societyর পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

আচার্য রায়ের সহিত রাসায়নিক গবেষণায় সহযোগিতা করেন প্রথম ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন। পরে যতীন্দ্রনাথ সেন স্বাধীনভাবে রাসায়নিক গবেষণার জন্যে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং প্রথমে Pusa Agricultural Institute-এ নিযুক্ত হন, তৎপরে Imperial Forest Research Institute-এ Bio-Chemist-এর পদ অলঙ্কৃত করেন।

যতীন্দ্রনাথের পরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী বৃত্তিভোগী ছাত্র হিসাবে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্রের সহযোগিতা করেন। পরে স্বাধীনভাবে রাসায়নিক গবেষণা করিয়া Ph.D. উপাধিতে ভূষিত হন। ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী বিভিন্ন সরকারী কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন; শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়া তিন বৎসর পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করেন। ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী আচার্য রায়ের নিকট রাসায়নিক গবেষণার যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কর্মজীবনের অবকাশে রাসায়নিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার গবেষণার ফল বহু বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯০০ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে কয়েক জন ছাত্র আচার্য রায়ের গবেষণায় সহযোগিতা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনের নাম উল্লেখযোগ্য।

১। ডাঃ যতীন্দ্রনাথ সেন। ২। ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী। ৩। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী। ৪। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ। ৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৬। ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন। ৭। ডাঃ রসিকলাল দত্ত। ৮। ডাঃ নীলরতন ধর। ৯। রায় সাহেব জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত। উপরি-উক্ত নয়জনের মধ্যে সকলেই প্রায় স্বাধীন ভাবে রাসায়নিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হন ও নিজ নিজ ছাত্রদের রাসায়নিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেন। আচার্য্য রায়ের উপরি-উক্ত নবরত্নের মধ্যে ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, ডাঃ রসিকলাল দত্ত ও নীলরতন ধরের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রসিকলাল রাসায়নিক গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন এবং কয়েক বৎসর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করিয়া Bengal Govt.- এর Industrial Chemist- এর পদে নিযুক্ত হন।

হেমেন্দ্রকুমার রসায়নশাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করিয়া কিছু দিন সিটি কলেজে অধ্যাপনা করার পর বিলাত যাত্রা করেন। তথায় রাসায়নিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস.সি. উপাধি লাভ করিবার পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান কলেজে ফলিত রসায়ন বিভাগে স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার অধীনে বহু ছাত্র রাসায়নিক গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি.এস-সি উপাধি লাভ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক রাঁচি India Lac Research Institute-এর Director- এর পদে নিযুক্ত হন, ও ঐ স্থানে লাক্ষা, প্লাষ্টিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেন। অধুনা ডাঃ সেন বিহার গভর্ণমেন্টের Director of Industries- এর পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন।

১৯০৩ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্রকে আচার্য রায় সহকর্ম্মিরূপে পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ নীলরতন ধরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে আচার্য রায়ের গবেষণা অজৈব রসায়ন বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নীলরতন ধর ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রথম Physical Chemistry (প্রাকৃতিক রসায়ন) বিভাগে সর্ব্বপ্রথম গবেষণা শুরু করেন এবং আচার্য্য রায়ের সহযোগিতায় ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের গবেষণার ফল ৫টি প্রবন্ধে Chemical Society-র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নীলরতন স্বাধীন ভাবে গবেষণা শুরু করেন ও এক বৎসর তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ বিলাত, আমেরিকা ও জার্মানীর রাসায়নিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদিতে স্থান লাভ করে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ডাঃ নীলরতন ধর তিন শতাধিক গবেষণশ মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার অধীনে বহু ছাত্র গবেষণা করিয়া ডি.এস.সি ডিগ্রী লাভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৯১২-১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গবেষণায় প্রবৃত্ত থাকিবার পর নীলরতন State Scholarship লাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন এবং London ও Paris বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি.এস.সি. উপাধি লাভ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে Muir Central College- এ রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও পরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। ডাঃ নীলরতন ধরের প্রাকৃতিক রসায়ন বিভাগের মৌলিক গবেষণার উৎসাহ ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দ শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (অধুনা স্যার) ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ে সংক্রামিত হয়। ইঁহারা প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজে গবেষণায় আবিষ্ট হন। ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রথম বৈদ্যুতিক রসায়ন-বিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গবেষণার ফল American Chemical Society-র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলাদলীয় (Colloidal) রসায়ন বিভাগে গবেষণা আরম্ভ করেন ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে American Chemical Society-র পত্রিকায় তিনটি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। জ্ঞানদ্বয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করেন ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাগমন করিলে ডাঃ মুখার্জ্জি কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কিন্তু সেই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অধুনা স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ Bangalore Indian Institute of Science- এর ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই জ্ঞানদ্বয়ের রাসায়নিক গবেষণার বাঙালী ও ভারতের মুখ বিজ্ঞানজগতে উজ্জ্বল হইয়াছে।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আচার্য রায় University College of Science- এ Palit Professor পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে যত দিন পালিত অধ্যাপকের পদে স্থায়ী ছিলেন, তিনি বেতন হিসাবে একটি কপর্দক গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সঞ্চিত সমুদয় বিত্ত বিজ্ঞান-চর্চ্চায় দান করিয়া গিয়াছেন। যে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই স্বার্থত্যাগী ঋষিকল্প বৈজ্ঞানিক সারা জীবন রসায়ন-বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহার আর কোন অনুরূপ দৃষ্টান্ত ভূ-ভারতে পাওয়া যায় কি না তাহা গবেষণাসাপেক্ষ।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে আচার্য রায়ের নেতৃত্বে যে সকল ছাত্র গবেষণায় লিপ্ত নে, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, প্রফুল্লচন্দ্র গুহ, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্লচন্দ্র বসু ও সুশীলকুমার মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই জৈব রসায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ্ সায়েন্স উপাধিতে বিভূষিত হন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রসায়ন শাস্ত্রের মৌলিক গবেষণার কেন্দ্র মাত্র চারি স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। কলিকাতায় আচার্য রায়ের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সি কলেজে, বাঙ্গালোরে ডাঃ ট্রার্ভাসের অধ্যক্ষতায় Indian Institute of Scienceএ,Dr.E.R.Watson-এর পরিচালনায় ঢাকা কলেজ এবং:Prof.Mouat Jones-এর পরিচালনায় লাহোরে।

আচার্য রায় ও তাঁহার কৃতী ছাত্রদের সাধনায় ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে রাসায়নিক গবেষণার চর্চ্চা সম্প্রসারণের সহিত আচার্য রায় বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁহাদের গবেষণার বহুল প্রচারের নানা বাধা অনুভব করেন। প্রথম হইতেই আচার্য রায় ও তাঁহার সহকর্ম্মিবৃন্দকে তাঁহাদের গবেষণার ফল বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচারের জন্য বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় দ্বারস্থ হইতে হয়। সময় সময় তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ এ গবেষণামূলক প্রবন্ধ স্থানাভাবের অজুহাতে ফেরত আসিত। অধিকন্তু ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে অযথা বিলম্ব হইত। যে ক্ষেত্রে একই ধরণের গবেষণার কাজ ভারতে ও বিলাতে অনুসৃত হইত, সে ক্ষেত্রে বিলাতী বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফল বিলাতী পত্রিকায় শীঘ্র প্রকাশিত হওয়ার দরুণ এ দেশের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান হইতে অযথা বঞ্চিত হইতেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এ দেশের রাসায়নিকগণের গবেষণার ফল সুষ্ঠুভাবে বৈজ্ঞানিক মহলে বহুল প্রচার মানসে রাসায়নিকগণের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হন এবং বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার কৃতী ছাত্র ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নীলরতন ধর ও ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের এবং তাঁহার ছাত্র-স্থানীয় ডাঃ (অধুনা স্যার) শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের সমবেত আপ্রাণ চেষ্টায় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির (Indian Chemical Society) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে ঢাকা কলেজের ডাঃ E.R.Watson তাঁহাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন।এই সময়ে Dr. Watson 'Cawnpore Harecourt Butler Technological Institute' এর অধ্যক্ষ ছিলেন।

এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির অনেক পূর্বে Asiatic Society বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার চর্চা প্রচার মানসে স্থাপিত বটে, কিন্তু রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার গবেষণা প্রচারে এই সমিতি নানা কারণে বিশেষ সহায়তা করিতে সমর্থ হয় নাই।

আচার্য রায়ের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ Watson-এর অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে এই প্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রিকৃত হয় এবং ইহার কার্য্যালয় ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথের গৃহে স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বর আচার্য্য রায়ের সভাপতিত্বে সভার প্রথম সাধারণ সম্মেলনের উদ্বোধন হয়।

ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির প্রথম সভাপতির পদে আচার্য্য রায়কে বরণ করা হয় ও ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রথম কর্মসচিব এবং ডাঃ Watson ও ডাঃ নীলরতন ধর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

যে মহান্ আদর্শ লইয়া আচার্য রায় এই সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অক্ষুণ্ন রাখিয়া এই প্রতিষ্ঠানের নির্বাহকগণ গত ২১ বৎসর ধরিয়া ভারতের রাসায়নিক গবেষণার ফল পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিক মহলে পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন। আচার্য রায় এই সমিতির কোষে সর্ব্বসমেত ১৩ হাজার টাকা দান করেন।

আচার্য রায় সপ্ততি বর্ষে পদার্পণ করিলে এই সমিতির সভ্যগণ তাঁহার সপ্ততি জন্মতিথি স্মরণার্থে "Sir P.C. Roy 70th Birth commemoration volume" শীর্ষক একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া আচার্য রায়ের সপ্ততি জন্মতিথির অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। তাঁহার কৃতী ছাত্র ও ভারতের সকল প্রসিদ্ধ রসায়নবেত্তাগণ এবং England,Germany, France, Austria, Switzerland, ও আমেরিকার বিশ্বশ্রুত রাসায়নিকগণ আচার্য রায়কে যথোচিত মর্য্যাদা করিতে তাঁহাদের মৌলিক গবেষণা এই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

ভারতীয় রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া আচার্য রায় এ দেশের রাসায়নিকগণের যে দারুণ অভাব পূরণ করিয়াছেন, তাহা রসায়নবিদ্যাচর্চায় তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

বিনীত লেখক আচার্য রায়ের সহিত বিগত ২৫ বৎসর ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যখন এই প্রতিষ্ঠানে সহকারী সম্পাদকরূপে আমি যোগদান করি, প্রথম দিনেই তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "পারবি ত? যদি না পারিস্ ত' এখনি সরে পড়।" ইহার পর প্রায় প্রতিদিন এই প্রতিষ্ঠানের শুভাশুভ সম্বন্ধে নানা প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন এবং যে দিনই কোন বিশেষ সুসংবাদ দিতে পারিতাম, সে-দিন তাঁহার ঘরে ডাকিয়া নানাপ্রকার মুখরোচক মিষ্টান্নে রসনা পরিতৃপ্ত করাইতেন।

ভারতের এই জ্ঞানগুরু একনিষ্ঠ সাধকের সরল, উদার, অনাড়ম্বর, নিরহঙ্কার জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই এমন কেহ নাই! তাঁহাকে অনেক ভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি! তাঁহাকে দেখিয়াছি চরকার সূতা কাটিতে, তাঁহাকে দেখিয়াছি স্বহস্তে ভোজ্যবস্তু পরিবেশন করিতে, তাঁহাকে দেখিয়াছি পরিধেয় বস্ত্র নিজ হস্তে ধৌত করিয়া নিজ হস্তে রৌদ্রে মেলিয়া দিতে, তাঁহাকে দেখিয়াছি অশ্বযান ও মোটরে বেড়াইতে, কাছে বসিয়া গল্প করিতে। আশ্চর্যের বিষয়, কোন দিনই কোন কথা বা ব্যবহার ও আচরণে কোন রূপ অহমিকার বা উষ্মার ভাব প্রকাশ করিতে দেখি নাই। এবং তাঁর অতিবড় বিরুদ্ধবাদীর প্রতি তিনি কোন দিন কোন প্রকার দ্বেষ পোষণ করিতেন না ও রাগত হইতেন না। তিনি ছিলেন বাস্তবিক শিশুর মত সরল, কিন্তু কর্ত্তব্যপালনে ছিলেন ইস্পাতের মত কঠিন। কাহারও কর্ত্তব্যচ্যুতি অথবা সময়ানুবর্ত্তিতার অভাব দেখিলে তিনি বিরক্ত হইতেন, ক্ষুব্ধ হইতেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইতেন না, এইখানেই তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য।

মাসিক বসুমতী: শ্রাবণ ১৩৫১।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণে

শ্রীহরিগোপাল বিশ্বাস

মানুষ ও পশুর মাঝে যারা নিত্য রচে ব্যবধান।

ধূলিমাখা ধরার সন্তানে যাহারা দেবত্ব করে দান

তুমি তাহাদেরই একজন

তাই বিশ্বজন

ভক্তিভরে প্রণতি জানায়

হে মহর্ষি হে প্রফুল্ল রায়!

কঠোর সাধনালব্ধ অপার্থিব বিদ্যামহাধন

যাহারা সহস্র শিষ্যে বিতরণ করি' আজীবন

করে মহা আদর্শ স্থাপন।

তুমি তাহাদেরই একজন।

যুগস্রষ্টা হে নরদেবতা

জ্ঞানের দেউলতলে তুমি ছিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোতা।

দেশের দুর্দ্দশা হেরি যাদের পরাণ কেঁদে ওঠে

প্লাবনে ঝঞ্ঝায় যারা দুর্গতের ত্রাণতরে ছোটে

নিজসুখ দেয় বিসর্জন

তুমি যে তাদেরই একজন

হে সঙ্কটত্রাতা বীর

তব তিরোধানে আজ বিষাদ- নৈরাশ্য মেঘে ঢাকিয়াছে আর্তের কুটির।

বিজ্ঞানের পুণ্য স্নিগ্ধ যশঃস্বর্গমাঝে
দেশের দারুণ দৈন্য যাদের হৃদয়ে তীব্র বাজে
করে শত শিল্পের স্থাপন
তুমি যে তাদেরই একজন
লোকোত্তর তব প্রতিভায়
সমুজ্জ্বল আজ দেশ শিল্প-মহিমায়।

যাহাদের চিতাগ্নির পবিত্র শিখায়
মানব মনের তমোরাশি নাশ পায়
সত্য পথ করে উদ্‌ঘাটন
মর্তে করে স্বর্গের সৃজন

তুমি দেব, তারই একজন
যাহাদের চিতাভস্ম চিত্তক্ষেত্রে আনে উর্বরতা
আবির্ভূত হয় দেশে অভিনব মহামানবতা
নর লভে দেবের পর্যায়
তাদের অগ্রণী তুমি,
মৃত্যুঞ্জয়ী হে প্রফুল্ল রায়,
হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য কোটি ভক্ত সঁপে তব পায়।

প্রবাসী : শ্রাবণ ১৩৫১।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীকরুণাময় বসু

ভারতের ভাগ্যাকাশে নির্বাপিত শেষ সূর্য আজি।
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অস্তমিত, এই ধ্বনি বাজি
উঠিয়াছে দিগন্তরে ; আর্তকণ্ঠে ডাকে যাত্রীদল,
তটপ্রান্তে লুপ্তরেখা পথভ্রান্ত তরী টলমল।
বর্ষণকরুণ মুখে সুধাস্নিগ্ধ শরতের হাসি,
সতেজ শ্যামল দান চিরদিন উঠেছে বিকাশি
হৃদয়ের বন্ধ্যাশাখে ; প্রাণতাই পুষ্প মুকুলিত
আকাশে আলোর লীলা রঙে রঙে মন লীলায়িত।
ন্যায়নিষ্ঠ সত্যবিদ্, বিজ্ঞানের জ্ঞানের আধার,

মানবের চিত্তপটে মুছিয়াছ ছায়ার আঁধার
সুদূরের রশ্মি ফেলি ; চিরভোলা হে মহা-পথিক
একবার ফিরে চাও, এ দুর্দিনে আলো দেখা দিক।
দরিদ্র দরদী বন্ধু, হে তপস্বী, কর্মক্লান্ত বীর !
যাও তুমি ফিরে যাও, ডাকিতেছে ছায়া সন্ধ্যানীড়।
সুষুপ্তির শান্তি-স্বর্গে আজ হ'তে শতাব্দীর পথে
তোমার অমৃতরূপ রেখে গেলে মৃত্যুর জগতে।
দেহহীন ভাব মূর্তি অচঞ্চল স্বপ্ন-স্বর্গ-তটে
তুমি নাই, তুমি আছো মানুষের কল্পনার পটে।

'প্রবাসী' : শ্রাবণ ১৩৫১।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অধ্যাপক এম্. এন্. কিউ. জুলফিকার আলি

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই— তাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ আমার বড় কোনদিন হয়নি। তবে একটি দিন আমি তাঁকে খুবই কাছে পেয়েছিলাম। সেই দিনটির কথা আমার স্মৃতির মণি-কোঠায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে— আর তিনি সাহিত্যরসিক হিসাবে কি প্রভাব আমার উপর বিস্তার করেছিলেন তাই আপনাদের নিকট আজ আমি নিবেদন করব।

সবেমাত্র আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে বেরিয়েছি, তখন পর্য্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে মাসিক পত্রের মারফতেই আমার পরিচয়। এমন সময় তিনি আমাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গত জে. এন. রায় আই-সি-এসের সঙ্গে আমাদের দেশের বাড়ীতে আসেন। মোটরটি যখন গ্রামের পথে আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি এল অনেক ছেলে-ছোকরারা মোটরের পাদানিতে লাফিয়ে উঠে পড়লাম, আচার্য ত মহা খুশী— আমাদের কারো কান টেনে দিলেন, কারো বুকের উপর জোরে ঘুসি চালিয়ে দিয়ে হেসে কুটিকুটি হয়ে পড়লেন। মিঃ রায় অবশ্য খুবই যে স্বস্তি বোধ করছিলেন তা নয়, কারণ সরু রাস্তায় মোটর উল্টে যাবার যথেষ্ট ভয় ছিল। যা হোক, মোটর শেষ পর্য্যন্ত এসে বাড়ীর দরজায় নিরাপদেই পৌঁছাল।

তখন কিছুদিন চোখের অসুখের জন্য আমাকে চশমা ব্যবহার করতে হয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্র গাড়ী থেকে নেমেই আমার চশমা জোড়া ছুড়ে দূরে ফেলে দিলেন— ভাগ্যিস, বড় বড় ঘাসের ওপর গিয়ে পড়ল— তাই ভাঙেনি। তারপর আমার এক বলিষ্ঠ বন্ধুর গলা ধরে পড়লেন ঝুলে— সে বেশ শক্ত ছোঁড়া, এতটুকু হেলেনি। এতে তিনি খুশী হয়ে বেশ জোরে তার বুকের উপর কষিয়ে দিলেন এক কিল, এতেও সে কাবু হয়নি। এতে তিনি আরো খুশী হয়ে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন— "হ্যাঁ বেশ ষণ্ড আছিস— তাই-ই হবি কাজের লোক!"— কি আনন্দের মধ্যেই দু-তিনটি ঘন্টা কেটে গেল!

কলেজে যখন ফিরে গেলুম, ইতিহাসের অধ্যাপক আমার ক্লাসে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করায় প্রফুল্লচন্দ্রের কথা উঠল, তিনি সেবার তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। প্রফুল্লচন্দ্রের আসার সংবাদ পেয়ে তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় যান। তো গেটে চাপরাসীকে জিজ্ঞেস করেন যে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র আছেন কিনা। চাপরাসী বললে, না স্যার প্রফুল্লচন্দ্র ত এখানে আসেন নি। অধ্যাপক একটু নিরাশ হলেন— প্রফুল্লচন্দ্রের যে ওখানেই থাকবার কথা! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আছেন কিনা। চাপরাসী বললে যে তিনি আছেন। "আর কি তাঁর ওখানে কেউ আছে?" অধ্যাপক শুধোলেন। "হ্যাঁ, বিশ্রী এক ঢোলা কোট গায়ে বড় বড় দাড়ি গোঁফওয়ালা এক বুড়ো আছেন— বোধ হয় কোন পণ্ডিত হবেন।" অধ্যাপক অন্ধকারে যেন কিছু আলো দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর কার্ড পাঠিয়ে দিলেন।

এই অভিজ্ঞতার কথা বললে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রফুল্লচন্দ্র ও অধ্যাপক— তিনজনের মধ্যে বেশ এক চোট হাসাহাসি হ'ল। হঠাৎ, এক সময় প্রফুল্লচন্দ্র গম্ভীর হয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, "কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, তোমার চাপরাসী সম্বন্ধে নালিশ— সে আমার এ কোটের

অপমান করেছে সে একে বিশ্রী বললে। জানো, এ কোট বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাত করে এসেছে।'' ম্যাজিষ্ট্রেট ও অধ্যাপক দুজনেই উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চাইতে তিনি 'কোটের' ইতিহাস বললেন। সেবার তিনি কোনো ব্যাপার উপলক্ষে দিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে কোনো এক বড় হোটেলে গিয়ে তিনি ওঠেন। সঙ্গে তাঁর যা সাধারণ কাপড়চোপড় তা-ই ছিল। কিন্তু পরদিন ভোর না হতেই এক বড় 'ফার্মে'র এক কর্ম্মচারী কয়েক প্রস্থ 'সুট' নিয়ে এসে হাজির। প্রফুল্লচন্দ্র ত অবাক্! তিনি এ অর্ডার কখন দিলেন? হোটেলের ম্যানেজার একটু লজ্জিত ভাভে হাত কচলাতে কচলাতে এসে বললে, ''স্যার, আমিই আপনার পক্ষ থেকে এ অর্ডার দিয়েছিলাম। কাল আপনি বাইরে গেলে দেখলাম আপনার ঘর খোলা— আপনার সুটকেসটিও খোলা এবং তাতে বিশেষ কোনো কাপড়-ও নেই। মনে করলাম হয়ত ভুলে আপনার কাপড় আনা হয়নি। অথচ আজ ভোরেই হিজ এক্সেলেন্সির সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করতে হবে'' ইত্যাদি। হেসে পি. সি. রায় বললেন— ''বাধ্য হয়ে সুট একটি রেখে সে দিন পরতে হ'ল। কিন্তু ট্রাউজার ও ভেস্টটি যে তার পরে কোথায় গেল তা আর খুঁজে পাইনি। কিন্তু, ব্যাপারটি এখন তোমরাই বিবেচনা করে দেখ যে ব্যাটা চাপরাসীর এ কোটটির নিন্দে করা ঠিক হয়েছে কিনা!''— বলে তিনি ছেলে মানুষের মত প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন।

সত্যি এমনি ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। এমনি অনাড়ম্বর ছিল তাঁর জীবন, এমনি ছিলেন তিনি আত্মভোলা, অথচ শুধু বিজ্ঞানেই নয় কতদিকে ছিল তাঁর প্রতিভা। এই সময়ে তিনি খবরের কাগজের 'কাটিঙে'র বিরাট স্তূপ সঙ্গে করে ফিরতেন এবং বক্তৃতার সময়ে নানা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যে-সব তথ্য দিতেন তা সত্যিই বিস্ময়কর ছিল।

এর কিছুদিন পরই পড়বার সুযোগ হয় খবরের কাগজে তাঁর আলিগড় ছাত্র-সংঘ প্রদত্ত ''মোসলেম সভ্যতা'' সম্বন্ধে বক্তৃতাটি। এই বক্তৃতাটি দেশের সুধীসমাজে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক তিনি— সারাদিন কাটে তাঁর রসায়নগারে— ইতিহাস পাঠের এত সময় জুটল তাঁর কোথা থেকে? বাস্তবিকই সে বক্তৃতাটি তাঁর ঐতিহাসিক জ্ঞানের অপূর্ব্ব সাক্ষী।

এর কিছুদিন পরে পড়লাম তাঁর ইংরাজী আত্মজীবনী। বিস্মিত হলাম শুধু তাঁর লিপিকৌশল দর্শনেই নয়; তাঁর ইংরাজী সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দর্শনেও অবাক হ'তে হল। কতদিন আগে পড়েছি সে বই, কিন্তু আজও মনে পড়ে Fielding- এর বইয়ের Country Esquire- এর সঙ্গে তাঁর পিতার তুলনা ইত্যাদি। তাঁর শেক্সপীয়রের প্রতি অনুরাগের কথা সকলেরই জানা আছে, কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির সঙ্গে যে তাঁর কত নিবিড় পরিচয় ছিল তা এই আত্মজীবনী থেকে জানা যায়।

এই বইয়ের আর একটি কথা আজও আমার বেশ মনে আছে। সে হচ্ছে বাঙালীর ডিগ্রীর মোহ দূর করবার প্রয়াস। সত্যিকার পাণ্ডিত্য যে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রীর উপর আদৌ নির্ভর করে না তা তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে যে শরৎচন্দ্রের ''নারীর মূল্য'' বইটির উল্লেখ করেছেন তাও বেশ মনে পড়ছে।

কিন্তু আপনাদের যদি এই ধারণা জন্মে থাকে যে প্রফুল্লচন্দ্র শুধু ইংরাজী সাহিত্যেরই প্রগাঢ়

পণ্ডিত ছিলেন তা হ'লে অত্যন্ত ভুল হবে।

এক সময় স্বর্গীয়া কবি কামিনী রায়ের পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ হয় এবং কামিনী রায়ের স্নেহলাভে ধন্য হই। তখন আমার জানবার সুযোগ হয় যে প্রফুল্লচন্দ্র কামিনী রায়ের কাব্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং গোটা ‘‘আলো ও ছায়া’’ কাব্য গ্রন্থখানি তাঁর মুখস্থ ছিল।

কলকাতায় একবার প্রেসিডেন্সী কলেজের কতিপয় বন্ধুর নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করি যে প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যাব। এক বন্ধু গম্ভীর হয়ে বললেন রবীন্দ্রনাথ আপনি খুব পড়েন জানি। কিন্তু তাঁর কতগুলি কবিতা মুখস্থ আছে— শরৎচন্দ্রেরই বা কি কি বই পড়া আছে, কত পাতা মুখস্থ বলতে পারবেন— এসব ঠিক করে তার পরে যেন যান। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করায় বললেন, আর্টের ছাত্র পেলে এ সব বিষয়ে তাদের পরীক্ষা করেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের প্রায় ভাল কাব্যগুলিই নাকি ছিল তার তন্ন তন্ন করে পড়া এবং ভাল ভাল অংশগুলি মুখস্থ। সে যাত্রা আর সাহস করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি।

দেশের সাহিত্য, সাময়িক পত্রগুলি যে তিনি কত অভিনিবেশ সহকারে পড়তেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যায়। বহুদিন পূর্ব্বে পড়া তাই জোর করে বলতে পারছিনে,— তবু বেশ মনে পড়ছে যে তাঁর ‘‘আত্ম-জীবনীতে’’ ময়মনসিংহের করটিয়া কলেজ ম্যাগাজিন থেকেও উদ্ধৃত রয়েছে।

বাস্তবিকই, বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক দরদী শিক্ষক, স্বনামধন্য পণ্ডিত, সর্ব্বজনপূজ্য দেশনায়ক বা দেশের ‘শিল্পোন্নতির’ তিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন— এ বললেও তাঁর সম্বন্ধে যেন সব কথা বলা হয় না। তিনি কতিপয় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করেছেন তা'ও ঠিক— কিন্তু এতেও দেশের অগ্রগতির পক্ষে তাঁর দানের মূল্য নিরূপিত হয় না। তিনি বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম স্রষ্টা— এ বললেও তাঁর ঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হয় না। আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ তিনি জাতীয় জীবনে এক বিরাট মহীরুহসম ছিলেন। আমার মতে তিনি সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ ছিলেন যাঁরা নিজেদের কর্মজীবনের সফলতারও বহু উর্দ্ধে বাস করেন। যাঁদের দৈনন্দিন জীবনধারা অলক্ষ্যে জাতীয় জীবনের মূল উৎসে আঘাত ক'রে জাতিকে এক নবজীবনে উদ্বুদ্ধ হবার প্রেরণা দেয়। ভারতের এই নব জাগরণের মূলে প্রফুল্লচন্দ্রের স্থান ঠিক কোথায়— সে -বিচারের ভার রইল ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের উপরে।

২৩শে জুন (১৯৪৪) তারিখে ঢাকা পূর্ব্ব-বাংলা ব্রাহ্ম সমাজে অনুষ্ঠিত শোক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার অনুলেখন।

প্রবাসী, শ্রাবণ: ১৩৫১।

আচার্য-প্রসঙ্গ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

সে অনেক দিনের কথা। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আমি দেওঘর স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত রচয়িতা ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি অনুরোধ পত্র লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে পরম আত্মীয়ের ন্যায় সাদর ব্যবহারে মুগ্ধ করেন। আমার বেশ স্মরণ আছে যে, যদিও আমি কোন্ বিষয় বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিব তাহা স্থির করি নাই, তথাপি রসায়ন যে পড়িব না, এ বিষয়ে আমি তখন কৃতনিশ্চয় ছিলাম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া আমার পূর্ব্বসংকল্প দূর হইয়া গেল। তখন হইতে এই দীর্ঘ ৪৫ বৎসর কাল তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাকিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে সেই সময় প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াইবার ভার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা বিচক্ষণ অধ্যাপকদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের উভয়েরই বক্তৃতা বহু পরীক্ষা (experiment) সমন্বিত থাকিত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নের মূল তথ্যগুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে নানা প্রকার কৌতূহলপ্রদ ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করিতেন। বলা বাহুল্য যে, রসায়নের ইতিহাস আচার্যদেবের বিশেষ প্রিয় বিষয় ছিল এবং এই বিষয়ে তিনি অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য তরুণ ছাত্রদিগের আগ্রহ এত অধিক ছিল যে, বক্তৃতা-মন্দিরে যথাসম্ভব সম্মুখের আসনে বসিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রতিযোগিতা হইত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিতান্ত সাধারণ ভাবে বেশ-ভূষা করিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সময় ছিটের গলাবন্ধ কোট ও পেন্টেলুন তিনি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন। মাথায় চেরা সিঁথি থাকিত। পেন্টেলুনে ছোট ছোট তালি অনেক সময় লক্ষ্য করিতাম। যে ব্যক্তি বক্তৃতাগারে পরীক্ষা-প্রদর্শনে তাঁহার সহায়তা করিত, তাহার গায়েও আচার্যদেবের পূর্ব্ব-ব্যবহৃত কোট শোভা পাইত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সহজেই ছাত্রদের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায়, বেশ-ভূষায় ছাত্রেরাও তাঁহার নিকট যাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিত না। তাঁহার দ্বার ছাত্রদিগের নিকট সর্ব্বদা অবারিত ছিল। তিনি নিজে চিরকুমার ছিলেন, ছাত্রদিগকেই তিনি পুত্রবৎ জ্ঞান করিতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার সময় এক দিনের ঘটনা আমার বিশেষ স্মরণ আছে। সে দিন রবিবার। আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে আচার্যদেবের ৯১নং আপার সার্কুলার রোডস্থ বাটীতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি, বহু দরিদ্র ছাত্র সেখানে সমবেত হইয়াছে এবং তিনি এক জনের পর এক জনকে ছোট ছোট কাগজের মোড়কে জড়ান টাকা দিতেছেন। পরে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার মাসিক বেতনের মাত্র ১০০ টাকা বাদে আর সমস্ত টাকা এইভাবে দান করিতেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আমি এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, এখন প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরেও উহা আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

আমি তাঁহাকে যত দিন দেখিয়াছি, তিনি সর্ব্বদাই ছাত্রমণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। কোন মেধাবী ছাত্র দেখিলেই চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, সেই ভাবে তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইতেন। ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডে (তদানীন্তন বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের অফিস) থাকিবার কালে তাঁহার ঐ ছোট বাসাতেই দুই-এক জন ছাত্র সর্ব্বদা থাকিত এবং পরে বিজ্ঞান কলেজে থাকিবার কালেও এই প্রথার কোন দিন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মধুর সম্পর্কের উচ্চ আদর্শ আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যমান। সরল অনাড়ম্বর ভাবে জীবনযাপন, ছাত্রগণকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন করিয়া আমাদের দেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ শিক্ষাদান করিতেন। উচ্চ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাংলার ছাত্র-সমাজের সম্মুখে এই মহৎ আদর্শ নূতন করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই জন্য গর্ভণমেন্ট-প্রদত্ত উচ্চ ''নাইট'' উপাধি পাইবার পরেও জনসাধারণ তাঁহাকে সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াই তৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রবৎসলতা একমুখে বর্ণনা করা অসম্ভব। তিনি কেবল তাহাদের মানসিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাহাদের শারীরিক উন্নতির দিকে তাঁহার সর্ব্বদা লক্ষ্য ছিল। কাহারও শীর্ণ দেহ বিশেষতঃ চোখে চশমা দেখিলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইতেন। বিশালবক্ষ সুদৃঢ় মাংসপেশীবহুল কোন বলবান যুবককে দেখিলে আহ্লাদিত হইতেন। বুকে ঘুসি মারিয়া বা পিঠে কিল মারিয়া তাহাদের শক্তি পরীক্ষা করিয়া তিনি বড়ই আনন্দ লাভ করিতেন।

ছাত্রদিগকে প্রশংসা-পত্র দান সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। কেহ কোন প্রশংসা বা অনুমোদন-পত্র চাহিতে আসিলে সাধারণতঃ আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। প্রথম প্রথম আমি কিভাবে প্রশংসা-পত্র দিতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। তাঁহার একটা বাঁধা সূত্র ছিল- ''এমন ছেলে হয় নাই- হইবে না। জন্মায় নাই- জন্মিবে না।'' বহু বৎসর ধরিয়া আর আমি তাঁহাকে প্রশংসা-পত্র দান সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করি নাই। তবে প্রশংসা-পত্র লিখিত হইলে তাঁহাকে একবার পড়িয়া শুনাইতাম। কদাচিৎ সামান্য পরিবর্ত্তন করিতেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার ছাত্রদের সচরাচর দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতেন। যে সকল ছাত্র প্রথম হইতে তাঁহার নিকট রসায়ন অধ্যয়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার নিজের ছেলে বলিতেন; আর যাহারা অন্য স্থানে পাঠ সমাপনের পর শেষের দুই এক বৎসর তাঁহার ছাত্র থাকিত তাহাদিগকে তিনি গ্রাম্যভাষায় তাঁহার ''হাটান'' ছেলে বলিতেন। (বিধবা মাতার পুনর্ব্বিবাহের পর তাঁহার যে সন্তান তাঁহার সহিত নূতন পিতার গৃহে আসে, তাহাদিগকে ''হাটান'' ছেলে বলা হয়।)

ছাত্রদের কিসে উন্নতি হইবে সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিতেন। কেহ কোন উচ্চাঙ্গের গবেষণা করিলে তাহা শতমুখে প্রচার করিতেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য স্যর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ--- ''ঘোষের নিয়ম'' আবিষ্কার করিলে তিনি আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের গৌরব বর্দ্ধিত হউক ইহা তাঁহার সর্ব্বদাই কাম্য ছিল। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে

বহু বার "সর্ব্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ং" এই মহাবাক্য বলিতে শুনিয়াছি। রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার প্রবর্ত্তন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজের পরীক্ষাগারে তিনি পারদ ধাতুর কয়েকটি নূতন যৌগিক আবিষ্কার করেন এবং সেই সময় হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করা পর্য্যন্ত তিনি শিষ্যদিগের সহিত বহু মৌলিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নগারে মৌলিক গবেষণার উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম এক রকম ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থায় শত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এদেশে রসায়ন বিষয়ে মৌলিক গবেষণার প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অদম্য উৎসাহ এবং বিরাট অধ্যবসায়ের ফল।

মৌলিক গবেষণায় আবিষ্কৃত তথ্যগুলি পূর্বে তিনি লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেন। একটি নিজস্ব রসায়ন বিষয়ক পত্রিকার অভাব তিনি অনেক দিন হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষীয় রাসায়নিক সভা স্থাপিত হয়, তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইহার অন্যতম উদ্যোক্তা এবং প্রথম সভাপতি ছিলেন। তখন হইতে রসায়ন বিষয়ক সমস্ত প্রবন্ধ এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত করিতেন এবং তাঁহার ছাত্রদের তাহা করিতে উৎসাহ দিতেন। পরে রাসায়নিক সভার গৃহনির্মাণকল্পে তিনি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা কেবল বিশুদ্ধ রসায়নের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণাতেই পর্যবসিত হয় নাই। এদেশে ব্যবহারিক রসায়নের প্রথম প্রবর্ত্তন তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। স্বোপার্জ্জিত সামান্য মূলধন লইয়া তিনি ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডস্থ বাটীতে প্রথম বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের সূচনা করেন। এখন ইহা সমগ্র এশিয়ার জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙালী যে পশ্চাৎপদ হইতেছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই ক্ষোভ চিরজীবন ছিল। বাঙালী যুবকের চাকরীর মোহ দূর করিতে, তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত করিতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কেহ কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে চাহিলে তাহাকে অর্থ দিয়া পরামর্শ দিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা দেশে যতগুলি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তিনি যে জড়িত ছিলেন তাহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে পরস্পর-বিরোধী বহু গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। এক দিকে সর্ব্বত্যাগী তপস্বী, অপরদিকে তীক্ষ্ণ ব্যবসায়ী বুদ্ধিসম্পন্ন কর্মী পুরুষ। কিন্তু অধ্যয়ন-অধ্যাপনাই হউক আর ব্যবসা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানই হউক, সকল বিষয়েই তাঁহার নিষ্কাম কর্মের মূলে ছিল দেশপ্রেম। সমস্ত শক্তি তিনি দেশসেবার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিসে দেশের কল্যাণ হইবে, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। দেশে চিকিৎসাবিদ্যার প্রসার- প্রচেষ্টা যাহার অন্যতম ফল কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, তাহাতেও তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। যাদবপুর যক্ষ্মা অরোগ্যালয়ের তিনি অন্যতম ট্রাস্টী ছিলেন। এককথায় বলিতে গেলে বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন।

আবার সাহিত্যক্ষেত্রেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ

হিন্দু রসায়নের ইতিহাস প্রাচীন ভারতীয়দিগের রসায়ন জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহা রচনা করিবার জন্য আচার্যদেব চরক, সুশ্রুত, রসেন্দ্রচিন্তামণি রসরত্নসমুচ্চয়, রসেন্দ্রসার সংগ্রহ প্রভৃতি বহু প্রাচীন পুঁথি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও নিরপেক্ষ বিচারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যা' াকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এবং তখন হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি বিজ্ঞান কলেজেই অতিবাহিত করিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট ছিল। যতদিন শরীরে বল ছিল, প্রত্যূষে উঠিয়া কিছু কাল ভ্রমণ করিতেন। সার্কুলার রোডস্থ গ্রীয়ার পার্ক যে সময়ে সাধারণের জন্য খোলা ছিল, তখন অনেক সময় সকালে খালি পায়ে সেখানে বেড়াইতেন, কখনও বা বিজ্ঞান কলেজের ছাদে বেড়াইতেন। তাহার পর পাঠে বসিতেন। পাঠের সময় তিনি কোন প্রকার ব্যাঘাত সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ সেই সময় দেখা করিতে আসিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, কোন অর্ব্বাচীন একবার তাঁহাকে সেখানে প্রশ্ন করিয়াছিল, "আপনি কি পড়া-শুনা করিতেছেন?" উত্তরে আচার্যদেব (গ্রাম্য ভাষায়) বলেন, "না, আমি শৌচে বসিয়াছি।" প্রত্যহ বেলা ৯টার সময় তিনি পরীক্ষাগারে আসিতেন এবং বেলা সাড়ে ১১টা পর্য্যন্ত থাকিতেন। চিঠি-পত্রের উত্তর তিনি কখনও ফেলিয়া রাখিতেন না। তাহার পর ঘরে আসিয়া স্নানাহার সারিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার ২টার সময় পরীক্ষাগারে গিয়া সাড়ে ৪টা পর্য্যন্ত থাকিতেন।

প্রত্যহ বৈকাল ৬টার সময় গড়ের মাঠে প্রথমে কিছুকাল ভ্রমণ করিতেন, পরে লর্ড রবার্টসের প্রস্তর-মূর্ত্তির নীচে তথা-কথিত 'ময়দান ক্লাবের' অধিবেশন হইত। ৺প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, ৺উপেন্দ্রনাথ সেন, ৺গিরীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি অনেকেই আমরণ "ময়দান ক্লাবের" সভ্য ছিলেন। আমি মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতাম। ক্লাবের একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানে কোন প্রকার গুরুতর বিষয়ের আলোচনা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) বলিতে গেলে যুদ্ধ বিষয়ে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনাই ক্লাবের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল। রঙ্গপুর কলেজের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যুদ্ধের দৈনন্দিন পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে বর্ণনা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন।

আনুমানিক ৯টা পর্য্যন্ত ময়দানে কাটাইয়া আচার্য্যদেব গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। এবং পরে সামান্য আহার করিয়া শয়ন করিতেন। আচার্যদেবের দেহ শীর্ণ থাকা সত্ত্বেও তিনি যে দীর্ঘ এবং কর্মবহুল জীবন লাভ করিয়াছিলেন তাহার একটি প্রধান কারণ তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিতা।

কোন প্রকার নিয়ম-বহির্ভূত কাজ দেখিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। বৈদ্যুতিক পাখা খুলিয়া রাখিয়া ঘরের বাহিরে কেহ চলিয়া গেলে, গ্যাস বা জল অপচয় করিলে তিনি দোষী ব্যক্তিকে—সে যে কেহ হউক না কেন, তীব্র ভর্ৎসনা করিতেন। গবেষণায় নিযুক্ত অধ্যাপক বা ছাত্রদের যেমন তিনি উৎসাহিত করিতেন, তেমনি তাহাদের কেহ সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত পরীক্ষাগারে থাকিলে বিরক্ত হইতেন। যদি কেহ থাকিতেন তবে আচার্যদেব ময়দান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন

জানিতে পারিলেই পরীক্ষাগারের গ্যাস, বৈদ্যুতিক আলোক ইত্যাদি নির্ব্বাপিত করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন এবং পরে আচার্যদেব আপন কক্ষে চলিয়া গেলে আবার আলো জ্বালিতেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অসাধারণ কর্মকুশলতার ও সুপ্রণালীবদ্ধ ভাবে কার্য করাইবার প্রথম পরিচয় পাই উত্তরবঙ্গ জল-প্লাবনের সময়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বিজ্ঞান কলেজ একটি বিরাট কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। অর্থ, নূতন ও পুরাতন বস্ত্রাদি, কম্বল, ঔষধ-পথ্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ এবং সংবাদ-সংগ্রহ ও প্রকাশও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আচার্যদেব সমস্তই নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। সেই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বন্যাপীড়িতদের প্রতি সহানুভূতি কত দূর জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন! আমি প্রথম দুই মাস কাল কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। এমন দিন গিয়াছে, যে দিন কেবল দুই শতাধিক টাকার অর্দ্ধপয়সা ও পয়সাই সংগ্রহীত হইয়াছে এবং এক-কালীন সর্ব্বসাকুল্যে কুড়ি হাজার টাকা আসিয়াছে।যাহার যেমন সাধ্য দান করিয়াছে—এমন কি রেলের কুলীরা রিলিফ কমিটির জিনিষ-পত্র গাড়ীতে উঠানো বা গাড়ী হইতে নামানোর জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক লইতে অস্বীকার করিয়াছে। জিনিষপত্র বাদে ৬ লক্ষ টাকা দুই মাসে রিলিফ কমিটির হাতে আসিয়াছিল।

উত্তরঙ্গ জল-প্লাবনের পরেও যখনই কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ বা জলপ্লাবন বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাক হইয়াছে তখনি দূর-দূরান্তর হইতে— ইরাণ, ইরাক, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রহ্মদেশ মালয় হইতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট লোকে টাকা পাঠাইয়াছে। কারণ, সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, আর্ত্ত দেশবাসীর ক্রন্দনের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলে আচার্যদেব কখন নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিবেন না। লোকের ইহাও বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইলে তাহার অসদ্ব্যয় কদাচ হইবে না।

গত দুই বৎসর হইতে আচার্যদেব এক প্রকার চলৎশক্তি-রহিত এবং শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। এ জন্য গত বৎসরের ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা আমরা তাঁহাকে জানিতে দিই নাই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত লোকচক্ষুর গোচর হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে নূতন কিছু সংবাদ দেওয়া কঠিন। তিনি নিতান্ত সাদাসিধা ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। পোষাক-পরিচ্ছদ যেমন অনাড়ম্বর ছিল তেমনই আহারও ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত। সুক্তো, মোচার ঘন্ট, মাছের ঝোল ইত্যাদি খাইতে ভালবাসিতেন। আমার স্ত্রী বহু বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে তাঁহার জন্য কিছু কিছু তরকারী রন্ধন করিয়া পাঠাইতেন। কচু, ওল এবং "মৌ ঝোলা" গুড় আচার্যদেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। গায়ের খদ্দরের জামা অনেক সময় ছেঁড়া থাকিত। আচার্যদেবের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেনের মুখে শুনিয়াছি, এক দিন তিনি ডাঃ সেনকে কথা-প্রসঙ্গে নিজের ছেঁড়া জামা দেখাইয়াছিলেন। ডাঃ সেন বলেন— "Some people cannot be happy unless they are miserable." ইহার উত্তরে আচার্য বলেন— "দেখ হেমেন্দ্র, Miser Miserable একই ধাতু হইতে উৎপন্ন শব্দ।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বভাবতঃ পরিহাস-রসিক ছিলেন। তাঁহার দেশহিতৈষণা ও স্বদেশপ্রেমের জন্য তাঁহার কার্য্যকলাপের উপর গুপ্ত পুলিশের তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাঁহাকে C.I.E. উপাধিতে ভূষিত করা হইবার পর একবার তিনি কোন পুলিসের কর্ম্মচারীকে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "তোমরা

আমার আর কিছু করিতে পারিবে না— আমি তোমাদের চেয়ে উঁচু; তোমরা C.I.D. আর আমি C.I.E" পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অত্যন্ত নিয়মপরতন্ত্র ছিলেন। কিন্তু যে নিয়ম তাঁহার গবেষণা-কার্য্যের পক্ষে হানিকর সে নিয়ম তিনি মানিতেন না। প্রেসিডেন্সী কলেজে শেষ কয়েক বৎসর আচার্যদেবের প্রথম সময়ের ছাত্র শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের সহিত এই প্রকারের নিয়ম লঙ্ঘন কখনও কখনও বাক্‌বিতণ্ডা হইত। ভাদুড়ী মহাশয়ের প্রসঙ্গ উঠিলে অনেক সময় আচার্যদেব তাঁহাকে "ইন্সপেক্টর জাবার্ট" নামে অভিহিত করিতেন।

পর্ব্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া তাহার উচ্চতা উপলব্ধি করা যায় না। দূর হইতেই ইহা সম্ভব হয়। আমাদের যদিও তাঁহার সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তথাপি তাঁহার বিরাটত্ব সম্পূর্ণ ভাবে কোন দিনই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যত দিন যাইতেছে তাঁহার অভাব আমরা তত তীব্র ভাবে অনুভব করিতেছি; এবং তিনি দুর্ব্বল, রোগ-জীর্ণ শরীর লইয়া এত কষ্টকর কার্য্য কি করিয়া সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি!

মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৫১।

আচার্য—বাণী

স্কুল কলেজে কতটুকু শিক্ষা হয়? আমার নিজের লেখাপড়া বিদ্যাবুদ্ধি যদি স্কুল কলেজে একগুণ হয়ে থাকে তবে নিজের চেষ্টায় সহস্রগুণ হয়েছে। রামতনু লাহিড়ীর জীবনী পড়েছ? কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী পড়েছ? কি কষ্ট করেই এঁরা লেখাপড়া শিখেছিলেন। পরিশ্রমের কাজ করিলেই যে লেখাপড়া হয় না, ছোট হয়ে যেতে হয় তাহা তোমরা বলতে পার না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী সম্বন্ধে লিখেছেন। বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ছিল তা শুনলে অবাক্ হতে হয়। আহার কোন দিন অন্ন জুটিত, কোন দিন জুটিত না। সেজন্য তাঁহাকে কেহ কখন বিমর্ষ দেখিত না। একবেলা তিনি নিজে রাঁধিয়া মাকে অবসর দিতেন। মা সেই সময় কাঁথা সেলাই করিয়া পয়সা রোজগার করিতেন।

আচার্য স্মরণে

নিমাইদাস রায়চৌধুরী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু সুধীর রচনা সম্ভারে একটি বৃহৎ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। এ অবস্থায় তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে কিছু নিবেদন করার ইচ্ছা করি। আচার্যদেব ৮৩ বছর বয়সে দেহ রক্ষা করেন । প্রথমাবস্থা ও জীবনের শেষ দুই বৎসর বাদ দিলেও খাঁটী ৬০ বৎসর ধরে বাঙ্গলায় বহু প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে, বিভিন্ন প্রবন্ধাদিতে, বক্তৃতায়, নিজ উপস্থিতিদ্বারা এবং শেষে "অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করে দেশের বিবিধ সেবা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থের ২৪টি বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি তাঁর আজীবনলব্ধ জ্ঞানসম্ভার মাতৃজাতিকে - যার ভবিষ্যৎ জাতির জননী তাদের উদ্দেশ্যে-উৎসর্গ করেন । এই পুস্তক বিশেষ করে বাঙ্গলার যুবকদের উদ্দেশ্যে লিখিত । ১৯৩২ সালে তাঁর লিখিত Life and Experiences of a Bengali Chemist নামে আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। এই দুই গ্রন্থের প্রকাশের পর আচার্যদেব সম্বন্ধে নূতন কিছু বলার প্রচেষ্টা বিশেষ দুঃসাধ্যকর ব্যাপার। কারণ বহুক্ষেত্রে এটি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা বা চর্বিতচর্বণ রূপ পরিগ্রহণ করে। লেখক তাঁর কথিত বহুবাণী সম্মেলনে এবং প্রত্যক্ষ সাহচর্যে যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছে - তার দ্বারা তাঁর জীবনের বহু অপ্রকাশিত ঘটনার উপর আলোকপাত করতে প্রয়াসী হচ্ছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহামানব, তা সর্ববাদীসম্মত। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব না হলে বাঙ্গলা দেশের যে কি দুর্দশা ঘটতো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঠিক একই ভাবে বলা যায় যে আচার্যদেবের উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মলাভও যেন দৈবনির্দেশিত।

ইংরাজ কবির Longfellow অমরবাণীর প্রতিধ্বনি করে বাঙ্গলার কবি লিখেছেন ঃ-

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন চির স্মরণীয়;
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।

বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দী একটা বিরাট স্বর্ণময় যুগ বলা যেতে পারে। রাজা রামমোহন রায়ের শেষ রশ্মি নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, কবি নবীনচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র

পালের মত দিক্‌পালগণের প্রভাব তাঁর জীবনের উপর যে বিশেষ রেখাপাত করেছিল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু যার নাম ও বাণী আচার্যদেবের জপমালা ছিল সেই মহামানব শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মন্ত্রগুরু ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয়না। দিনের বহুসময়ে তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা স্মরণ করত। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে শোনা গেছে যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপর শাস্ত্রী মহাশয়ের অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা ছিল। আচার্যদেব যে কাজেই হাত দেবেন তাতে সাফল্যলাভ করবেন এ কথা শাস্ত্রী মশাই জোরের সঙ্গে বার বার বলতেন।

আচার্যদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১ সালে খুলনার অন্তর্গত রাড়ুলী গ্রামে। নয় বৎসর বয়সে শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁকে কলিকাতায় আসতে হয়। এই পর্বের মধ্যে ও পরে বিদ্যালয়ের অবকাশে তিনি তাঁর নিজহস্তে বহু বৃক্ষরোপণ করে তাঁর সেবা করে গেছেন এবং দেশে গিয়ে প্রতি বছরই তাদের যত্ন করতেন। এখনও আচার্যের বহুস্মৃতি বহন করে তারা বর্তমান আছে। ১৯২৭ সালে বারাণসীতে 'সর্ব এশিয়া শিক্ষা সম্মেলন' (All Asia Educational Conference) প্রখ্যাত আনে বেসান্তের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তারই অন্যতম ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন বাবু ভগবান দাস। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, "How to approach God." অর্থাৎ আমরা কিভাবে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারি। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভের প্রকৃষ্ট পথ বৃক্ষসেবা। আচার্যদেব তাঁর জীবনের প্রারম্ভেই এই সত্যের পূজারী হয়েছিলেন বলা যায়। আত্মজীবনীতে তাঁর এই সব পর্বের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির জীবনে মাতৃভক্তির যেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সম্বন্ধেও তা সমভাবে বলা চলে। বার্ধক্যেও তাঁর মায়ের কথা উল্লেখ করতে তিনি বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়তেন দেখা গেছে। তাঁর ভ্রাতা, ভগ্নী, ও আত্মীয়গণের প্রতি স্নেহ-ভক্তি চিরদিন অটুট ছিল। গ্রামের রাস্তাঘাটের প্রতি দৃষ্টি ও পল্লীর প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্বন্ধ আজীবন বর্তমান ছিল। চিরজীবন গ্রীষ্মাবকাশে এবং অবসর পেলেই স্বগ্রাম রাড়ুলীতে ও নিকটস্থ সাহিহাটি প্রভৃতি পল্লীতে গিয়ে সেখানকার গ্রামবাসীদের অবস্থা ও দুঃখদুর্দশার বিবরণ নেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে তা নিরসন করার তিনি অগ্রণী ছিলেন।

১৯০০ সালে অর্থাৎ ৩৯ বৎসর বয়সে তাঁর সমস্ত অর্জিত ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অর্জেয় সম্পত্তি ট্রাস্টিদের হাতে সমর্পণ করেন। 'এডুকেশন সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে খুলনা জেলার নিরক্ষরতা দূর করার প্রয়াস তিনি করেছিলেন। যখন দেশে যেতেন পল্লীর ও তন্নিকটবর্তী গ্রামসমূহের পাঠশালার শিক্ষকদের পড়ুয়াসহ আহ্বান করে দিনের পর দিন খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা ও শিক্ষকদের নূতন বস্ত্র ও অর্থ দিয়ে তাদের উৎসাহিত করা তার এক বিশেষ আনন্দকর আয়োজন ছিল। গ্রামবাসীরা এই দিনগুলির

অপেক্ষায় থাকত।

১৯২০-২১ সালে খুলনা জেলা ঝড়ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত হয়, ফলে দারুণ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। আচার্যদেব নিজে পদব্রজে রোজ ১০ - ১২ মাইল গ্রামে দুর্গম পথ অতিক্রম করে সাঁইহাটি, রাড়ুলী, কাটিপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীদের দুঃখদুর্দশা লাঘব করেছিলেন। উল্লেখ করা উচিত যে সঙ্গে সঙ্গে সেই সব গ্রামে তাঁর চেষ্টায় বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও উদ্ভব হয়েছিল।

আচার্য রায়ের গ্রামে রাড়ুলীতে প্রায় ৫০ বিঘার উপর কপোতাক্ষের তীরে একটি বিরাট স্কুল নির্মিত আছে। এটির পশ্চাতেও আচার্যদেবের দান ও প্রচেষ্টা কতখানি তাহা না বলিলেও বোঝা যায়। তাঁর একান্ত ইচ্ছা হয়েছিল যে এটিকে একটি কৃষি বিদ্যালয়ে রূপায়িত করা; কিন্তু নানা বাধাবিপত্তিতে সে ইচ্ছা আর পূরণ করা সম্ভবপর হয়নি।

১৯৫৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস দার্জিলিং - এ দেহত্যাগ করেন। সেই সময় আচার্য রায় ও মহাত্মা গান্ধী একই ট্রেনে খুলনা থেকে আসছিলেন। গান্ধীজির রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় এই সময় ক্ষুদ্র একটি প্রশ্নে। তিনি আচার্য রায়কে দেশবন্ধুর শূণ্য স্থান পূরণের জন্য প্রশ্ন করেন যে– "What do You think of Sen Gupta?" আচার্য রায় ইহা পূর্ণ সমর্থন করেন। কৌতুহলী যুবক ও জনগণের জন্য প্রায় প্রতিটি স্টেশনে তাঁদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। কোন স্টেশনে গান্ধীজীর দর্শনার্থী যুবকেরা আচার্য রায়কে বলিয়া উঠে যে গান্ধীজীর তো দাড়ি নাই তবে ইনি কে? এর পর থেকে আচার্য রায় গান্ধীজীর সঙ্গে এক ট্রেনে ভ্রমণ না করার কৃতসংকল্প হন।

১৯২৩ সালে ফরিদপুরে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক বিরাট অধিবেশন হয়। গান্ধীজীও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে সমাজ-শাখার বিশেষ সম্মেলনে আচার্যদেব পৌরোহিত্য করে ওজস্বিনী ভাষায় সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর পক্ষ গ্রহণ করে তদানীন্তন সমাজপতিদের ত্রুটিবিচ্যুতির যে সমালোচনা করেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর সেই চিরন্তন উক্তি - ''কুকুর বেড়াল আঁস্তাকুড় থেকে এসে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলে আমাদের মনে কোন নীচ ভাব জাগে না, তবুও এই অনুন্নত শ্রেণীকে আমরা চিরদিনই অধম ও ঘৃণ্য মনে করে পদদলিত ও একঘরে রেখে সমাজকে সব দিক থেকে দুর্বল ও ঘুণ ধরবার ব্যবস্থা করেছি'' এই সভায় ঘোষিত হয়। ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীরা এরই সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের মধ্যে বিরাট বিভেদের সৃষ্টি করেছেন।

১৯২৫ সালে গান্ধীজীর পৌরোহিত্যে খাদি-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। তাঁরই আদর্শ ও প্রেরণা কার্যে রূপ দেওয়ার জন্য সেই সময় থেকে আচার্যদেব চরখার বাণী প্রচার করে নিজে নিয়মিত চরখা কেটে এবং একটা খদ্দরের লুঙ্গি পরে আমরণ দেশেবিদেশে ভ্রমণ করেছেন।

তিনি বলতেন, "I am the disciple of the semi-naked Fakir"

১৯২৮ সাল থেকে শারীরিক অসুস্থতা ও বার্ধক্যের দরুণ বোটে (Boat) নদীপথে খুলনা জেলার বিভিন্ন গ্রামে উপস্থিত হয়েছেন। বিদ্যালয়ের পারিতোষিক সভা উপলক্ষে মিলিত হয়েছেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে। ১৯৩১ সালে ৭০ বৎসর বয়সে টাকীর অদূরবর্তী সোদপুর গ্রামে ''পল্লী-মিলন সমিতির'' ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর বাল্যজীবনে গ্রামের মধুর দিনগুলির স্মৃতিই বেশী করে বলেছিলেন। নিজে অর্থ দিয়ে প্রতি বৎসর এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে খুলনার অত্যন্ত অনুন্নত মুসলমান-প্রধান গ্রামে পারিতোষিক বিতরণ উৎসবের সৃষ্টি করতেন। সেই উৎসবপর্বে নব প্রাণের সাড়া পড়ে যেতো। হাজার হাজার লোকের সমক্ষে খোলা মাঠে মাইকের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেন একেবারে পাগলের মতো।

তাঁর জীবনে ভোর সাড়ে চারটায় শয্যাত্যাগ এবং প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতরাশ শেষে কিছুক্ষণ মুক্তপদে পায়চারি করে ঘন্টাখানেকের ভিতর অধ্যাবসায়ী ছাত্রের মত পাঠে মনোনিবেশ এক নিয়মিত অভ্যাস ছিল। সোদপুর গ্রামে ১৯৩০ সালে প্রথম উপস্থিতির সময়ে জেলেদের পাঠশালায় প্রাতরাশ সেরে পড়ুয়াদের পাঠ গ্রহণ এবং সন্ধ্যায় তাদের হরিলুটদের বাতাসা নেবার জন্য সকলের সাথে কোঁচড় পাতিয়া বসা এক অবিস্মরণীয় মধুর স্মৃতি। পদব্রজে জেলেদের শিরোমণির বাড়ী উপস্থিত হয়ে তাদের অভাব অভিযোগ অসুবিধার আলোচনা করা ও পরামর্শ দেওয়াতে তাঁহার দেশপ্রীতির অপূর্ব দৃষ্টান্ত পাই। ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত সোদপুরে যাওয়া তাঁর একটি নিয়মের মধ্যে ছিল। সেখান থেকে বোটে করে খুলনা জেলার সমস্ত পল্লীতে পল্লীতে ফিরতেন।

১৯৩০ সালের পর থেকে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বড় বড় নেতাদের গ্রেপ্তার সুরু হল। তার ফলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গলা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবার জন্য আহ্বান পান। অনেকের কাছে প্রশ্ন শোনা যায়, তিনি কখনও কারাবরণ করেন নি তবুও এটা সম্ভব হলো কি করে? এর কারণ প্রধানত চিরদিন তাঁর কার্যক্ষেত্র ছিল গঠনমুলক। তা উগ্র রাজনীতির বশবর্তী ছিল না। সরকারী খাতায় তাঁর নাম ছিল, Revolutionary in the garb of a Scientist কারণ তাঁর আশ্রয়ে বহু সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবী পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে বহুদিন কাটিয়ে গেছে। ১৯৩৩ সালে, করাচীতে শিল্প-মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে যান এবং সেখানকার সমব্যয় ব্যাঙ্ক উদ্বোধন করেন। সেই সময় করাচীর পৌরপ্রধান জামসেঠ্জী তাঁকে বিরাট ভাবে পৌরসম্বর্ধনা জানান। পার্সীদের বৃহৎ সমাজের পক্ষ থেকে তাদের কুলপুরোহিত বিশিষ্ট জ্ঞানী, শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার ডাঃ চাল্লা আচার্য রায়ের হিন্দু কেমিষ্ট্রি সৃষ্টি প্রভৃতি তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ

করে তাঁকে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। ভাষণ-দান উপলক্ষে আচার্য রায় পার্সীদের বিলাসিতা ত্যাগ করে সমাজের সংস্কার সাধনের উপদেশ দিতে বিরত হন নি। মুষ্টিমেয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের অভ্যর্থনা সভায় তিনি তাদের জাতিগত দোষ "দলাদলি" ত্যাগ করে চলতে উপদেশ দেন। ফেরবার পথে লাহোরে দুই-তিন দিন অবস্থান করেন এবং সেখানেও বিশেষ বিশেষ সভায় বক্তৃতা দেন। ডক্টর ভাটনগর, ডক্টর সুরেন দাসগুপ্ত ও ডক্টর জ্ঞান রায়ের সেই সময়ের আন্তরিক সম্বর্ধনার কথাও ভুলবার নয়।

১৯৩৪ সালে শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে আচার্যদেব দিল্লীতে জি. ডি. বিড়লার বাড়ীতে পাঁচ ছ' দিন অবস্থান করেন। এ অবস্থান-প্রস্তাব ছিল, তাঁর নিজবুদ্ধি প্রণোদিত। কারণ তিনি জানতেন যে বিড়লা প্রভৃতি অবাঙ্গালীদের নিয়ে বাঙ্গালার শোষণরীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রবন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। তিনি বাঙ্গালীজাতিকে মাড়োয়ারী প্রভৃতি অবাঙ্গালীদের কর্মনিষ্ঠায় দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন, অবাঙ্গালীদের উপর কোন বিদ্বেষ প্রচার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এই সব কথা তিনি ঘনশ্যামদাস বিড়লাকে নানা ভাবে বুঝিয়ে দিতে সফলকাম হয়েছিলেন। এটা তাঁর বিশেষ দূরদৃষ্টির পরিচয় বলা যায়। এই ভুলবোঝাবুঝির দূর করবার ইচ্ছাই যে তাঁকে বিড়লাভবনে বাস করতে প্রলুব্ধ করেছিল, একথা তাঁর কাছেই শোনা। দিল্লীর প্রবাসী বাঙ্গালীদের আয়োজিত সম্বর্দ্ধনা-সভায় তিনি বাঙ্গালীদের জাতিগত দোষ বর্জন করতে উপদেশ দেন।

এই বৎসরে ইন্দোরে এক শিল্প-মেলার উদ্বোধনে গিয়ে ডাঃ প্রফুল্লকুমার বসুর অতিথিরূপে কয়েকদিন বাস করেন। এখানে বর্ণনীয় শেঠ স্বরূপচাঁদের সম্বর্দ্ধনা এবং হোলকার কলেজের বিশেষ অভিনন্দন সভা। সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সেখানে থেকে ৭০/৮০ মাইল দূরে অবস্থিত কালিদাসের উজ্জয়িনীর নয়নাভিরাম শোভা দর্শন করে তিনি পরমানন্দ লাভ করেন।

১৯৩৩ সালে মেদিনীপুরের জমিদার দেবেন্দ্রলাল খাঁর আহ্বানে তাঁর Gope Palace-এ তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন। অদূরস্থিত বহু পুরাতন মন্দিরে গান্ধীজি-প্রণোদিত হরিজনদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য তাঁকে পৌরোহিত্য করতে হয়- এঘটনাও অবিস্মরণীয়।

১৯৩৫ সালে ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে এক বিরাট শিক্ষা-সম্মেলন (The Great Wardha Educational Conference) হয়। ওয়ার্ধাযাত্রার পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে - ঐ ট্রেনেই ইন্টার ক্লাসে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সপরিষদ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য যাচ্ছিলেন। আচার্য রায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন। মধ্যপথের কোনও ষ্টেশনে ট্রেন কিছুক্ষণ থামা অবস্থায় আচার্য রায় ইন্টার ক্লাসে প্রবেশ করলেন এবং "where is Rajendra Prasad where is Rajendra Prasad" বলে তাঁর প্রিয় ছাত্র রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আলিঙ্গ

নাবদ্ধ করলেন। ওয়ার্ধায় শেঠ যমুনালাল বাজাজের অতিথিশালায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তিন-চার রাত্রি ওয়ার্ধায় কাটে; সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও ঐ অতিথিশালায় ছিলেন। একদিন দেখা গেল আচার্য রায় বালকসুলভ অভ্যাসে বল্লভভাই প্যাটেলের পিঠের উপর লাফিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলেন, সর্দারজীও বিশেষ আনন্দের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। ওয়ার্ধায় বিশেষ অধিবেশনের ছ' দিন আগে থেকে গান্ধীজী তাঁর চিরাচরিত মৌনব্রত অবলম্বন করেন। অধিবেশনের দিন সকালে পূর্ব ব্যবস্থামত মহাদেব দেশাই সহ গান্ধীজীর কুটিরে যাওয়া হয়। প্রথম সাক্ষাতেই মহাত্মাজী আচার্য রায়কে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গ ন করেন। তাঁকে দুই হাত দিয়ে উঠিয়ে ভূমিশূন্য করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দাড়ি ধরে সোল্লাসে নাড়া দিতে লাগলেন। কায়েতী ভাষায় লিখে তাঁহার কুশল জানতে চাইলেন। আচার্য রায় বললেন, "I have always drawn my inspiration from the semi-naked Fakir" (i.e., Gandhiji) গান্ধীজী বললেন, না-না, সে কি কথা, but what about your Maidan Club? That has been a source of inspiration always." স্থানান্তরে এই ময়দান ক্লাবের কথা বিস্তারিত ভাবে বলা যাবে।

১৯৩৬ সালে ঝাড়গ্রাম রাজার আমন্ত্রণে ঝাড়গ্রামের বেলেবেড়ায় গমন করেন, কোঅপারিটিভ সোসাইটির উদ্বোধনে; রাত্রে হাতীর পিঠে চেপে বহুবিস্তৃত জলপথ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়। রাস্তার ক্লেশ কিছুমাত্র তাঁকে নিরুৎসাহ বা নিরানন্দ করেনি। শিক্ষাব্রতী বৈজ্ঞানিক তিনি। কো-অপারেটিভ সোসাইটির উদ্বোধন উপলক্ষে তাঁর আগমনে কেউ কেউ সপ্রশ্ন বিস্ময় প্রকাশ করায় তিনি সহাস্যে উত্তর দেন - ''আমি হচ্ছি ব্যঞ্জন বর্গের বিসর্গবর্ণীয়: ক-এ বিসর্গ দাও কঃ, খ-এ বিসর্গ দাও খঃ, গ-এ বিসর্গ দাও গঃ। তেমনি আমি বৈজ্ঞানিকের দলে বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী-সমাজে ব্যবসায়ী, গ্রামসেবকদের সাথে গ্রামসেবী, অর্থনীতিবিদদের মহলে অর্থনীতিজ্ঞ।'' সমস্যার সহজ সমাধান। এ বাণীর পুনরুল্লেখ তিনি জীবনে বহু মঞ্চ থেকে করে গেছেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বরিশালস্থ অশ্বিনীকুমার দত্তের বিখ্যাত বিদ্যায়তনের সুবর্ণ জয়ন্তীর পৌরোহিত্য করা উপলক্ষে দত্ত মহাশয়ের বাটীতে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন। সে সময়ে বহু আনন্দকর ঘটনার প্রবাহ বরিশালের উপর দিয়ে বয়ে যায়। অবর্ণনীয় সে আনন্দপ্রবাহ।

আচার্যদেবকে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন কটন মিলের উদ্বোধনে পৌরোহিত্য করতে যেতে হয় নারায়ণগঞ্জে। সেখান থেকে ঢাকা কটন মিলের ১ নং ও ২ নং মিল পরিদর্শন করেন। চিত্তরঞ্জন কটন মিলের কর্ণধার ধীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। অতঃপর ঢাকায় ডক্টর জ্ঞান ঘোষের বাটীতে গিয়ে কয়েকদিন বাস করেন। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও ঢাকার এক বিরাট হলে বক্তৃতাদানকালে বহু বিষয়ের মধ্যে সিনেমা শিল্প যে দেশের সমাজ, ধর্ম

ও অর্থনীতির দিক দিয়ে কত বড় সর্বনাশকর তার এক বাস্তব চিত্র লোকসমক্ষে বর্ণনা করেন।

১৯৩৮ সালে প্রতি বৎসরের মত বাঙ্গালোরে যাওয়া হয় Institute of Science -এর সভায় যোগদান কল্লে। ডক্টর জ্ঞান ঘোষ সে বছর ডিরেক্টর হয়ে বাঙ্গালোরে গেছেন। পূর্বে তাঁর প্রিয় শিষ্য ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র গুহের বাড়ীতে অবস্থান করতেন। ডক্টর ঘোষ যাওয়ার পর ভাগাভাগি করে দুই শিষ্যের বাড়ীতে কাটাতেন, যে ক'দিন তিনি বাঙ্গালোরে থাকতেন। ১৯৩৮ সালে বাঙ্গালোর থেকে ফিরবার পথে এক ভীষণ বিভ্রাট। ভদ্রকের প্রবল বন্যায় রেলপথ জলমগ্ন। রেলে রায়পুর ঘুরে ১ দিন পরে যখন ভদ্রকে পৌঁছালেন তখন না-স্নান না-খাওয়া অবস্থা। চারিদিকে শুধু উত্তাল জলরাশির ব্যাপক চিত্র। লোকালয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। বেলা ১২টা বেজে গেছে, কি খাবেন তাই ভাবনার কথা হলো। সঙ্গে ছিলো কয়েক টুকরো রুটি ও কিছু পুরানো তেঁতুল। তাই খেয়েই নির্বিকার চিত্তে তখনকার মত কাটিয়ে দিলেন; এমনিই অদ্ভুত ছিল ঐ শীর্ণদেহ, ব্যাধিক্ষীণ, ঋষিতুল্য ব্যক্তির সহনশক্তি। অবশ্য জীবনের অগণ্য বিভিন্ন ব্যাপারে এইরূপ ঘটনায় তাঁর চরম চিত্তসংযমের পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন। এর আগে গাড়ীর জানালার চাপে আঙ্গুলটা একেবারে থেঁতলে যায়। সারা রাস্তা জলপটির সাহায্যে উপশমের ব্যবস্থা করা হয়, তাতেও তাঁর মুখের কোন বিকৃতি দেখা দেয়নি।

নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি চিরদিনই উপেক্ষা করে চলে গেছেন। বাৎসরিক খুলনা সফরের সময় দৌলতপুরে উপস্থিত হলেন ১৯৩৯ সালে। সেখানে খবর এলো কবি মানকুমারী বসু তাঁর ৬৪ বৎসরের কন্যার মৃত্যুতে বিশেষ শোকমগ্না হয়ে পড়েছেন। জামাই এবং বহু পুত্রপৌত্রাদিও ঐ কন্যার বিদ্যমান ছিল। কবি ভগ্নীর সঙ্গে আচার্যদেবের এক মধুর সম্পর্ক চিরদিন বর্তমান ছিল। খবর শোনার পর তাই তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ঐ বৃদ্ধ বয়সে অপটু দেহ নিয়েই চল্লেন কবি-ভগ্নী সন্নিধানে। কাব্য ও কবিতায় যিনি সারাজীবন দুঃখপীড়িত, শোকতপ্ত জনগণকে শুনিয়েছেন সান্ত্বনার বাণী, দিয়েছেন আশার আশ্বাস, বৃদ্ধবয়সে এই শোকে তিনি একেবারে মুষড়ে পড়েছেন দেখা গেল। আচার্যদেবকে দেখে একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন ও তাঁর কোলে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আচার্যদেব তাঁর মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে লাগলেন, শোকে অভিভূত না হয়ে ধৈর্য ধরার কথা বলতে লাগলেন বার বার। মানকুমারী বললেন- "বুঝি সবই, কিন্তু আমি সমস্ত বুঝেও যে নিজেকে সম্বরণ করতে পারছি না।" আচার্যদেব মৃদুহাস্যে আবার তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং কালক্রমে সফলও হলেন। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে শ্রীমধুসূদনের যে উক্তি আজ কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে, সেই Heart of a Bengali Mother -এর এমনিই অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায় এই জ্ঞানতপস্বীর মধ্যে।

১৯৩৬ সালে আচার্যদেব ময়মনসিংহ জেলার সুদূর করটিয়ায় তত্রত্য কলেজের অধ্যক্ষ মহম্মদ ইব্রাহিমের বিশেষ আমন্ত্রণে যান এবং সেখানে বোটের উপর কয়েক রাত্রি কাটান। কলেজের পক্ষ থেকে তাঁকে "জ্ঞানবারিধি-" ইত্যাদি প্রশস্তি প্রয়োগে সম্বর্ধিত করা হয়। এইরূপ আহ্বান তিনি প্রায়ই উপেক্ষা করতেন না পারতপক্ষে।

১৯৪০ সালে অখ্যাতনামা ও সাময়িকভাবে নিরুদ্দিষ্ট এক দেশকর্মীর প্রথমজাত পুত্রের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বাঙ্গলার এক নিভৃত পল্লীতে- তাঁর ভাষায় "Royal post of Sudpur"—যান।

১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দেই একবার আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর জ্ঞান ঘোষকে আচার্যদেবের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের মত মহাপ্রাণ ও ছাত্রবন্ধু বিরল। তিনি আরও বলেন, প্রতি মাসের প্রথম তিন-চার দিন অগণিত প্রার্থীর ভিড়-নিয়ন্ত্রণ করতে তাঁদের হিমশিম খেতে হয়েছে। কিন্তু এমনিই নীরব ছিল তাঁর দান যে তাঁর ডান হাতের দান বাঁ হাত জানতে পারতো না। এই মহৎ প্রাণসত্তার বলেই তিনি ছাত্রসমাজের চিত্ত জয় করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর রোগা হাতের সস্নেহ কিল-চড় বর্ষণ ছাত্রেরা অম্লান বদনে সহ্য করে নিজেদের যেন ধন্যই মনে করত। এসই সময়ে St. Xavier's -এর ছাত্রদের ধর্মঘট উপলক্ষে Allen Garden-এ (Park Street) ছাত্রসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি ছাত্রদের পক্ষ হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। পক্ষান্তরে এমনও ইঙ্গিত করেছিলেন - "দেখো তোমাদেরই মধ্যে কোন black sheep যেন না আবার উদয় হয়।"

মানুষকে চেনা যায় প্রতিদিনকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজের মধ্যে দিয়ে। বৃহৎ কোন ব্যাপারে বহুর সঙ্গে মিশে ভীরুও পরম সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারে। সেটা তার সত্য পরিচয় নয়। আচার্যদেবের জীবনের নানা ছোটখাট ঘটনা পর্যালোচনা করলেই, তাঁর বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কত কথাই মনে পাড়ে যায়।

১৯২৮ কি -১৯২৯ সালে বাগেরহাট কলেজ স্থাপিত হয়: অট্টালিকা নয়– ছেঁচার বেড়া – গোলপাতার ছাওয়া বিরাট ছাউনি। অনাবৃষ্টির সময় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বৃক্ষতলে পঠন-পাঠন, বৃষ্টি এলে ছাউনিতলে আশ্রয় গ্রহণ, এইভাবে হলো সূত্রপাত। তাঁর নামে ও প্রেরণায় বিশিষ্ট আদর্শ-চরিত্র শিক্ষাব্রতী কামাখ্যাচন্দ্র নাগ মহাশয় দৌলতপুর কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন বাগেরহাট, অধ্যক্ষরূপে। তাঁর মত ছাত্রদরদী আদর্শশিক্ষক এ-যুগে কেন তখনও ছিল বিরল। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে এবং গ্রামের টানে আচার্যদেব বছরে অন্ততঃ একবার করে বাগেরহাট যেতেন। সে কি দুর্দিন গেছে। অধ্যাপকদের নিয়মিত মাইনে নেই–ছাত্রদের দেওয়া যায় না ঠিক মত আশ্রয়। সকলে যেন আচার্যদেবের যাওয়ার

দিনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন। তিনি গেলে সবাই টাকা পাবেন কিছু কিছু এই ভাব। তিনি গিয়ে আরম্ভ করতেন তাঁর শিশুসুলভ অনাড়ম্বর, সরল, কৌতুক। টাকা হাতে নিয়ে দু'হাত মুঠ করে বলতেন, "বল, কোন হাতে টাকা – কোন হাত ফাঁকা, কোন হাতে নেবে"- তারপর হাঃ হাঃ করে হাসি। এক সময়ে ওখানকার বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁর ব্যক্তিগত মান মর্যাদার অজুহাতে কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ আচরণ করতে থাকেন। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এমনিতে কষ্টকর দিনগুলি তাতে অধিকতর কষ্টকর হয়ে উঠতে থাকে। আচার্যদেব শুনে তাঁকে ডেকে পাঠালেন আর স্বল্পকথায় বোঝালেন যে ব্যক্তিগত বিরূপতার জন্য একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করা শোভন নয় এবং অনুচিতও বটে। ভদ্রলোক "না-না আপনার দৌলতেই ত আমার লেখাপড়া-শেখা" ইত্যাদি বলে তখনকার মত চলে গেলেন এবং তারপর যতদিন ছিলেন বাগেরহাটে অর্থানুকুল্যের আর বিরতি ঘটেনি। শুকলাল নাগ নামে এক বিরাট ধনী ব্যবসায়ীর অর্থসাহায্যে এক সরোবর কাটান হয় বাগেরহাটে। তার নামকরণ হয় শুক-সরোবর। এই শুক-সরোবরের পাড়ে স্থানীয় গণ্যমান্য সবাই সমবেত হতেন; এবং আচার্যদেবকে কেন্দ্র করে অনাবিল হাস্য-পরিহাসে বা বিভিন্ন গ্রাম্য সমস্যার আলোচনায় সময়, অতিবাহিত হতো। বিখ্যাত কবিরাজ বঙ্গবন্ধু সেন মহাশয় ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুণী গায়ক এবং খোল-পাখোয়াজে ওস্তাদ। আচার্যদেব ছিলেন গানের বিশেষ করে যন্ত্র-সঙ্গীতের-ভক্ত। একদিন ঠিক হলো সন্ধ্যা সাতটায় সেন মহাশয় শুক-সরোবর তীরে তাঁর গানের আসর বসাবেন। সবাই উপস্থিত। কিন্তু কোথায় বা সেন মহাশয় আর কোথায় বা তাঁর গান। সাত, সোওয়া - সাত, সাড়ে সাত - আটটা বাজতে চলল। তখন অনুসন্ধান করে জানা গেল-খোলের চামড়া ইঁদুরে কেটে দেওয়ায় বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বিব্রত ভাবে অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন অন্য বাদ্যযন্ত্রের। অবশেষে অতি কষ্টে অন্য যন্ত্র সংগ্রহ করে সেদিনকার মত আসর জমান গেল।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁর ৭০-বৎসরপূর্ত্তি উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ হতে অভিনন্দন দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। টাউন হল ছিল তখনকার দিনে বড়গোছের সভা-সমিতির অধিবেশন-স্থল। জনসমাকীর্ণ টাউন হলে সভাপতিরূপে অভিনন্দন পাঠ করতে উঠে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় বললেন : "আমাদের উভয়ের কর্মধারা একই ভাবে প্রবাহিত। উপনিষদের 'একোহহং বহুস্যাম' এই অভিলাষ আচার্যদেব তাঁর জীবনে পূর্ণ করেছেন – বহু কর্মধারায় নিজেকে ব্যাপৃত করে। ছাত্রদের মধ্যে তাঁর গুহাহিত শক্তি বিকীরণ করেছেন তিনি।" রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ অভিনন্দনের উত্তরে বলতে উঠে আচার্যদেব বললেন, "উনি আমার মাস তিনেকের বড়। বরাবর আমাকে স্নেহ করতেন এই-ই জানতাম। এখন কেন যে আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা করছেন জানি না।" আবার বললেন, "এই রাজশেখরকে দিয়ে আমি কোন রকমে বেঙ্গল কেমিক্যাল চালাচ্ছি। কিন্তু উনি এমন ভাবে

পাঠরত আচার্যদেব (১৯৪১)

ওর মাথায় সাহিত্য ঢুকিয়ে দিয়েছেন, প্রশংসা করে ওকে এমন বাড়িয়ে দিয়েছেন— আর কি বেঙ্গল কেমিক্যাল-এ ও থাকতে চাইবে? সে-স্থান এখন তো ওর পক্ষে খুব ক্ষুদ্রই মনে হবে।" সবাই ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন : "ওঁর আগের লেখাগুলো বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। আজকালকার লেখাগুলো কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া। বুঝতে পারিনা ঠিক।" রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন- "আজকের লেখাটা বুঝতে পেরেছেন ত !" বিপুল হাস্যের মধ্যে এই ভাবে সেই মহতী সভার পরিসমাপ্তি হলো।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে Hindu Chemistry সম্বন্ধে আলোচনার জন্য মহতী বিজ্ঞান-সভার অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে আচার্যদেব গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন।

ফরিদপুর জেলার ওলপুরে প্রখ্যাত সমাজকর্মী চন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে এক বিরাট খালখনন শুরু হয় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। ঐ বিরাট খালখননের জন্য যে বিভিন্ন, বিপুল বাধা অতিক্রম করতে হয় এবং বহুজীবন বিপন্ন করেও যে শৃঙ্খলার সঙ্গে কর্মীদের কাজ করতে হয় তার স্মৃতি হয়ত এখনও স্থানীয় অধিবাসীদের স্মরণে আছে। ঐ খালখননের ফলে গ্রামের লোকদের প্রভূত উপকার হয়েছে। এই খনন-উৎসবে পৌরহিত্য করেন আচার্য রায়। তিনি যে কত বড় কর্মবীর ছিলেন, বাঙ্গালীর স্বভাবসুলভ ভাবোচ্ছ্বাসে বিহ্বল হয়ে "মূলে হা-ভাত" ঘটাতেন না, তার উদাহরণ পাওয়া যায় দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত "যশোহর-খুলনার ইতিহাস" প্রণয়নের সম্পূর্ণ ব্যয়-ভার বহন করায়। আচার্যদেবই সতীশবাবুকে উপদেশ দিয়ে কবি থেকে ঐতিহাসিকে পরিণত করেন, এবং ভাবপ্রবণতা হতে মুক্ত করে তাঁকে নূতন কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন। গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে কথা তিনি বইয়ের মুখবন্ধে স্বীকার করেছেন। শুধু যে প্রফুল্লচন্দ্র প্রায় তাঁর প্রতি প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বাঙ্গালীকে চাকরীর মায়া ত্যাগ করে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করতে উপদেশ দিয়ে গেছেন তাই-ই নয়; বহু ক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ ব্যবসায়ীকে অর্থসাহায্য ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি। কতলোক যে তাঁহার কাছে এ ভাবে উপকৃত, কতলোককে বিশ্বাস করে যে পরে তাঁকে ঠকতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। তবুও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্যবসায়ের নাম করে সাহায্যপ্রার্থী হলে কাউকে তিনি বিমুখ করেননি।

তাঁর দিনপঞ্জীর মোটামুটি আলোচনা করলেই দেখা যাবে ঐ ক্ষীণ, রোগজীর্ণ দেহের মধ্যেও কী অপরিসীম উদ্যম ও কর্মপ্রবণতা ছিল।

সহরের দিনপঞ্জী

৪-৩০ টায়	শয্যাত্যাগ, প্রাতঃকৃত্য, খালিপায়ে ভ্রমণ অন্তত: আধঘন্টা।
৫-৩০ টায়	পাঠরত।

৮-৩০ টায়	চরখা কাটা। ল্যাবরেটরী পরিদর্শন, উপদেশ প্রদান, চিঠিপত্র লেখা।
১১ টার পর	দর্শনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
১২-৩০ টা পর্যন্ত	স্নান, নিজহস্তে পরিধেয় পরিষ্কার, মধ্যাহ্ন-ভোজন।
২ টা পর্যন্ত	চোখ বেঁধে শয্যায় শয়ন, পাঠপর্যায়।
৩ টা—৪টায়	বৈকালিক জলযোগ, পাঠাভ্যাস, আলোচনা।.
৫ টার পর	বেঙ্গল কেমিক্যাল; সভা-সমিতিতে যোগদান।
সন্ধ্যায়	ময়দানে Roberts' Statue-এর নিকট সমবেত হওয়া। প্রায় আধঘন্টা জোর জোর পা ফেলে হাঁটা; আলাপ আলোচনা।
রাত্রে ৯-টায়	রাত্রের খাবার; নিদ্রা।

প্রতি বছর মাস তিনেকের জন্য তিনি পল্লী অঞ্চলে বিশেষ করে নিজ গ্রামাঞ্চলে অতিবাহিত করতেন। সে সময়কার দিনপঞ্জীও বিচিত্র।

ভোর ৪-৩০ হতে সকাল ৮টা পর্যন্ত—সহর বাসের অনুরূপ।

৮-৩০টায় নগ্নপদে স্বগ্রামবাসীর প্রতি গৃহে গৃহে গিয়ে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা।

দ্বি-প্রহরিক আহার– বিশ্রাম।

৫-টার পর বোটে ভ্রমণ, দাঁড়টানা। বোটেই গান-বাজনার আসর। গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা, তাদের অভাব-অভিযোগ শোনা এবং বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা-প্রয়াস।

সহরের দিনপঞ্জীতে প্রতি সন্ধ্যায় ময়দানে Roberts' Statue -এর নিকট সমবেত হবার উল্লেখ করেছি। এখানে এসে উপস্থিত হতেন, আচার্যদেবের সঙ্গে, জ্ঞানবৃদ্ধ Nestor, অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু প্রমুখ সুধীবৃন্দ। অন্ততঃ আধঘন্টা বেড়ানোর পর ঐ মূর্তির নীচে বসে সামাজিক, রাজনৈতিক নানাবিধ আলোচনা চলত বহুক্ষণ ধরে। কলকাতায় থাকলে গান্ধীজীও উপস্থিত হতেন এখানে। এই আসরকেই তিনি 'ময়দান ক্লাব' নামে অভিহিত করেছেন। ইংলণ্ডে এলিজাবেথ-এর আমলে বিভিন্ন Inn হতে যেমন সমাজ ও রাজনীতিবিষয়ক নানা চিন্তাধারার উৎপত্তি ও প্রসার লাভ ঘটেছিল- তেমনি ঘটেছিল এই সহরের বুকে ময়দান ক্লাবে। আচার্যদেব, গিরিশবাবু, চুণীবাবু, দেববাবু প্রভৃতি যথারীতি বসে বসে আলোচনা করতেন। দুটি ১৩-১৪ বছর বয়স্ক তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ছোকরা বিড়ি টান্‌তে টান্‌তে চলেছে সামনে দিয়ে। চুণীবাবু এবং দেববাবু, বিশেষ করে চুণীবাবু (ইনি একজন জৈন) তাদের দেখে ধমকাতে লাগলেন। তারাও থেকে থেকে দিচ্ছে উত্তর। হঠাৎ কে একজন বললেন– "জানিস্, P. C. Ray- এখানে বসে আছেন।" এমনি অদ্ভুত ছিল তাঁর নামের প্রভাব যে একথা শুনেই তারা লজ্জায় বিড়ি ফেলে দিয়ে আচার্যদেবের পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা চাইতে লাগল। বিড়ি হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের পক্ষে

যে কতখানি ক্ষতিকর আচার্যদেব তাদের দু-চার কথায় বলে ছেড়ে দিলেন।

দিনপঞ্জীতে তাঁর বিভিন্ন সময়ে পাঠ্যাভ্যাসের উল্লেখ আছে। পাঠ্যবিষয়ে তিনি ছিলেন প্রায় সর্বভুক্ ; বিশেষ করে ইতিহাস—সর্বদেশীয় ইতিহাস, জীবনী, গভীর তত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তকাদি। কাব্যে— সেক্সপীয়র, মিল্টন, গোল্ডস্মিথ, রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদন, প্রবন্ধে— এমারসন, কার্লাইল এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ছিল তাঁর প্রিয় গ্রন্থরাজির মধ্যে।

অত্যন্ত শ্রমশীল ছাত্রের মত তিনি গভীর বিষয়ের পুস্তকাদি ৫-৬ বার করে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়তেন; আর সাদা কাগজের খাতা নিজে হাতে তৈরী করে, মলাট দিয়ে তাতে সারাংশ লিখে রাখতেন সঙ্গে সঙ্গে। পরে আবার তা' হ'তে অন্য খাতায় পরিষ্কার করে লিখে রাখতেন।

আচার্য রায় যে বিশেষ করে ছাত্রদের কত বড় দরদী ছিলেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রধানাচার্য হিসাবে তিনি উপরের একটি হলের একাংশে অতি সাধারণভাবে দিন যাপন করতেন। আমরণ এক সাধারণ খাটিয়ায় বিশ্রাম ও শয়ন করতেন। ৮-১০ জন ছাত্র তাঁর আশ্রমে আহার না করলে তাঁর শান্তি হতো না। ১৯৪২ অর্থাৎ ৮২ বৎসর পর্যন্ত তিনি নিজের কাপড়-জামা নিজ হস্তেই কেচেছেন, এবং নিজের বাসন নিজেই মেজেছেন। ছাত্র ও আগতদের সঞ্চিত মুড়ি ও সিরাপ ইত্যাদি নিজ হাতে প্লেটে করে না দিয়ে ছাড়তেন না। সঙ্গে সঙ্গে কিল, চড় মেরেও তাদের অভিভূত করতেন। এ প্রেমের তুলনা নেই। এ স্বাবলম্বনের তুলনীয় চরিত্র বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না। আচার্য বলতে যাঁর আচরণের দ্বারা সকলে অনুপ্রাণিত হবে- বিশেষ করে ছাত্র-সম্প্রদায়—বচনে নয়, কার্যের দ্বারাই; এ-সত্য বর্ণে বর্ণে তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে গেছেন। সম্ভব হলে ছাত্রদের তিনি সঙ্গে নিয়ে থাকতেন, তাদের নিয়ে তিনি বেড়াতে যেতেন ময়দানে, এখানে, ওখানে। যখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক ছিলেন, প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ক্লাশ নেওয়া তার চিররীতি ছিল। কারণ—তারা তখন tender-aged —তাঁর কথা তাদের মধ্যে দিয়ে কাজ করবে। তাঁর অধ্যাপনা করার ভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির— subjective চেয়ে objective ছিল আসল কথা। একটা উদাহরণ দিলে এর অর্থ বোঝা সহজ হবে। ১৯১৫ সালে পণপ্রথার নির্মম তাড়নে পিতাকে বাঁচাবার জন্য স্নেহলতা আত্মহত্যা করে। আচার্য রায় সেই সময় থেকে বিশেষ করে ক্লাসে প্রত্যেক ছাত্রকে- "Each and every one of you is a potential murderer of Snehalata (স্নেহলতা)"— এই বলেই তাদের ধাক্কা দিয়ে কিল ঘুঁষি মেরে সজাগ করে দিতেন। আবার Potassium Permanganate পড়াতে গিয়ে— "you" সোনার চাঁদ- - "a small particle of this on your face and you lose Rs. 5000 -" এ কথা বার বার বলে তাদের চোখ খুলে দেবার চেষ্টা করতেন। এ-রকম কত কথাই বা উল্লেখ

করা সম্ভব এই প্রবন্ধে ? তাঁর এক বিশিষ্ট ছাত্রশিষ্য যাঁর বয়স ৭০ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে তাঁর কথা উঠলে বলেন, "তাঁর মত অধ্যাপক খুবই বিরল। এ-রকম মর্মস্পর্শীবাণী আর কারও মুখ থেকে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রাবস্থায় পান নি।"

১৮৮৫ সালে বিলাতে পাঠ্যাবস্থায় এক বিশেষ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায়--India before and after the Mutiny- যা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলেন, তা পড়লে তাঁর ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন, জার্ম্মান প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় আয়ত্তের কথা — সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও জ্ঞানের গভীরতার কথা পরিস্ফুট হয়ে আসে। প্রবন্ধের বিচারে তাঁর প্রথম হওয়াই উচিত ছিল, দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হলো তাঁকে। এতে একটা সঙ্কটের উৎপত্তি হলো। রাজদপ্তরে বিপ্লবী হিসাবে– "staunch revolutionary but in the garb of a scientist" তাঁর নাম খোদিত হয়ে গেল; এবং চিরদিনই সেইখ্যাতি নিয়েই গিয়েছেন তিনি। "His name was always in the black book."

১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর কবিগুরু তাঁর সরকারী খেতাব knighthood ত্যাগ করলেন; কিন্তু আচার্য রায় তা করলেন না– এটা যে তাঁর বৈজ্ঞানিক সুদূরদৃষ্টির বিশেষ পরিচায়ক, তা উত্তরকালে নানারূপে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, দেখা যায় তিনি ঐ প্রচ্ছন্নভাবেই দিনের পর দিন কত বিপ্লবীকে কত ভাবে সাহায্য করে গেছেন ও আশ্রয় দিয়েছেন। এই সবের বিবরণ সবিস্তারে লিখতে যাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

১৯২১ সালে আচার্য রায় যখন বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন-বিভাগের কর্ণধার, সেই সময় বারাণসীতে Hindu college সৃষ্টি করে আচার্য রায়কে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান নিয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য Science College-এ আচার্য রায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আচার্য রায় যে-ভাবে মালব্যজীকে অভ্যর্থনা করেছিলেন ও যে-ভাবে তাঁর মর্মকথা ব্যক্ত করেছিলেন তা চিরদিন স্মরণে থাকবার মত বাণী–"That Bengal is very much in need of poor Dr. P. C. Ray and Pandit Madan Mohan Malaviya has all the qualities of Sir Asutosh Mukerjee minus his genius" কটা লোক আজ পর্যন্ত সৎসাহস নিয়ে ও সামনাসামনি এরকম স্পষ্টোক্তি করেছেন তা ভাববার বিষয়। তাঁর রসিকতার ভঙ্গীও ছিল অদ্ভুত রকমের। অতি সহজ সরল ভাষায় তিনি তাঁর ভাব ব্যক্ত করতেন। এক সময়ে তিনি বাঙ্গালোরের অদূরে কোলার জেলার স্বর্ণখনি দেখতে যান। সেখানে সোনা গালিয়ে ইটের আকারে তৈরী করে রাখা হয়। এরূপ এক-একটি ইটের ওজন প্রায় ত্রিশ সের। খনির উর্দ্ধতন কর্তা তাঁকে বিরাটভাবে অভিনন্দিত করেন ও বলেন ঐরূপ একটি ইট আচার্য রায় বহন করে নিয়ে যেতে পারলে উহা তাঁরই সম্পত্তি মনে করতে পারেন। অবশ্য সহাস্য মুখে আচার্য রায় উত্তর দেন– "আমার নিজের ওজনই

ত্রিশ সেরের কম, তা আমি ঐটা নিয়ে যাই কি করে?"

Shakespeare, Milton, Shelly, Byron, Carlyle, Emerson প্রভৃতির লেখা তিনি একেবারে মুখস্থ করে ফেলেছিলেন বলা যেতে পারে। Addison -এর Spectator -এ "Vision of Miranda" তাঁর শেষ জীবনের দিকে তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করত ও বার বার তিনি ওটা পড়তে বলতেন। দিনের সময় ভাগ করে তিনি হাল ও গভীর প্রকৃতির সাহিত্য পাঠ করতেন বা শুনতেন। শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্য দিয়েও তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করতেন।

পল্লীর জনগণকে নানাভাবে জাগরিত করার ইচ্ছা তাঁর জীবনের একান্ত ব্রত ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে বছর বছর নিজ গ্রামে ও খুলনা জেলার সাঁইহাটী, দুলদুলে, বুধহাটা, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি সুদূর গ্রামে গিয়ে– এপ্রিলের শেষ থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত কালবৈশাখীর নানারূপ ঝঞ্ঝা ভোগ করেও দেশবাসীকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করতে কখনও পরাঙ্মুখ হন নি। পারিতোষিক বিতরণ ছিল একটা গৌণ উপলক্ষ মাত্র। অনেক প্রতিষ্ঠানই তাঁর নাম বহন করে সংস্থাপিত ছিল। আচার্য রায় কৌতুক করে বলতেন–"আমার অবস্থা, কুলীন বামুনের মত খাতা দেখে শ্বশুরবাড়ী যেতে হয়।"

তিনি সত্যসন্ধ ছিলেন, কোনও গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না। এ সম্পর্কে একটা ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২৮ সালের এক সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে তাঁর ঘোড়ার গাড়ীতে কলেজ স্ট্রীট্ ও মেডিকেল কলেজ পার হয়ে শিবমন্দিরের কাছে এলে আমাকে সংস্কার-বশে হাত উঁচু করে নমস্কার করতে দেখে তিনি বলে উঠলেন, ও কি করছো–ভগবান কি ঐ মন্দিরে আছেন আর আমার এই গাড়ীর মধ্যে নেই– তিনি তো শক্তিরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান।"

জীবনের শেষাংশে যখন তাঁর নৌকা কপোতাক্ষী বেয়ে তাঁর স্কুলবাড়ীর কাছাকাছি এসে যেতো, তাঁকে তখন এ-খবর শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে বোটের ছাতের উপর না উঠে তিনি ছাড়তেন না। আর "নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়" এই কথা বোটে শুয়ে বিশেষ করে বাড়ীর সান্নিধ্যে আসার কালে উচ্চারণ করতেন। নিজ গ্রাম ও জন্মভূমির প্রতি এত গভীর আসক্তি কোনও লোকচরিত্রে বিরল বলা যায়।

১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্গালোরে ডক্টর জ্ঞান ঘোষকে জিজ্ঞাসা করা হয়–বিপ্লবীদের খাতায় বড় বড় হরফে নাম লেখা সত্ত্বেও কি করে গভর্ণমেন্ট তাঁকে Knighthood খেতাব দিলেন? উত্তরে তিনি বললেন : "নানাদিকে তাঁর খ্যাতি–বিশেষ করে Hindu Chemistry রচনার পর এত প্রবল হলো যাতে গবর্ণমেন্ট তাঁকে খেতাব না দিয়ে পারলেন না।" ঐ সময়ে তাঁর একটি প্রশ্নের উত্তরে আচার্য রায়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ডক্টর ঘোষ বলেছিলেন : "আচার্য

রায়ের মত অত বড় বিরাট প্রাণ ও ছাত্রবন্ধু সংসারে বিরল– উহাই তাঁর বিশেষত্ব।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের কিছু কিছু ঘটনাবলী উদঘাটিত করা গেল। আসল কথা, এই জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ করে রচনাসম্ভারপূর্ণ বৃহৎ স্মারক গ্রন্থেরও সৃষ্টি হতে যাচ্ছে- সবই আচার্যদেবের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে। এই সঙ্গে বিশেষ করে নিবেদন– প্রকৃত তর্পণ-এর দ্বারা হবে না। ছোট ছোট পাঠচক্র সৃষ্টি করে–অল্পবয়স্ক (১৬ বৎসরের কম) ছেলেদের মধ্যে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা-প্রবাহ জাগাতে পারলে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাঁরই অনুস্মৃতিতে কাজ করার ব্যবস্থা করতে পারলে, তবেই তাঁর প্রকৃত স্মৃতিতর্পণ করা হবে।

জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, শারীরিক ক্লেশ, জরা-বার্ধক্য ইত্যাদি সমস্ত উপেক্ষা করে তিনি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের উন্নতিকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর নশ্বর দেহ ১৭ বৎসর হলো পরিত্যক্ত হয়েছে তার আগে– ১ বৎসর ধরলে ১৮ বৎসর আগেও, তাঁকে সক্রিয় হিসাবে আমরা দেখেছি। এর মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে,– হিন্দুস্থান পাকিস্থানের সৃষ্টি হয়ে নানাদিক দিয়ে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবনে, নানা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ইংলণ্ডের অতি সঙ্কট মুহূর্তে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth) কবি মিল্টন (Milton) কে স্মরণ করে আকুল আহ্বান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, Oh Milton. Thou shouldst Living at this hour England hath need of Thee আমরাও সমভাবে আচার্যদেবকে বাঙ্গলার দুঃসময়ে বাঙ্গালীদের রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানাই।

TRIBUTE TO ACHARYADEV

Sarbapally Radhakrishnan

I had known Acharya Prafulla Chandra Ray for many years He was not only a great chemist but one who contributed to the developement of chemical industries in the country, including the pharmaceutical He was a pioneer in this field He gave an impetus to the study of chemistry and its applications

He was an eminent patriort and an excellent Acharya who took personal interest in the careers of his pupils. It is essential that we commemorate his services in a suitable manner

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ (খুলনা সম্মিলনী), ১৯৬১

আচার্য-স্মৃতি

মেঘনাদ সাহা

বিগত মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে ছাত্র, অধ্যাপক, চাকুরীজীবী, প্রবাসী সকলের মধ্যে বিলাত যাত্রার ধূম পড়ে যায়। বোম্বাই-এর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী 'বালচাঁদ-হীরাচাঁদ -প্রতিষ্ঠিত' 'সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী' ভারতীয় শিপিং কনসার্নগুলির অগ্রণীদের মধ্যে অন্যতম। ঐ কোম্পানী যাত্রীদের য়ুরোপে নিয়ে যাবার জন্য 'লয়েলটি' নামক একটি জাহাজের বন্দোবস্ত করে। স্যার পি. সি. রায় সেই জাহাজে চতুর্থবার বিলাত যাত্রা করেন। যাত্রীরা অধিকাংশই ভারতবাসী। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিও সেই জাহাজের যাত্রী ছিলেন— যথা, বোম্বাইয়ের ডক্টর জীবরাজ মেহতা, লক্ষ্ণৌর অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, নৃতত্ত্ববিদা বিরজাশঙ্কর গুহ। আমিও সেই জাহাজের যাত্রী ছিলুম। বেশীর ভাগ যাত্রীই বাঙ্গলা, পাঞ্জাব ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র, বিলাতে শিক্ষা লাভ করতে চলেছে। কয়েকজন বড় সিভিলিয়ানও ভাল জাহাজে স্থানলাভ না করতে পেরে এই জাহাজের যাত্রী হয়েছেন। আমরা প্রায় এডেনের কাছাকাছি পৌঁছেছি, সেই সময় কথা উঠল- 'এই স্বদেশী প্রচেষ্টাটি কোন কাজেরই হয়নি। খাবার খারাপ, ঘরগুলি নোংরা, যাত্রীদের তত্ত্বাবধানও তেমন হয় না।' রোজই এই ধরনের কথাবার্তা হয়। একদিন স্যার পি.সি. রায় জাহাজের ডেকে আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করছেন, এমন সময় কতিপয় পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ছাত্র তাঁর কাছ একটা দরখাস্ত নিয়ে হাজির - দস্তখত করে দিতে হবে। তিনি দরখাস্তটি একবার দুবার তিন বার পড়লেন। তারপর ছেলেদের জিগ্যেস করলেন তাঁরা পূর্বে কখনও য়ুরোপ গেছে কিনা। ছাত্রেরা উত্তর দিলে 'না'। তখন তিনি তাদের প্রশ্ন করলেন, 'তবে তোমরা কি করে জানলে যে বিলাতী অথবা য়ুরোপীয় জাহাজের তুলনায় এই জাহাজের বন্দোবস্ত খারাপ?' তারা বল্লে, 'ইংরাজ যাত্রীরা বলছিল।' তারা সহযাত্রী একজন ইংরেজ সিভিলিয়ানের নামও করলে। স্যার পি.সি. রায় বল্লেন, 'মাই ইয়ং ফ্রেন্ডস, এই নিয়ে আমি চতুর্থবার য়ুরোপ চলেছি। এর আগে 'পি অ্যান্ড ও' এবং অন্যান্য য়ুরোপীয় জাহাজেও গেছি। আমি বলছি যে, এ জাহাজের খাবার এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত কোন বৃটিশ অথবা য়ুরোপীয় জাহাজের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়।' ছাত্রদের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর অনেক আলোচনা হল। অবশেষে তারা স্বীকার করলে, একজন য়ুরোপীয় যাত্রীর প্ররোচনায় তারা এই দরখাস্ত করছে। তখন স্যার পি.সি. রায় তাদের জিগ্যেস করলেন, 'এই দরখাস্ত নিয়ে আমি কি করব? ছিঁড়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিই, কি বল?' এই প্রস্তাবে ছাত্রেরা সকলেই রাজী হল। তিনি তখন সেটি ছিঁড়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানের লোকের ধারণা, স্যার পি.সি. রায় কেবল বাঙ্গলা দেশকেই ভালবাসতেন। এই ঘটনা

থেকেই বোঝা যায় যে, তাঁর দেশভক্তি শুধু বাঙ্গলা দেশে সীমাবদ্ধ ছিল না। যে কোন স্বদেশী প্রচেষ্টা— বাঙ্গলা অথবা বোম্বাই যেখানেই হোক না কেন, তাঁর কাছে সমান প্রিয় ছিল।

স্যার পি.সি. রায় একবার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু রসায়ন সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আহরণ করে তিনি দুই খন্ডে তাঁর সুবৃহৎ 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ তাঁর রসায়ন শাস্ত্রে ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সুগভীর পান্ডিত্যের পরিচায়ক। বহু পরিশ্রমে তিনি বিজ্ঞানক্ষেত্রে ভারতের দান— যা প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই পুনরুদ্ধার করে জগতের সামনে প্রকাশ করেন। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বক্তৃতা সভায় স্থানীয় কলেজের একজন অল্পবয়স্ক ইংরাজ অধ্যাপকও ছিলেন। তিনি তখন সবে ভারতবর্ষে এসেছেন। এখানকার সভ্যতায় বা হালচালে বিশেষ আকৃষ্ট হননি। স্যার পি.সি. রায় প্রাচীন হিন্দুদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও সেই যুগের স্মৃতি যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ছবি এঁকে ব্যাখ্যা করছিলেন। কতকগুলি মাটির ভাণ্ডের ছবি, যাহার নীচে জ্বাল দিয়ে উর্দ্ধপাতন প্রক্রিয়া দ্বারা (Sublimation) মকরধ্বজ ইত্যাদি তৈয়ারী করা হয়। ইংরাজ যুবকটি তাচ্ছিল্যভরে নাক সিঁটকাচ্ছিলেন এবং হাসি সম্বরণ করতে পারছিলেন না। আচার্যদেব তা লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। যন্ত্রপাতির ব্যাখ্যা শেষ করে হাতে এক ডেলা মকরধ্বজ নিলেন। মকরধ্বজ হল রিসাব্লাইমড মার্কিউরিক সালফাইড। কবিরাজরা এখনও সেই প্রাচীন নিয়মে মকরধ্বজ প্রস্তুত করেন। অনেক য়ুরোপীয় চিকিৎসকেরাও তা ব্যবহার করে থাকেন। বাঙ্গলা সরকারের সার্জেন জেনারেল স্যার পার্দি লুকিস অনেক সময় তাঁর রোগীদের উত্তেজক ঔষধ হিসাবে মকরধ্বজ খেতে দিতেন। মকরধ্বজের ডেলা হাতে নিয়ে তিনি বললেন - 'বন্ধুগণ, আজ হতে দু'হাজার বছর পূর্বে সেকেলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতবাসীরা এই অপূর্ব ঔষধ প্রস্তুত করে মানবের কল্যাণার্থ ব্যবহার করেছেন, রোগে শান্তি দিয়েছেন- এখনকার উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যেও এর চেয়ে বিশুদ্ধ Resublimed mercuric sulphide তৈয়ারী হয়নি। হিন্দুরা সামান্য মাটির ভান্ডে এরূপ বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারী করেছিলেন কোন্ সময়ে— প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে, যখন আমার ঐ বন্ধুটির (ইংরাজ যুবকটিকে দেখিয়ে) পূর্বপুরুষেরা পশুচর্মে লজ্জা নিবারণ করতেন এবং বন্য ফল খেয়ে জীবনধারণ করতেন।' এই কথা বলা মাত্র ভারতীয় শ্রোতারা করতালি দিয়ে উঠল। তরুণ ইংরেজ অধ্যাপক যুবকটি লজ্জায় লাল হয়ে সবেগে ঘর থেকে ছুটে পালালেন। পরে তিনিই স্যার পি. সি. রায়ের বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন।

স্যার পি. সি. রায়ের এই বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মহৎ জীবন অনেককেই আশ্চর্য করে দেয়। তাঁরা ভাবেন কি করে এই জীবন সম্ভব হল। তিনি তো চিরকালই রুগ্ন। বাল্যাবধি পেটের

অসুখে ভুগতেন। আমি স্যার পি সি রায়ের মতন নিয়মানুবর্তিতা খুব কম লোকেরই দেখেছি। তিনি চিরকুমার ছিলেন বলেই আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। প্রতিদিন তাঁর কাছে যাঁরা থাকতেন তাঁদের পূর্বেই শয্যাত্যাগ করে সায়েন্স কলেজের বারান্দাতে পায়চারী করতেন। তারপর বেলা ৭টা হতে ৯টা পর্যন্ত পড়াশুনা। সে সময় তাঁকে বিরক্ত করবার সাহস কারও ছিল না। তার পর লেবরেটরীতে গিয়ে বেলা বারটা পর্যন্ত কাজ। তারপর মধ্যাহ্ন ভোজন ও একটু বিশ্রাম। তার পরেই আবার লেবরেটরীতে এসে গবেষণা, চিঠি পত্রের জবাব দেওয়া ইত্যাদি। চারটে নাগাদ বাইরের কাজের জন্য প্রস্তুত। সন্ধ্যার সময় একটু ময়দানে ভ্রমণ, বাছা বাছা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প। বন্ধুরা নানা শ্রেণীর, নানা বয়সের- – কারও বয়স ১৫, আবার কারও বয়স ৮০। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর যে এই বিরাট দান আমার মনে হয়, নিয়ম পালনের নিষ্ঠাই তার প্রধান কারণ। তিনি বোম্বাই অথবা বাঙ্গালোরের মত দূর দেশে যাবার আগে পথে কতবার খাবেন, কি কি খাবেন, সব হিসেব করে গুছিয়ে নিয়ে তবে যাত্রা করতেন। অনেক সময় ছাত্রদের সব চিঠি লিখতেন। ইঙ্গিত থাকতো কিছু সঙ্গে করে এনো। তাঁরা সানন্দে তিনি যা খেতে ভালবাসতেন নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হতেন।

স্যার পি.সি. রায় আমাদের বলতেন যে, অধ্যাপক বার্থিলোর অনুরোধে তিনি 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনা করতে তাঁকে প্রায় আট - নয় বছর টানা পরিশ্রম করতে হয়েছিল। একজন পন্ডিতকে (হরিশচন্দ্র কবিরত্ন) দিয়ে সংস্কৃত পান্ডুলিপিগুলির মানে করাতেন, তারপর প্রাচীন প্রস্তুত-প্রণালীর সঙ্গে আধুনিক প্রণালী মিলিয়ে দেখতেন। ন'বছর ধরে এই অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়। তাঁর বন্ধু এবং চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার তখন তাঁকে বাঁধা-ধরা নিয়মে থাকতে উপদেশ দেন এবং আরো বলেন যে, তাঁহার একটু Relaxation দরকার। অর্থাৎ বিকালে দিনের কাজের পর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে লঘু আলোচনা চলতি কথায় যাকে আড্ডা দেওয়া বলে তাই করা উচিত। এর পরেই তিনি নিয়ম মত সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে যেতেন এবং সেখানে দুঘন্টা করে সময় কাটাতেন। রাত্রি ঠিক ন-টায় তিনি মাঠ থেকে ফিরতেন। আমরা এই সন্ধ্যাকালীন বৈঠককে 'বেতালের বৈঠক' বলতাম। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৫ বৎসর তিনি এই নিয়ম অব্যাহত রেখেছিলেন। কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক গিরীশ চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু ইত্যাদি এই বৈঠকে যোগদান করতেন। আমার মনে হয়, স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন আধুনিক যুবকরা এই সব দৃষ্টান্ত থেকে ভোরে ওঠার ও নিয়মানুবর্তিতার উপকারিতা বুঝতে পারবেন। তিনি প্রায়ই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বিখ্যাত উক্তি 'Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise' উদ্ধৃত করতেন। এই উক্তিটি তিনি তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

মাসিক বসুমতী: আষাঢ়: ১৩৫১

OUR MASTER

Rajendra Prasad

Acharya P. C. Ray's name has been held in loving remembrance by his countrymen Not only was he a pioneer of chemical education, research and chemical industries in the country, but he was also something more. The interest which his name arouses is much wider and his title to recognition is much greater He practically spent himself for the social, intellectual, cultural and economic regeneration of India, struggling for a place among the free nations of the world. His sincere patriotism, his life of ascetic self-denial, his unbounded sympathy for the poor, his unfailing solicitude for the welfare of students, and his ready accessibility won him love, reverence and admiration of all

Acharya Ray revived and handed on the flame---which once burnt so brightly in India, and he has left behind an example of service and sacrifice for his countrymen to follow for the fulfilment and enrichment of their life

I had the privilege of being his pupil, while studying in the Presidency College, Calcutta, and it will be no exaggeration to state that many of us were infused by the spirit of our Master and even inspired by his ideal and example to dedicate ourselves to the service of our mother country I also came in contact with him occasionally in later years in course of our national work It gives me great pleasure to associate myself with the University of Calcutta in celebrating his birth centenary of which the publication of this Souvenir Volume forms only a part

I hope, the volume, depicting the biography and activities of this great son of India, will serve to spread the message of his life far and wide, in India and abroad

Acharya Prafulla Chandra Ray: Birth Centenary Souvenir Vol. (C.U.) 1962

Father Of Scientific Research

"India has really lost the Father of Scientific Research"

DR. MEGHNAD SAHA

REMINISCENCES

Dr. N. R. DHAR

I had the good fortune of meeting our Guru, Acharya Prafulla Chandra Ray, for the first time in 1907 in the Ripon College, now known as Surendra Nath College Acharya Ray and Chandra Bhusan Bhaduri visited this college for equipping it for the newly started I Sc course, which I had joined. When I was admitted to the B Sc Honours course, in chemistry in the Presidency college in 1909, I came in daily contact with this great man, an eminent teacher and scholar In July 1912, he invited me to be his guest on the top floor of the office of the Bengal Chemical and Pharmaceutical works at 91, Upper Circular Road, Calcutta and I stayed with him for three years before proceeding to Europe in 1915 Thus I came to know him intimately and entered into his thoughts and ideas and learnt to admire and respect the noble and sterling qualities of his head and heart. I was deeply impressed by his great patriotism, his interest for suffering humanity, his love for the student community, and by his great wisdom and erudition He frequently used to say that it was of little good to dip one's electrodes in the conductivity cell when the country was in bondage and suffering from semi-starvation

He was a great believer in the Indian tradition of plain living and high thinking and practised it to the fullest extent. During the period of his Government service in the Presidency College (1889-1915) first as a junior professor of chemistry and later on as the Professor and Head of the Department, he drew a salary ranging from Rs 250/- up to 800/- per month but his college dress consisted of cotton suits prepared from material worth, annas four per yard. In the mornings and evenings, he used cheap cotton dhooties, often torn Frequently in the Red Road Maidan Club of which he was a regular member along with Kaviraj Nagendra Nath Sen of "Kesharanjan" hair oil fame, Principal G C Bose of Bangabasi College, Satyananda Bose, a well-known follower of Surendra Nath Banerjee and a life-long friend of Acharya Ray and his pupils, he took pleasure in showing the torn condition of his shirt and dhooti. While in service at the Presidency College, he used to go to the

college in a hackney carriage and pay annas four per trip He told me on many occasions that in his holiday trips to North India along with Sir Nilratan Sarkar (to whom Acharya Ray was greatly attached), Dr P. K Acharya, Krishna kumar Mitra and others, the railway waiting-room bearers would not believe that he was a second class passenger, because of his shabby dress. In the evenings before dinner when we talked on different topics he frequently expressed a supreme contempt for the glamour and glory of the western civilization, although he admired its many good points, viz, honesty in daily life, equalty of opportunity for the rich and the poor, civic sense, law-abiding ways, spirit of helpfulness, punctuality, pursuit of science, etc He studied in the University of Edinburgh for over four years (1883-1887) and later on visited Europe four times for attending the Empire University Congress and picking up new trends in the progress of Chemistry in 1901, 1912, 1919 and 1926 but he never put on the proper European costume Other great Indians like Sir J C. Bose and Gopal Krishna Gokhale, who were Acharya Ray's close friends, followed the doctrine 'whilst in Rome, be a Roman' and mostly used the European dress when in Europe In 1912, Gokhale was in Calcutta as a member of the Islington Commission for Indian reforms and visited the chemistry laboratory of the Presidency College to have his urine tested for glucose by the pupils of Acharya Ray as Gokhale suffered from diabetes Acharya Ray used to mention that Gokhale always acknowledged the debt of his "Servants of India Society" to Bengal for financial help and stated that "what Bengal thinks today, India will think tomorrow."

For many years Acharya Ray contributed Rs 400/- per month for helping the needy students of the Calcutta colleges and paid liberally to the Sadharan Brahmo Samaj and to Brahmo Girls' School which was under the supervision of his friend Lady Abala Bose Whenever any good cause lacked money, people approached Lady Bose and she secured substantial help from Acharya Ray Moreover, at his initiative and expense the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works used to supply equipment and fittings to many of the colleges introducing science teaching. I greatefully acknowledge his help of £40/- (Rs 500/-) When I proceeded to Europe for research work as a state scholar in 1915 H. K. Sen afterwards Professor of Applied Chemistry, Calcutta University, used to receive Rs 40/- per

month from the Acharya for a few years during his student days Later on, as long as Acharya Ray was the Palit Professor, of Chemistry in the University, he did not touch the emoluments of the Chair but lived on his pension of Rs. 400/- per month He gave away a considerable portion of his professonal salary to the Indian Chemical society and to the University of Calcutta for awarding the "Nagarjuna Prize" for chemical research and for creating some research fellowships and prizes in science

Although of charitable and philanthropic disposition of mind, he was however eminently practical and founded the well-known chemical concern, the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, with its branches all over the country. In 1912, on his return from the European tour after having obtained the Honorary D Sc. degree from the University of Durham, the staff and students of the Presidency College gave him an ovation over which H. R. James the then Principal, presided and spoke with great fervour about Acharya Ray's qualities and ability to start a great industry where businessmen had failed. Mr. James, who had a great respect for Acharya Ray, made him the only professor-member of the Governing Body of the Presidency College

He was extremely attached to his pupils and liked to be surrounded by them. Prof P. Ray, Dr H.K. Sen, B B Dey, R C.Ray, M N Saha, J C. Ghosh, J N. Mukherji. P.B Sarkar, S.S Bhatnagar, P C Guha, B C Guha, J N. Ray, P K.Bose and many other like myself were inspired by him Acharya Ray had a great love for chemistry and possessed excellent skill in chemical experiments and manipulations, and his lectures with experimental demonstrations showed his grasp of principles and clearness of ideas. He took great pains and often corrected the lecture notes taken down by his pupils. I greatfully remember the long period he spent with me in the laboratory and discussed the results when I was making the experiments on conductivity measurements of simple and complex nitrite solutions utilizing the electrical conductivity of water Before he proceeded to Europe for the third time in 1912, we carried on experiments by the Hoffman method on the vapour density determination of the extremely unstable substance ammonium nitrite, in vacuum. The material readily breaks up into nitrogen gas and water at the ordinary temperature with evolution of heat (NH_4NO_2

$= N_2 + 2H_2O + 718$ KCal.) Acharya Ray read the communications embodying these investigations in a meeting of the Chemical Society London and he was heartily congratulated by Sir William Ramsay, Sir Henry E. Roscoe and other eminent British chemists. In welcoming Dr P C. Ray, Dr. Veley remarked that Dr Ray represented a nation which had attained a high degree of civilization and discovered many chemical processes when this country (England) was but a dismal swamp

The Universities of Calcutta, Bombay and Madras celebrated their centenary in 1957, but in the early days of their existence there was hardly any original work carried out at these seats of learning Only at the beginning of the present century, research work in Indian history, philosophy, Sanskrit, etc started on an organized scale Acharya Ray and Acharya J C Bose began experimental investigations in the Presidency College as early as 1888 and almost unaided they continued to work in the laboratory From then onwords several brilliant young men were inspired and came under the influence of Acharya Ray and a vigorous school of chemical research started in Calcutta for the first time in the history of university education in India Sir C. V Raman, an accounts officer, commenced physical researches in Calcutta at 210, Bowbazar street in the laboratories of the Indian Association for the Cultivation of Science in 1907. He also attracted research workers in physics from many parts of India Within a short time, the pupils of Acharya Ray created powerful centres of studies and research in many universities of the country. Through the munificence of Sir T. N. Palit, Sir Rash Bebari Ghosh, Raja of Khaira, the University College of Science came into existence in 1915 with Acharya Ray as the Palit Professor of Chemistry and Sir C. V. Raman as the Palit Professor of Physics. This event is a milestone in our national development and provided Acharya Ray the opportunity he hoped for, – to express in his own words–"the realization of the dream of my life."

Acharya Ray should certainly be recognized as a great teacher of chemistry and source of inspiration to young men and deserves to be placed in the same rank with Gay Lussac. Berzelius, Liebig, Wohler, Ostwald, Ramsay, Urbain and Sylvain Levi of European fame Acharya Ray was well-versed in history and English literature

and could easily read books and journals in French and German His great knowledge of chemistry and history of natural and physical sciences is embodied in his monumental work. History of Hindu Chemistry, which has been very ably revised and enlarged by his beloved pupil Prof. P Ray

Although he named his book as Hindu Chemistry he was a staunch Brahmo and enjoyed the great confidence of leaders of the Brahmo Samaj like Sivanath Shastri, Nilratan Sarkar, P K. Acharya, Sitanath Tatwabhusan and contributed large sums for the welfare of the Samaj I greatefully acknowledge his confidence and deep affection for me He also visited us many times either at Jessore or at Allahabad When I married Sheila Devi in 1938, our Guru was very, happy as she was a Brahmo girl and a good chemist. About 10 years before his death in 1944, I visited him at Raruli-Katipara, Khulna, where he was spending the summer vacation, encouraging young men by his example to lead a rural life After spending four happy days with him, when I was leaving for Allahabad, his eyes were full of tears, which moved me deeply. Such a Guru, a patriot, a humanist, a great scientist, a historian, a philanthropist and above all a man who lived entirely for others cannot but influence the youth for achieving a noble life in the service of the nation

As a token of love and reverence to his memory the Corporation of Calcutta has renamed a portion of the Upper Circular Road as Acharya Prafulla Chandra Road. But he will live for ever in the hearts of his grateful countrymen as an example of a simple and noble life consecrated to the service of humanity.

Acharya Prafulla Chandra Ray: Birth Centenary Souvenir

A Wrench!

***London**, Dec. 6, 04*

Early in the morning received a letter from my eldest brother, announcing my mother's death-- the shock, the most severe I have felt in my life. She was the one centre towards which my affections were directed-- the void never to be filled up. Father thy will be done!

From the Diary of Sir P.C.Ray

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্মৃতিকথা

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেশবাসী আজ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালন করছেন। এটা পরম আনন্দের কথা। ত্যাগী মহাপুরুষদের স্মৃতিতর্পণ ও তাঁদের জীবনাদর্শ কীর্তনে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। কর্মজীবনের উন্মেষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহাশীষের স্নিগ্ধ প্রভাব উপলব্ধি করেছিলাম। তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তাঁর স্মৃতিতর্পণে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ পেয়ে তাই বিশেষ আনন্দ ও গৌরব অনুভব করছি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি, বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথের অনুরোধে আমার পুরাতন স্মৃতি থেকে কয়েকটি কথা নিবেদন করছি। এই পুণ্যস্মৃতিকথা হলো আচার্যদেবের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

১৯০৯ সালের কথা। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা এসেছি কলেজে পড়তে। অভিভাবকদের ইচ্ছা ছিল, আইন পড়ে হাইকোর্টে যোগদান করি। তাই প্রেসিডেন্সী কলেজের আর্টস ক্লাসে ভর্তি হই। শেষে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে স্থির করলাম, বিজ্ঞান পড়তে হবে। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যে বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজন! এদিকে প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞান ক্লাসে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু জানলাম, বিজ্ঞান ক্লাসে যোগদান করতে হলে ডক্টর পি. সি. রায়ের সমর্থনসহ আবেদন না করলে প্রিন্সিপাল পার্সিভাল সাহেব হয়তো বিজ্ঞান ক্লাসে ভর্তি করবেন না। আরও শোনলাম, অধ্যাপক রায় দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার সাধনের একান্ত পক্ষপাতী এবং তিনি ছাত্রদেরও বিশেষ হিতাকাঙ্খী। আগে আর কখনও তাঁকে দেখি নি। আবেদন পত্র নিয়ে দেখা করে কিছু বিস্মিত হলাম- সাদাসিদা পাতলা মানুষটি: চালচলন, কথাবার্তা – কোথাও কোন আড়ম্বর নেই। আবেদন জানাতেই হেসে বললেন, বিজ্ঞান পড়বে? বেশ। তারপর দু-এক কথার পরেই আবেদন পত্রখানা নিয়ে মন্তব্য লিখে দিলেন। বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলাম। এই আমার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার।

সে বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে যাঁরা ভর্তি হলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। নীলরতন ধর তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র–আমরা প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের রসায়ন পড়াতেন। তাঁর অধ্যাপনায় একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি রসায়নের যে সব বিষয় পড়াতেন, তার প্রত্যেকটির মূল তথ্যাদি পরীক্ষার সাহায্যে দেখাতেন এবং অতি চিত্তাকর্ষকভাবে বুঝিয়ে দিতেন। এমন সরল ও সুন্দরভাবে তিনি বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করতেন যে, আমরা নিবিষ্টচিত্তে শোনতাম

এবং আরও অনেক কিছু জানবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠতাম । রসায়নের প্রকৃত তাৎপর্য কি, প্রয়োজন কোথায়, দেশের শিল্পসমৃদ্ধির কাজে রসায়নের আবশ্যকতা কতটা এবং রসায়নবিদ্যার চর্চা যে আমাদের দেশেই সুরু হয়েছিল, প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা যে এ-বিষয়ে অনেকটা উন্নতি করেছিলেন—এসব কথা তাঁর কাছে অনেক শুনেছি । বহু আয়াসে লিখিত তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দু রসায়ন' নামক গ্রন্থের কথা আমরা ক্রমে জানলাম। এই গ্রন্থ দেশ-বিদেশে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিল।

অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রদের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহপূর্ণ কথাবার্তা ও সাদাসিদা আন্তরিক ব্যবহারে প্রাচীন যুগের গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয় । এরূপ সরলতা ও কোমলতার অন্তরালে প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ ছিল। তাঁর কর্মজীবন ছিল যেন কলের মত। যথাসময়ে যথাকর্তব্য সম্পাদন করা, নির্ধারিত কার্যসূচী অনুসারে কাজ করা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য । এরূপ সময়নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা সেকালে একমাত্র রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠক স্যার আশুতোষের মধ্যেই দেখেছি।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর প্রিয় ছাত্রদের মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যেতে বলতেন। প্রথম যে দিন ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই, সে দিনের কথা মনে আছে। তখনও প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ছি। আদর করে খেতে দিলেন একখানা এনামেলের থালায় এক টুক্‌রা পাঁউরুটি ও কিছু মৌ-ঝোলা গুড়। রুটিখানা বাসি বলে শক্ত, চিবানো কঠিন। সামনে বসে আছেন, ফেলতেও পারি না! যাহোক, এক অপূর্ব তৃপ্তি পেলাম তাঁর এই আপ্যায়নে। অশন-বসনে নির্লিপ্ততা, সহজ ও সরল জীবনযাত্রা ও ত্যাগধর্মে দীক্ষা ছিল তাঁর জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ স্বরূপ; কিন্তু খেতে ও খাওয়াতে তিনি ছিলেন ব্যয়কুণ্ঠ। অনেকে শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁকে খাদ্যসামগ্রী ও ফলমূল উপহার দিতেন, কিন্তু পচতে শুরু না করলে নিজেও খেতেন না, অপরকেও দিতেন না, যেন খুব হিসেবী ও মিতব্যয়ী ! অথচ জানতাম, দেখেছিও, অর্থের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মায়া ছিল না, দানে ও পরোপকারে তাঁর অর্জিত অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে।

যাহোক, আই-এস-সি পাশ করে বি.এস-সি পড়তে লাগলাম । এ- সময় মেঘনাদ সাহা ঢাকা থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে এসে ভর্তি হন । সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ বেছে নিলেন গণিতবিদ্যা ; আমি ও জ্ঞানচন্দ্র রসায়ন । এই বিষয় নির্বাচন আচার্যদেবের স্নেহের ফল কিনা, জানি না । কিন্তু রসায়নের চর্চা ও গবেষণায় যে বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তার মূলে আচার্যদেবের অনুপ্রেরণা কম ছিল না! মনে হয়, আমি ও জ্ঞানচন্দ্রই আচার্যের স্নেহ ও সান্নিধ্য বেশী পেয়েছিলাম। ১৯১৪ সালে স্যার আশুতোষের উদ্যোগে স্যার তারকনাথ পালিতের ৯২, আপার সারকুলার রোডের জমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক

গৃহীত হয় এবং বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। স্যার আশুতোষ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিজ্ঞান কলেজে এনে রসায়ন বিভাগের পালিত প্রোফেসর পদে নিযুক্ত করেন। পরলোকগত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র বিজ্ঞান কলেজের এই গোড়াপত্তনের সময় রসায়নের ঘোষ-প্রোফেসর পদে যোগদান করেন। আমি ও জ্ঞানচন্দ্র এম. এস-সি পরীক্ষার পরে ১৯১৫ সালে বিজ্ঞান কলেজে পালিত প্রোফেসরের সহকারী হিসাবে যোগদান করি। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ইতিপূর্বেই জার্মেনীতে রসায়নের ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে এসেছেন; কাজেই পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। বিজ্ঞান কলেজের সংগঠন কার্যে ডাঃ মিত্রের সাহায্য উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ইতিমধ্যে দেশবাসীর নিকট আচার্য রায় আখ্যায় পরিচিত হয়েছেন। তাঁর ঋষিকল্প সরল জীবনযাত্রা, ত্যাগ, দেশাত্মবোধ, দানব্রত প্রভৃতি বিবিধ সৎগুণের কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে । বিশেষতঃ জাতীয় ও অর্থনীতিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাঙ্গালী যুবকেরা লেখাপড়া শিখে সৌখিন হয়ে ওঠে এবং সামান্য চাকুরীর জন্যে ছুটাছুটি করে : কিন্তু ব্যবসা-বানিজ্য করে অর্থনীতিক উন্নতি করতে পারে না। বাঙ্গালীর এই শ্রমবিমুখতা দূর করে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে তিনি সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে, পুস্তকাদি লিখে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি বলতেন, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক আছে– কায়িক পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও ব্যবসায়বুদ্ধি তার সঙ্গে যুক্ত হলে বাঙ্গালীর দারিদ্র্য ঘুচবে । এই ভাবধারা নিয়ে আচার্যদেব "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার" নামক পুস্তকখানা অনেক পূর্বেই লিখেছিলেন। বহু যুবককে তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, অর্থ দিয়ে সাহায্যও করেছেন।

দেশের অর্থনীতিক বুনিয়াদ গড়বার জন্যে আচার্যদেবের আন্তরিক আগ্রহ রূপ নিয়েছিল 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠায়। ওষুধপত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করবার এই কারখানা স্থাপন করে তিনি দেশকে এ-বিষয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করবার উদ্যোগ করেছিলেন। বর্তমান বিজ্ঞান কলেজের দক্ষিণে সংলগ্ন যে বাড়ীতে এখন আন্টুল কোম্পানীর কার্ডবোর্ড তৈরির কারখানা আছে, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রথম প্রতিষ্ঠা সেখানেই। সেকালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই বাড়ীরই দ্বিতলের একটি কক্ষে বহুদিন বাস করেছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল একটি সাধারণ যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আচার্য রায়ের তত্ত্বাবধানে ও রাজশেখর বসুর পরিচালনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বড় কারখানা মানিকতলায় গড়ে ওঠে এবং পরে আর একটি কারখানা পানিহাটিতে স্থাপিত হয় । বর্তমানে অন্যত্রও এর কারখানা হয়েছে।

সামাজিক রীতিনীতির দোষত্রুটি দূর করে একটি বলিষ্ঠ সমাজ গঠনের প্রতিও আচার্যদেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সাদাসিধা দেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান ও সরল অনাড়ম্বর

জীবনযাপন করে যাতে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখা যায়, তার জন্যে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। অথচ তিনি সমাজের শ্রেণীভেদ ও অর্থশূন্য ছুঁৎমার্গ মানতেন না । এটা অবশ্য তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। পরিষ্কার পাত্রে বিশুদ্ধ জল হলেই তা পান করা যায়, পাত্র কেউ স্পর্শ করলে তা অপেয় হয় না। সমাজে বাল্যবিবাহের অশুভ পরিণতির বিষয়ে তিনি আমাদের বলতেন। এই সব মনোবৃত্তির জন্যে তিনি ব্রাহ্ম মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপর তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আচার্যদেব ছিলেন চিরকুমার। জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, অশন-বসন-সব বিষয়েই তিনি ব্রহ্মচারীর মত জীবনযাপন করে গেছেন; কিন্তু সমাজ বা সংসারের প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পাণ্ডিত্য, ত্যাগ, নিষ্ঠা, দেশহিতৈষণা প্রভৃতি সৎগুণের পরিচয় পেয়ে দেশবাসী যেমন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েছে, দেশের নেতৃবৃন্দও তেমনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নানা বিষয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। মহামতি গোখেলের সঙ্গে আচার্যদেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। গোখেলের কলকাতা ত্যাগের সময় তাঁর ঘোড়ার গাড়িটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সামান্য অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করেছিলেন। এই গাড়িতে চড়ে তিনি গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতেন এবং প্রায়ই সেখানে সান্ধ্য আসর বসতো। আমি ও জ্ঞানচন্দ্র বহুদিন তাঁর সঙ্গে গাড়িতে যেতাম । দেশনেতা স্বর্গীয় সত্যানন্দ বসুও প্রায় নিত্যসঙ্গীর মত যেতেন। দৈন্য-দুর্দশা ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হতো । একবার উপেন্দ্রনাথ সেন গড়ের মাঠের মধ্যে শীতকালে ভুরিভোজনের আয়োজন করেছিলেন, মনে আছে। সে যুগের অনেক সাহিত্যিকও সেখানে উপস্থিত হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতেন । আচার্যদেব বাংলাভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং বাংলা ভাষায় অনেক কিছু লিখে গেছেন।

আচার্যদেব বিজ্ঞান কলেজে যোগদানের কিছুকাল পরে দ্বিতলের একটি কক্ষে এসে বাস করতে থাকেন। আগে ঐ কক্ষে জ্ঞানচন্দ্র কিছুদিন ছিলেন। ক্রমে আমাদের দু-জনেরই আচার্যদেবের জীবনধারার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। বিজ্ঞান কলেজে অবস্থানকালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সমাজ ও দেশসেবার চরম পরিণতি ঘটেছিল। উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সেবার জন্যে তাঁর উদ্যোগ ও সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করা দেশসেবার একটি প্রকৃত উদাহরণ। এর জন্যেই তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর আবেদনে দেশে এক অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল—প্রফুল্লচন্দ্রের মত সর্বত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ সমাজসেবীর আবেদনেই এরূপ সম্ভব। ধনীর ব্যক্তিরা নিজে থেকে এসে আচার্যদেবকে অর্থদান করে নিজেদের ধন্য মনে করতেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও ছাত্রবন্ধু। অর্থাভাবে দরিদ্র মেধাবি ছাত্রদের পড়াশুনা হবে না, এটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বহু দিন থেকেই অসংখ্য ছাত্রকে

তিনি প্রতিমাসে নিয়মিত অর্থ-সাহায্য করে গেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে থাকাকালীন দেখেছি, প্রতিমাসে দুঃস্থ ছাত্ররা এসে নির্দিষ্ট অর্থ-সাহায্য নিয়ে যেত। বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করবার পরে তিনি পালিত প্রোফেসর হিসাবে তাঁর সম্পূর্ণ বেতন কোন একটি ফাণ্ডে জমা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বিজ্ঞান প্রসারের জন্যে গচ্ছিত রেখেছিলেন। এই ফাণ্ড থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে আচার্যদেবের নামে রসায়নের একটি লেকচারার পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দেশাত্মবোধের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শেষের দিকে তিনি মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশের কাজে যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর ক্ষীণ স্বাস্থ্যের জন্যে আন্দোলনের পুরোভাগে এসে নির্যাতন ও কারাবরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না; কিন্তু তিনি সর্বতোভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজে সাধ্যানুসারে যোগদান করেছেন এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সর্বদা তাঁর শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভ করেছেন। এই সময়ে একদিনের কথা মনে পড়ে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কারাগারে, বাসন্তী দেবী এলেন আচার্যদেবের কাছে দেশবন্ধুর স্থলে নেতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে তিনি এই গুরুভার গ্রহণ করতে সক্ষম হন নি। তাঁদের কথাবার্তার সময়ে আমি ও শ্রী অশোকচন্দ্র উপস্থিত ছিলাম। এই আলোচনার সময়ে আমাকে তিনি বিশেষভাব উপস্থিত থাকতে বলেছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বহুমুখী জীবন-কথার সামান্য পরিচয় দেওয়াও সম্ভব নয় । কত কথাই মনে পড়ে। যাহোক, ইতিমধ্যে আমি ও জ্ঞানচন্দ্র উচ্চশিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে বিলাতে গিয়েছি, তারপর ফিরে এসে আমি আচার্যদেবের সঙ্গে কাজ করেছি। জ্ঞানচন্দ্র ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের প্রোফেসরের পদে যোগদান করেন। আচার্যদেব অবসর গ্রহণ করেও বিজ্ঞান কলেজেই বাস করতে থাকেন। স্বাস্থ্য তাঁর কোনদিনইই তেমন ভাল ছিল না, তখন আরও খারাপ হতে লাগলো। সংসারহীন চিরকুমার, কাজেই বৃদ্ধ বয়সে স্বভাবতঃই কিছু অসুবিধা বোধ করতেন। একবার তিনি আমার তালতলাস্থিত গৃহে বাস করবেন বলেছিলেন। এই ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমি ধন্য হয়েছিলাম; কিন্তু কি কারণে জানি না, শেষ অবধি তিনি গেলেন না। আমি ইতিমধ্যে কর্মোপলক্ষে বিদেশে চলে গেছি। ১৬ই জুন, ১৯৪৪ সালে আচার্যদেবের পূত-জীবনের অবসান ঘটে, সে সময় আমি বা জ্ঞানচন্দ্র কেউই কলকাতায় ছিলাম না। দেশব্যাপী শোকের ছায়া নেমে এসেছিল, মনে পড়ে। আচার্যের তিরোধানের সংবাদ পেয়ে শোকে অভিভূত হয়ে একজন পরমাত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথা বোধ করেছিলাম। আচার্যদেবের স্মৃতির প্রতি সেদিনের মত আজও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বর্তমান ভারতের পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বীরেশচন্দ্র গুহ

যে কয়েকজন অসাধারণ মানুষকে আমি দেখেছি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন। ভারতের ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে তিনি জন্মেছিলেন, যখন পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাতে প্রাচীন সামাজিক বিধিব্যবস্থাগুলি ভেঙে পড়ছিল। এই সময়ে কয়েক জন মহান মানুষ ভারতে জন্মেছিলেন। এঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁরা ভারতকে তার সনাতন কূলধর্ম থেকে মুক্ত করে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অনবরত চেষ্টা করে চলেছিলেন। তাঁরা সমাজে প্রচলিত কূপমণ্ডুকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। আচার্য রায় এই নতুন ভাবধারায় দীক্ষিত হয়ে এই আন্দোলনের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, ভারতবাসীর মন থেকে এই সব জড়তা দূর করতে না পারলে ভারতকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। 'ভারতকে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞানের পথেই এগিয়ে চলতে হবে'- রামমোহন রায়ের এই সুচিন্তিত অভিমতের সঙ্গে তিনি ছিলেন একমত। সে জন্যে সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তিনি বিজ্ঞানের অনুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত করতে মনস্থ করেছিলেন। রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে নতুন ভারত গঠন করে জগৎ-সভায় ভারতকে সম্মানের আসনে বসানো সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যেই শুধু তিনি রসায়ন শাস্ত্রের চর্চা করা স্থির করেন নি, ভারতের সমৃদ্ধি ও আর্থিক বুনিয়াদ দৃঢ় করবার জন্যে রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যও তাঁর মনের মধ্যে ছিল।

যৌবনে যে আদর্শ তিনি গ্রহণ করেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তা অনুসরণ করে গেছেন। রসায়ন শাস্ত্রের সমস্ত বিভাগেই 'রাসায়নিক গোষ্ঠী' গঠন করে তোলবার কাজে তিনি আজীবন সাধনা করে গেছেন। শুধু রসায়ন বিভাগের ছাত্রেরাই যে তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন এমন নয়, বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের ছাত্রেরাও ঐ একই রকম উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা তাঁর কাছ থেকে লাভ করেছেন। পরলোকগত ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মত প্রতিভা সম্পন্ন বিজ্ঞানীরাও তাঁর অনুপ্রেরণা লাভ করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর অনুরক্ত ছিলেন। আচার্য রায় চিরকুমার ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে ছাত্রেরাই তাঁর সন্তানতুল্য ছিল। তাঁকে প্রায়ই সেই সুপরিচিত সংস্কৃত বাক্যটি আওড়াতে শোনা যেত, যার অর্থ হচ্ছে- 'পুত্র ও শিষ্য ছাড়া অপর সকলের কাছেই জয়ী হবার

কামনা কোরো'। এটা তাঁর সত্যিই আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাঁর কোন ছাত্র বা ছাত্র নন, এমন কোন ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলে তিনি বিশেষভাবে উল্লসিত হয়ে উঠতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগে ''পালিত'' অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। সবসময়ে গবেষণাগারের নিকটে থাকতে পারবেন –এই সুবিধার জন্যে বিজ্ঞান কলেজের বাড়ীতে থাকাই তিনি স্থির করেন। এই বাড়ীতেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯২৩ সালে যখন আমি তাঁর গবেষণাগারে ছাত্ররূপে যোগদান করি, তখন তিনি আমাকে তাঁর ওখানে এসে থাকতে বলেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন– 'বাড়ী থেকে আসতে যেতে তোমার যে সময়টা ট্রামে কাটে, তার পরিমাণ হচ্ছে দু-ঘন্টা। তাহলে এই হিসেবে বছরে তোমার একটি মাস সময় ট্রামেই কেটে যাচ্ছে। সময়ের এই অপচয় অসহ্য'। তাঁর যুক্তি আমার মেনে নিতে হলো, কারণ এর কোন জবাব ছিল না। এর পর থেকে আমার বিজ্ঞান কলেজে থাকা সুরু হলো। একদিন আমার ডেস্কের উপর থেকে একখানা ছেঁড়া বইয়ের পাতা সিঁড়ির উপরে উড়ে পড়ে যায়। এ তাঁর চোখে পড়বার পর তিনি আমায় বলেছিলেন যে, এরকম দায়িত্ব জ্ঞানহীন কোন ছেলে যে তাঁর গবেষণাগারে কাজ করে, এ তাঁর জানা ছিল না। তাঁকে যখন আমি বুঝিয়ে বলতে গেলাম যে, বইখানা একেবারেই ছেঁড়া ছিল, তখন তিনি আরও রেগে গেলেন– বললেন, অল্প কয়েকটা পয়সা খরচ করে বইখানা কি বাঁধিয়ে নিতে পারলে না। একজন গবেষক ছাত্র কয়েক ফোঁটা পারা মেঝের উপর ফেলে আচার্য রায়ের কাছ থেকে তার এই অসাবধানতার জন্যে বেশ বকুনি খেয়েছিলেন। অকারণে উচু শীষে বুনসেন বার্ণার জ্বালিয়ে রাখা, ছাপানো চিঠির কাগজে খসড়া করা– এসব তাঁর নিষেধ ছিল। গবেষণাগারে বিজ্ঞানের আলোচনা ছাড়া অন্য কোন রকম কথাবার্তা বলা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না।

আচার্য রায় শুধু একজন বড় বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁর প্রতি 'মহৎ' আখ্যাটি সর্বপ্রকারেই প্রযুজ্য । তিনি সতিকারের ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। দেশের কল্যাণে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক বা সমাজ সেবার ক্ষেত্রেই হোক, যে কোন কাজই তিনি করেছেন, তা দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েই করেছেন। বিজ্ঞান কলেজের একটা ঘরে তিনি থাকতেন। তাঁর ঘরে আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল একখানা খাট, লেখবার টেবিল একটা, চেয়ার দুটো, আর এক আলমারী বই। ঘরে তিনি একটা বৈদ্যুতিক পাখাও রাখতে দিতেন না। অতি সাধারণ পোষাকে, সাধারণ ভাবেই তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। নীচের ঘটনাটি থেকেই তাঁর জীবনযাত্রার আদর্শ

বিশেষভাবে বোঝা যাবে। তাঁর সঙ্গে একজন ছাত্র থাকতেন। তিনি তাঁর জন্যে কয়েকটা বেশ ভাল কলা নিয়ে এলেন। যখন তিনি শুনলেন যে, এক-একটা কলার দাম দু'পয়সা, তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং কলাগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরই প্রায় আধ ঘন্টা পরে একজন সুপরিচিত সমাজকর্মী তাঁর কাছে এলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে। আচার্য রায় তাঁর ঐ ছাত্রটিকেই ডেকে বললেন, তাঁর ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা আছে সব টাকার একখানা চেক লিখে দিতে। বস্তুতঃপক্ষে আচার্য রায় নিজের জন্যে খুব সামান্য অর্থই ব্যয় করতেন। তাঁর আয়ের প্রায় সব টাকাই তিনি অভাব গ্রস্থ ছাত্র, জন-কল্যাণ প্রতিষ্ঠান, কয়েকটি স্কুল ও কলেজ, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করতেন।

এই মহৎ মানুষটি দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করে দেশের সেবা করে গেছেন। সবাই জানেন যে, দেশের সর্বপ্রকার বিপদে-আপদে – সে বন্যাই হোক, কি অন্য কোন প্রকার বিপদই হোক, তিনি সাহায্যের কাজে সকল সময়েই অগ্রণী হয়েছেন। তাঁর ডাকে এই সব ত্রাণ-কার্যে লক্ষ লক্ষ লোক সাড়া দিয়ে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এসেছে ; কারণ তাঁর উপরে সকলেরই অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। দেশের যুব-শক্তির উপরেই তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি প্রতিনিয়তই তাদের কুসংস্কার পরিত্যাগ করে বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হতে বলতেন। গবেষণাগারে বিজ্ঞানীর জীবন ও গৃহে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগত জীবন– এই দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করতে প্রত্যেক ছাত্রকেই তিনি নিষেধ করতেন। তিনি প্রত্যেককে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করতে বলতেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক বা শিল্পের ক্ষেত্রেই হোক, প্রত্যেককে তিনি কর্মময় স্বার্থহীন আদর্শ অনুসরণ করে চলতে বলতেন, যে আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি নিজে। তিনি যে উজ্জ্বল ভারতের স্বপ্ন দেখতেন, সেই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুতে আমাদের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে হবে। তাঁর জীবন-তারকা আমাদের দীর্ঘ ও কঠিন পথকে স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত করে তুলুক।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, প্রফুল্লচন্দ্র জন্মশতবর্ষ সংখ্যা . আগস্ট ১৯৬১

A Master Mind

"A great man has gone, he was a star in the firmament of India and Bengal illumining the mind and heart of many young research workers An intense nationalist, he lived the life of the poorest among us His frail body had within it a master mind and intellect."

DR. BIDHAN CHANDRA ROY

A Twentieth Century Rishi

Sir Jadunath Sarkar, Kt., C.I.E., D. Litt.

With the death of Sir Prafulla Chandra Ray a lofty beacon-light of our nation has been quenched, and a character has disappeared from our midst which can hardly ever reappear in the coming centuries, since our social evolution has already taken a turn to a new stage He was himself an eminent research worker in chemistry and the teacher of two generations of scienific workers, indeed, in popular parlance he bore the title of "the Father of D Sc's " In this respect he ran true to the type of our ancient Rishis, – those self-forgetting, life-devoting austerely simple, but smiling and childlike, gurus, who moulded Indian life and thought twenty-five centuries ago Indian scientists now in the fulness of life can truly speak of him as Bhavabhuti spoke of the father of Indian song

'স চ কুলপতি আদ্যঃ ছন্দসাম্ যঃ প্রয়োক্তা।'

"He the primeval great Teacher, who gave origin to our craft"

Acharya Prafulla Chandra, as he was lovingly called in Bengal, was the kulapati of Indian science; his pupils and his pupils' pupils fill many a chair in laboratories all over India, and many others who had not been privileged to sit at his feet, have been inspired by the example of his life

And a life, so rich in its variety, so fruitful of achievement and so unfailingly directed to a single goal for 83 years, deserves reverential contemplation for our own good Hard-working, abstemiously poor professors of chemistry there have been on the continent,especially in France. His visit to one such old savant in a poor servantless tenement in the suburbs of Paris, during his continental tour of 1921, Dr. Ray described to me with rapt admiration But what raised P C Ray to a different plane from them was the practical side of his life's work This original investigator of Nature's secrets, this abstract scientist, was at the same time an intensely practical patriot. Scorning to win cheap populariy by flattering the current whims of our "educated public," he kept crying out month after month, year after year, from the platform and the

press "young men of India give up indolence, give up your habits of luxury, pursue plane living and high thinking, throw away the hollow bombast and deceptive slogans of politics, and turn to the economic regeneration of the country Otherwise, our race would become extinct" His insistence on this primal need of the nation made supercilious "leaders" sneer at him (in private talk) as an old crack-brain But he also won the lasting gratitude and devotion of thousands of his thoughtful countrymen, as a true light of life And he set practical examples of how to do it. This aim he kept before himself and before his countrymen to the last day of his life, and always stressed to us who has the privilege of his private friendship

Judged by the use he made of his life's opportunities in pursuing his ideal, and not merely by the honour and wealth he earned (though these, too, were considerable for a middle-class Bengali College teacher) his career was in every sense fruitful of success His equipment for his chosen work was the highest possible and richly varied Born on 2nd August 1861, he went through the undergraduate course in Calcutta, won the Gilchrist Scholarship for study in Britain (1882), and joined the Edinburgh University where he obtained the D Sc degree in 1887 His career there is best illustrated by the following conversation

In 1936 the Dacca University conferred honorary doctorates on Sir P C Ray and Sir John Anderson the Governor of Bengal At the tea party following the ceremony, Dr Ray sitting at the right hand of the Governor smilingly remarked to him, "Today we have become enrolled in the same University. We are fellow students now."

Sir John ---- "Was it not earlier? Are you not a Faraday Gold Medalist of the Edinburgh University and were you not elected Vice-President of the University Natural Philosophy Society in 1886?"

Sir P C ----- "Yes"

Sir John ----- " I also won that medal and was elected a Vice-president of the Society, eighteen years after you In looking up the lists of my predecessors in that office and among the former medalists I found your name in 1886."

Then their talk drifted on to Ray's contemporaries at Edinburgh who

had since made great names in science and some of whom were Anderson's teachers, such as James Walker, Hugh Marshall, Alexander Smith and others.

The Scotsman entered the Civil Service of his country by a competitive examination open to all, and rose to be Governor of Bengal, a minister under the British Crown and a Right Hon'ble Member of the War Cabinet His Bengali compeer, – who had won the same academic honours (and a doctorate in addition) eighteen years earlier was admitted to the provincial educational service of his own country grudgingly by nomination, and was confined to the same subodinate category throughout his 27 years of Government service Sir Alfred Croft, the Director of Public Instruction, refused him a post in the higher service (I E S) with the consoling words, "Many other ways of life are open to you. Nobody compels you to enter the educational service "(P C Ray's Autobiography)

On his return to India Dr Prafulla Chandra secured employment as an Assistant Lecturer in chemistry at the Government Presidency College, Calcutta, in June 1889, and continued to serve there till his retirement in 1916, – when the Calcutta University took him up as the Palit Professor of chemistry at its newly founded Science College in Upper Circular Road Here in a single barely-furnished upper room he passed all his remaining years, and here he breathed his last, on 16thJune1944,at the age of almost three years His presence there and his daily work in the laboratory year after year, were an inspiration to countless students, even to those who did not profess Chemistry It was a life wholly dedicated to science, ---and also to the country's varied interests,as I shall show later.

After being settled in life in Calcutta the young scientist proposed for the hand of the daughter of a very well-known cultured family, but his suit was rejected and one of his pupils was preferred to him (The lady later died young and without issue) So, Prafulla Chandra remained a bachelor all his life . it was a gain to science and to the country and to himself also personally. The lonely hermit was spared the hundred and one worries of domestic management which fall on the father, and he escaped also.

The grief that saps the mind
for those on earth we see no more

But it does not mean that henceforth he led a sordid self-centred life, dead to the rest of mankind On the contrary, he look the student community– not in Bengal alone– as his adopted sons, and lavished all his time, all his thoughts and nearly all of his money on them.

His influence over them sprang not only from his life's example, but also from his varied mental equipment Prafulla Chandra Ray was no narrow specialist who knows nothing and cares for nothing outside the minute subdivision of science in which he is making his researches. His liberal culture and wide human outlook were reflected in his love of general literature, passion for reading History books, and study of Sanskrit. Thus the scientific bias of his genius was balanced and corrected by literature, as Sir J C Bose's was by sumptuous examples of the painter's and sculptor's art, which the many visitors to the Bose Institute and Home must have noticed. In his old age, Dr Ray was rereading *Cicero's De Senectute* Duing one of my visits he told me in anger :Look at a D Sc and one of my pupils, I was dictating a paper of mine to him when he suddenly stopped and asked me 'how shall I spell Cicero ? Does it begin with S or C ?' The new generation knows nothing beyond science, and their minds are cramped by their want of a broad general culture From this basic defect even their writings on science will be unreadable " He was opposed to the abolition of compulsory Sanskrit from the Matriculation course and argued that the ignorance of this parent language would hopelessly weaken and vitiate the style of our Bengali writers, even on stricly scientific subjects; – those who do not know Sanskrit literature cannot write Bengali well "

He told me that during his fifth visit to Europe (in 1926), he went to the Rotunda-like place in London (now destroyed in the Blitz) with bookshops radiating all around, and bought a copy of Tom Jones in five volumes, in a large paper clear-type edition as very soothing to the eye in his old age ' Classics, English fiction, Indian history, all these were the delights of his life and the nourishing sap of his intellect

His love of history and his love for his country drove him to suspend his modern chemical research, and study ancient Sanskrit works on science and make experiements to test the old formula and recipes of Hindu medicine Old Sanskrit works on chemistry (rasa-

shastra) were traced by him, usually with the help of Aufrecht's catalogus catalogorum of Sanskrit MSS, and he secured transcripts of them for study with the help of pandits The multifarious and recondite learning shown by Dr Rudolf Hoernle in editing and translating the Bower Manuscript, extorted his boundless admiration At this stage of his studies in Hindu chemistry, he one day told me in the Professors' common room, "I admire Hoernle like a God What marvellous scholarship! It is more than human"

At the same time he was no blind Chauvinist, no false patriotism would ever make him support any untrue claim One day I collared him and asked, "Do you really believe that the ancient Hindus knew the atomic theory in its modern scientific sense ? " He replied with a smile, "I don't, but I have given the theory in an appendix to my History of Hindu Chemistry as propounded by a friend who has been clearly stated there as its father!!!"

He opposed the opening of the Indian mints to the free coinage of silver, which would still further lower the exchange value of the rupee, though many Indian industrialists were ranged against his view When in a neighbouring province (economically very weak), the bureaucracy (with some Indian support) proposed to spend ten lakhs on university office buildings Sir P C Ray publicly declared that to spend so much on mere brick and mortar would be worse than a mistake, it would be a crime!

His heart was with the mass of the people, and not confined to the youth of the middle and the lower middle classes only In 1917 and 1918 he spent his Puja holidays (October) at Benares, and we used to row up and down the Ganges in a hired boat in the evening One day he asked us about the owners of the lofty palaces bordering the river front, – this is the Sindhia House, this is the Udaipur House, this is the Durbhanga Maharajah's ghat, this is the old Peshwas palace (since purchased by a Rajah), and so on Then he remarked, "I can now understand why there is Socialism in this world Look at these lofty mansions of the idle rich and look at the miserable huts of the actual workers and cultivators that I saw bordering the railway line for many miles before Benares." Then, looking at the priests fleecing the pilgrims at the sacred ghats, he added, "Did not Vivekanand say that there would be no regeneration

of India unless we seized the priests by the long tufts of hair at the back of their heads and flung them into the Ocean? He was quite right "

Even a pure scientist cannot remain untouched by the politics that dominate the life of his•countrymen Prafulla Chandre was a silent but ardent and at the same time far-sighted and wise patriot, even from his student days in an alien land. He believed (as he once told me in his sitting room cum laboratory on the ground floor of the old Presidency College building, eastern wing), that the British conquest of India was a divine dispensation for our own good, as a necessary step in our evolution towards advanced science, industry and modern knowledge. This was also the publicly avowed opinion of Bankim Chandra, the author of the ignorantly denounced song Bande Mataram But, at the same time, he was keen to point out the short comings of the actual British Indian administration and the prevalence of drift and absence at Whitehall of a clearly laid and persistently followed policy of Indian uplift. On this subject he wrote a strongly worded and fully documented anonymous pamphlet when a student at Edinburgh,–which he later acknowledged in his Autobiography When Lord Curzon, in his address as Chancellor of the Calcutta University, told us that truthfulness is a virtue peculiar to Europe and little known and less valued in the East, the students hissed at him as he was leaving the Senate House I was not in Calcutta at the time Sir PC Ray who narrated the story to me added, "Those who can applaud, have also a right to hiss" Some readers may remember how the very next morning the Amrita Bazar Patrika published an extract from Lord Curzon's travel book in which he boasts how he had lied to the Prime Minister of Korea in order to gain a diplomatic point'

This keenness to ensure the lasting good of his countrymen was at the bottom of his opposition to all disruptive schemes like the yearly deteriorating Bengal Secondary Education Bills and the attempts of designing leaders to widen the cleavage between the Hindus and the Muslims,– who in Bengal at least from one society, separated only by religion (with attendant meal and marriage customs) He applauded evey attempt to show how the literature produced by the Bengali Muslims is very genuine Bengali,– and once embraced a Muslim essayist on this subject on the platform

of a Bengali Literary Conference at Rajshahi He subsidised the publication of Reza-ul-Karim's thoughtful English essays appealing for Hindu-Moslem unity

This dream of his life, as he often used to tell his friends in his Presidency College days, was to see a fully equipped institute of scientific research established in India That dream was realised, thanks to the munificence of Taraknath Palit and Rasbehari Ghose, in 1916 Himself leading a hemit's life of simplicity and abstinence, he pleaded for the necessary equipment of apparatus to the fullest extent Any parsimony here would, he argued be false economy and harmful to the nation's advance by nullifying the labours of our savants At a meeting of the Hindu University Court (at Benares, in 1918), he argued, " I am a scientific worker, you see how I am dressed If my coat sleeves are examined you will find proof that I am a chemist, accustomed to handling corrosive acids I do not ask for anything for myself But I tell you, you must equip your laboratories with the latest and best apparatus, or you will not get the fullest benefit from the genius and industry of our students " This speech convinced even those Elders who had been clamouring to see again the day when " Five thousand vidyarthis (students) would squat down on the grass under the trees and go through their College courses,"– very cheaply

Of his personal charity, large-scale relief organisation, foundation of industries,tireless efforts at social uplift and practical help, I have no time to speak today

MODERN REVIEW:JULY,1944.

The Dynamic Rishi Of Old

"By the passing away of Acharyya Ray India has lost one of her most talented sons in whom science and patriotism and a child-like simplicity of character combined to make a remarkable personality and a most lovable man He was the nearest approach in modern India to the dynamic Rishis of old "

C. RAJAGOPALACHARIA

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণে

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে এক সুবর্ণযুগ। ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে জন্মেছিলেন বহু মনীষী। তাঁরা শুধু বাংলার নয় সমস্ত ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁদের অন্যতম।

ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার কথা। ১৯১১ সাল। তখন ঢাকা কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে রসায়নবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়ি। এসেছি প্রথম কলকাতায়। আচার্য রায় তখন একজন খ্যাতিমান রসায়নবিজ্ঞানী ও বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শিক্ষিত ও ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধার পাত্র। প্রবল ইচ্ছা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ও বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা দেখি। কিন্তু কোন পরিচয়-পত্র ছিল না। সাহসে ভর করে চলে গেলাম তাঁর আপার সার্কুলার রোডের আবাসস্থলে। এক টুকরা কাগজে লিখে পাঠালাম পরিচয় ও উদ্দেশ্য। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বেরিয়ে এসে অতি স্নেহভরে ডেকে নিলেন ভেতরে। এমন ভাবে আলাপ করলেন যেন আমি তাঁর অতি স্নেহের পাত্র। বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা দেখবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই সময়কার ম্যানেজার শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায় নিজে আমাকে নিয়ে সব দেখালেন। এতটা ছিল আমার কল্পনাতীত। এ দিনটি আমার জীবনের পরম শুভদিন। এ মধুর অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়।

তারপর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরেরও অধিক সময় এ মহানুভব ব্যক্তিকে তাঁর বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে নিবিড়ভাবে দেখবার, বুঝবার ও জানবার সৌভাগ্যলাভ করেছি। রসায়নবিজ্ঞানে তাঁর চেয়ে কৃতকর্মা লোক আজ ভারতবর্ষে আছেন। রসায়নশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর চেয়ে উপযুক্ত লোকও হয়েছেন, তাঁর মত সরল সাদাসিধে ছাত্রপ্রেমী শিক্ষাবিদও ভারতে জন্মেছেন, তাঁর মত আর্তসেবকও আছেন, তাঁর চেয়ে ত্যাগী দেশপ্রেমিকও আছেন, আধুনিক যুগের মানুষ হয়ে অতীতের প্রতি তাঁর মত শ্রদ্ধাশীলও আছেন, বৃহৎ শিল্পের পূজারী হয়েও গ্রামে গ্রামে কুটীর শিল্পের প্রসারের পক্ষপাতী লোকও আছেন, সহরবাসী হয়েও সরল গ্রাম্যজীবনের মাধুর্য্য উপলব্ধিকারীও আছেন, অন্য কোন প্রদেশের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন না হয়েও বাংলার উন্নতিকামী লোকও আছেন, প্রেম ও ভালবাসার সঙ্গে বাংলার ত্রুটি, বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দেখাতে হয়তো তাঁর চেয়ে সিদ্ধ হস্ত কেউ কেউ আছেন, কিন্তু এত সব গুণের একত্র সমাবেশ একটি মানুষে বিরল। আমি দেখিনি বললেও অত্যুক্তি হয় না। আজ দেশের এই সঙ্কটময় সময়ে তাঁর মত লোকের প্রয়োজন সর্বাধিক। যখনি চিন্তা করি, অনুভব করি তাঁর অভাব। চোখের সামনে ভেসে উঠে সে মানুষটির চেহারা।

বাঙ্গালীদের কেতাবী-পড়ার দিকে অত্যধিক ঝোঁক তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। একদিন বিজ্ঞান কালেজে গিয়েছি দেখা করতে। সে সময় এম. এ পাশ এক ভদ্রলোক এসেছেন। নূতন আর একটি বিষয়ে এম এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শুনেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধভাবে বলে উঠলেন– "Creator created the Bengalees for passing examinations. fulfil His wish." ভদ্রলোকতো একেবারে চুপ।

বাঙ্গালী সমাজে মামলাপ্রবণতার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তাই এমন কি আইনকালেজ একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে আইনজীবীদের প্রতি কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। কোন কোন আইনজীবীর গুণ মুক্তকণ্ঠে বলতে শুনেছি। খ্যাতনামা আইনজ্ঞ রাসবিহারী ঘোষ সম্বন্ধে একাধিকবার আমাকে বলেছেন, "Had there been no Rashbehari Ghosh, there would have been no Bengal Chemical to-day".যখনি বেঙ্গল কেমিক্যাল আর্থিক অসুবিধায় পড়েছে, তাঁর কাছে গিয়েছি। তিনি টাকা দিয়েছেন। তাই তাঁর শেয়ার।"

তিনি সুস্থ সবল লোক দেখলে খুশী হতেন, আর দুর্বল লোক দেখলে ব্যথিত হতেন। তা শুধু বাঙ্গালীদের বেলায় নয়। কোকনদ কংগ্রেসে যাচ্ছেন খাদিপ্রদর্শনী উদ্বোধন করতে। গাড়ী বদল করে কামরায় উঠে চক্রবর্তী রাজগোপালাচারীকে দেখেই বলে ফেললেন, "Frail, fragile frame" রাজাজীও অমনি বললেন- "Leading the fourth failure"

বিজ্ঞানের নামে যা সব চলছে তা সবই যে যুক্তিসঙ্গত তা তিনি মনে করতেন না। একদিন সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে সকালবেলা তিনি নিমদাঁতন করছেন। মহাত্মা গান্ধীও তখন সোদপুরে। তিনি আচার্য রায়কে নিমদাঁতন করতে দেখে বললেন :- "You are using neem stick, but you manufacture tooth powder from the Bengal Chemical" আচার্য রায় সোজাসুজি বললেন : "That is meant for the fools we manufacture it, otherwise they would use foreign products"

তিনি নিজের জন্মগ্রামকে (খুলনা জিলায় রাড়ুলী) খুব ভালবাসতেন। একবার সেখানে রাজনৈতিক সম্মিলনী হবে। গ্রামবাসীরা তাঁর সাথে দেখা করেন। তিনি তাঁদের বললেন, আমার রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তবে আমার গ্রামে বহু গণ্যমান্য লোক আসবেন। তাঁদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির অসুবিধা হলে গ্রামের অসম্মান হবে– আমারও। অতএব এদিকে সুব্যবস্থার জন্য যা কিছু প্রয়োজন করতে প্রস্তুত আছি। করেছিলেনও। গঠনমূলক কাজের জন্য যখন কয়েকমাস সে গ্রামে ছিলাম তখন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খবর নিতেন। গ্রামের যাতে সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয় সেদিকে ছিল তাঁর চিন্তা।

শুধু এ গ্রামটি নয়, বাংলার সকল গ্রামই যাতে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পারে তাই ছিল

তাঁর ধ্যান। কাজেই তিনি ভালবাসতেন মহাত্মাজীর গঠনমূলক কার্যক্রম। সে কার্যক্রমের প্রসারকল্পে তিনি বৃদ্ধবয়সেও বাংলার প্রায় সব গঠনমূলক কর্মকেন্দ্রে যেয়ে কর্মীদিগকে উৎসাহ দিয়েছেন– সাধ্যতম আর্থিক সাহায্যও করেছেন। গঠনমূলক কর্মীদের তিনি ছিলেন একপ্রকার পিতৃস্থানীয়।

হে মহাপ্রাণ, তোমায় নমস্কার!

ACHARYA PRAFULLA CHANDRA

Padmaja Naidu

Acharya Prafulla Chandra Ray needs no introduction or words of praise The nobility, simplicity and forcefulness of his character his indomitable courage and patriotism and, above all, his dedication to the eradication of social and econoimic evils have always been a source of inspiration to our people

Whether as a scientist who laid the foundation for the advance of Chemistry in India or as educationist social reformer or promoter of industry Acharya Ray was a pioneer who has left his impact in every sphere he entered

The people of our country can never forget the debt they owe to this great man and they have already celebrated his birth centenary on August 2nd and paid their reverential homage to his memory The publication of the present souvenir volume by the University of Calcutta forms only a part of the programme of the Acharya Prafulla Chandra Birth Centenary Celebrations

This volume containing articles on various facets of the life and activities of Acharya Prafulla Chandra Ray will be worth preserving

Acharya Prafulla Chandra Ray : Birth Centenary Souvenir

স্বর্গীয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত

ভাই সত্যেন,

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের কিছু ঘটনাবলী আমার কাছে জানতে চেয়েছ, কিন্তু তাঁর জীবনের কাহিনী বর্ণনা করবার মত যোগ্যতা আমার কি আছে? বস্‌ওয়েলের মত জীবনচরিতকার হলে হয়তো ঠিকমত লিখতে পারতেন। তাঁর মত মহৎ লোকের মহত্ত্ব বুঝতে গেলে মহৎ হওয়া চাই; কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মানবের সে গুণও নেই, সে ক্ষমতাও নেই, তাছাড়া শরীরও ভেঙ্গেছে; কাজেই আমার সাধ্যমত কতকগুলি সত্য ঘটনা স্মরণ করে তোমাদের জানাচ্ছি।

তাঁর মহৎ জীবনের কথা অনেকে অনেকভাবে লিখে গেছেন, কিন্তু আমি সেদিকে যাব না। আমাদের মত সামান্য ছাত্রদের সঙ্গে তিনি কি ভাবে ঘনিষ্ঠতা করতেন, সে কথাই বলতে চাই। তাঁর পূণ্যজীবনের ঘটনাবলী আমার কাছে ইষ্টগুরুর মন্ত্রের মত চিরস্মরণীয়-- তবু ভয় হয়, হয়তো ঠিকভাবে বলতে পারবো না।

প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনাগুলি বলি। আমরা যে কয়জন সে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নাগারে কাজ করতাম (যথা-- রসিকলাল দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় প্রভৃতি), তাঁরা সকলেই জানেন যে, দিনগুলি কত আনন্দের ছিল এবং তখনকার ঘটনাগুলি কথায় যথাযথ বর্ণনা করা যায় না। প্রতিদিন নিয়মিত ক্লাশ নেবার পর আচার্যদেব গবেষণাগারে আসতেন। প্রথমেই বলবান ছেলেগুলির সঙ্গে কিছুক্ষণ মহানন্দে খেলাচ্ছলে মারামারি করে নিতেন। এটি তাঁর একটি বিশেষত্ব ছিল। প্রতি বছর যখন ছাত্রদের "কেমিক্যাল ডিনার' দিতেন, তখনও ঠিক এই রকম ছেলেমানুষী করতে দেখেছি। খেলা শেষ হলে প্রত্যেক ছাত্রের কাছে গিয়ে তার কাজের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জেনে নিতেন এবং কাজের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করে প্রত্যেক ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করতেন। গবেষণাগারে এমনভাবে ঘোরাঘুরি করতেন, যেন আমাদের চেয়েও বয়সে ছোট। যখন-তখন তাঁর গবেষণার উন্নতির বিবরণ জনসাধারণকে জানাতেন। অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন, তিনি নাম কেনবার জন্যে এসব করতেন, কিন্তু আসলে তা নয়। তিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজের হিসেব প্রথমে নিজে ভাল করে বুঝে নিতেন, পরে দেশবাসীকে তা জানিয়ে তাদের মতামত জানাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বাস্তবিক, আমার বিশ্বাস--তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়েই কাজ করতেন, "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"-- এই বাণী

তাঁর হৃদয়ে গাঁথা ছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন-বিভাগের গবেষণাগারে আমরা দস্তুরমত তাণ্ডব করতাম, আর তিনি আমাদের আনন্দে যোগ দিতেন। সে সময়ে কয়েকজন ছাত্রের বাড়ী থেকে খাবার আসতো, কিন্তু তারা সে খাবার দেখবার আগেই আমরা সবাই কাড়াকাড়ি করে খেয়ে ফেলতাম, তিনি দেখে হাসতেন। তখনকার একটি মজার ঘটনা বলছি। দুটি সমসাময়িক ছাত্রের মধ্যে একটি অতি বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট এবং দ্বিতীয়টি অতিশয় শীর্ণ ও খর্বকায় ছিল। প্রথম ছেলেটি একদিন এই ক্ষীণকায় ছেলেটির একটি যন্ত্র নিয়ে কাজে লাগিয়ে দিল। জানতে পেরে এই ছেলেটি খুব রেগে গিয়ে হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটিকে একেবারে মাথায় তুলে ফেললো এবং "আছাড় মারবো" বলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আমরা এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখে সবাই হৈ হৈ করে ওঠলাম। এমন সময় হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি, আচার্য রায় আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে খুব হাসছেন ও হাততালি দিচ্ছেন। শীর্ণ ছেলেটি তাঁকে দেখে তখন– কাঁচপোকা ও তেলাপোকায় কি তফাৎ দেখ– বলে বলবান ছেলেটিকে ধপ করে মাটিতে ফেলে ক্ষান্ত দিল।

এখন বলি– আমি তাঁর সঙ্গে অধুনা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে, সায়েন্স কলেজের পাশের বাড়ীতে কি ভাবে থাকতাম। তখন অবশ্য সায়েন্স কলেজের ভিত পত্তনও হয় নি। তিনি যদিও বহু অর্থ নানা ব্যাপারে ব্যয় করতেন এবং সৎকাজে মুক্তহস্তে দান করতেন, কিন্তু নিজের ব্যাপারে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। ঐ বাড়ীর দোতলার একটি ছোট ঘরে নিজে থাকতেন অতি সাধারণভাবে এবং আর একখানি ঘরে আমাকে থাকতে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন সকালে কেবল গবেষণার কথা আ লোচনা হতো। বিকেলে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফিরবার পথে তিনি কখনও বেঙ্গল কেমিক্যালে, কখনও বা গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতেন। তাঁর বাড়ী ফিরতে প্রায়ই রাত ন'টা বাজতো। আমার গবেষণার কাজ সেরে বাড়ী আসতে আরো রাত হতো। কিন্তু প্রতিদিন দেখতাম, আচার্যদেব উৎসুক চিত্তে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। তখন গবেষণার কথা একেবারেই জিজ্ঞাসা করতেন না। আমি উপযুক্ত আহার পেলাম কিনা এবং যথেষ্ট বিশ্রাম আরাম পাচ্ছি কিনা, কেবল সেই খবরই নিতেন। আমি কি খাই, না খাই সর্বদা নিজে এসে দেখে যেতেন। আমি সে সময়ে বোধহয় ভয়ে একটু কম করেই খেতাম। তিনি আবার রসিকতা করে সে কথা কলেজের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে গল্প করতেন; সবাই হাসতো, আর আমিও তাতে সানন্দে যোগ দিতাম।

তাঁর অদ্ভুত মনের বল দেখে আমরা ছাত্রেরা অবাক হয়ে যেতাম। তিনি কাউকেই গ্রাহ্য করতেন না। যে কাজ সৎ এবং উচিত বিবেচনা করতেন, সে কাজ যে ভাবেই হোক, ঠিক করে ফেলতেন। এই সম্পর্কে দু একটা ঘটনা বলবো। আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে

কাজে লাগাবার সময় নানাদিক দিয়ে ঘোরতর আপত্তি হয়। নিজের সহকর্মী এবং উপরওয়ালাদের সঙ্গে এই নিয়ে বহু মতান্তর হয়, কিন্তু তিনি কারুর কথাই গ্রাহ্য করেন নি। সকলকে ক্রমাগত বলতেন, পরাধীন জাতি বলেই এসব কথা বলতে সাহস করছ, স্বাধীন দেশ হলে এমন কথা উঠতোই না। কার ভিতরে কি পদার্থ আছে, আমি জানি এবং সেইটাই গড়ে যেতে চাই। তারপর যেদিন আমার হাতে Methyl ammonium nitrite crystallise করলো, সেদিন তিনি ছোট ছেলের মত আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে লাগলেন। কয়েক দিন ধরে পড়াবার সময় কেবল সেই কথাই বলে চললেন। শেষে আমি নিজে পর্যন্ত ভাবলাম যে, ভদ্রলোক কি ক্ষেপে গেলেন নাকি!

ঐ সময়ের আর একটি ঘটনা বলি। প্রফুল্লচন্দ্রের বাড়ীর উল্টো দিকে গ্রীয়ার পার্কে সে বছর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেদিন সকালে আর আমার সঙ্গে খাতাপত্র নিয়ে বসলেন না। দেখলাম তিনি একটি টুইলের সার্ট ও খাটো ধুতি পরে কোথায় বেরোচ্ছেন। আমি তাঁর সঙ্গে সর্বদাই স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বলতাম, তাই জিজ্ঞাসা করলাম– এত সকালে কোথায় যাচ্ছেন? কংগ্রেস অধিবেশনে যাচ্ছেন শুনে একটু ভয় হলো। আমার তখন অপরিণত বুদ্ধি, তাই শশব্যস্তে তাঁকে বারণ করলাম। বোঝালাম, আপনার যাওয়া বোধহয় উচিত হবে না, কারণ আপনি সরকারী চাকুরে, আর ওখানে প্রচুর পুলিশের গোয়েন্দা থাকবে। উত্তরে তিনি বললেন "জিতেন, কেন মিছিমিছি ভাবছ, বল তো কার্ডখানা গোয়েন্দাদের ডেকে দিয়ে দিই, কিন্তু আমি যাব ঠিকই।" তিনি চলে গেলেন। আমি দস্তুরমত চিন্তিত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম, এ কি কাণ্ড করছেন– মনে করে। বাইরে থেকেই দেখতে পেলাম, ভিতরে যাওয়া মাত্রই কংগ্রেসের দলপতিরা তাঁকে পরম সমাদরে মঞ্চে বসিয়ে দিলেন। বুঝলাম, তিনি তাঁদের বিশেষ পরিচিত। আচার্যদেব অধিবেশনের শেষ পর্যন্ত থাকলেন, তবে কি বলেছিলেন জানতে পারি নি, কারণ ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, সেদিন আর গবেষণার কাজ করা হয় নি। আমরা ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম যে, উনি দেখছি আগে দেশের সেবক পরে বৈজ্ঞানিক। নিজেও সেই কথাই বলতেন। মাঝে মাঝে বলতেন– আমি যদি রসায়ন না পড়ে ইতিহাস পড়তাম, তাহলে আমার অনেক ভাল হতো।

আর একটি ঘটনা বেশ মনে পড়ছে। একদিন হঠাৎ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় আচার্যদেবের বাড়ীতে এসে উপস্থিত। প্রফুল্লচন্দ্র তখন শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখে আনন্দে উত্তেজিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন। কোলাকুলির পালা খানিকক্ষণ ধরে চললো, দুজনেই সমান উল্লসিত। আচার্যদেব বললেন, "তোমার সঙ্গে একটি বিশেষ দরকারী কথা ছিল।" তারপর সংস্কৃত বেদ গ্রন্থ বের করে মালব্যজীকে দেখালেন যে, পুরাকালে আর্যেরা গোমাংস অতি উপাদেয় বলে ভক্ষণ করতেন। অতিথি

ঘরে এলে তখনকার গৃহস্বামীরা অতিথির আপ্যায়নের জন্যে গোবৎস হত্যা করে সেই মাংস রান্না করে দিতেন। এই কারণে অতিথিকে "গোঘ্ন" বলা হতো।

অতএব হিন্দুদের এখন গোহত্যায় এত আপত্তি কেন? এরপর প্রাচীন হিন্দুদের রসায়নতত্ত্ব কতদিনের পুরাতন, সে সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগলো। সেদিনের আলোচনাসমূহ হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যে শুধু রসায়ন-চর্চা করতেন তা নয়, বহু শাস্ত্র আলোচনা ও অধ্যয়ন করতেন এবং সমাজ সংস্কারের দিকে সর্বদাই তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল।

আগেই বলেছি, তিনি নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন, সাজসজ্জার দিকে কোন নজর ছিল না। তাই নিয়ে দু-একবার যে মুস্কিলে পড়েন নি এমন নয়, তবু লোকলজ্জা বা লোকভয় বলতে কিছু ছিল না। একবার রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। তার কিছুদিন আগে একদিন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একটি আলোচনা সভায় তাঁর আসবার কথা। National Council of Education গড়া সম্পর্কিত সভা বলে সেদিন, আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। সতীশবাবু গোয়েন্দাদের উৎপাতের জন্যে সবাইকে উপরে যেতে দিতেন না। একটি শ্লেটে নাম লিখে দরোয়ানকে দিতে হতো। দরোয়ান তাঁর অনুমতি পেলে তবে উপরে যেতে দিত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেদিন একটি সামান্য ধুতি ও সার্ট পরে এসে উপস্থিত, পায়ে অতি জীর্ণ চটিজুতা। দারোয়ান কিছুতেই তাঁকে উপরে যেতে দেবে না, অতিকষ্টে শ্লেটে নাম লিখে তাকে উপরে পাঠালেন। নাম দেখে এবং দরোয়ানের মুখে বর্ণনা শুনে সতীশবাবু ফেরৎ দিলেন। শেষে হঠাৎ কি মনে হওয়ায় নীচে নেমে এসে দেখেন সত্যই প্রফুল্লচন্দ্র অপেক্ষা করছেন। তখন শশব্যস্তে তাঁকে উপরে নিয়ে গেলেন। সেদিনের সভায় প্রফুল্লচন্দ্র জাতীয়তা, জাতীয় শিক্ষা এবং বাংলাভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাজসাহীর সম্মেলনেও আবার সেই কথাই বললেন, সবগুলিই অতি দুঃখের বর্ণনা, মনের আক্ষেপ।

আর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এটি হয়তো অনেকে শুনতে পছন্দ করবেন। ১৯২৬ সালে আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন আচার্যদেব একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সভায় উপস্থিত থাকবার জন্য সেখানে যান। যে কয়টি দিন ওখানে ছিলেন, প্রতিদিন আমি ও আমার জনৈক বন্ধু শ্রীশচীন সিংহ সন্ধ্যার পর তাঁর কাছে যেতাম। কার্যান্তে ফিরে এসে তিনি নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন। তার মধ্যে প্রধান ছিল– দেশের পরাধীনতা এবং ভবিষ্যৎ। বিদেশী সরকারের কাছে বারবার সাহায্য চেয়ে বিফল মনোরথ হয়ে তাঁর শেষে এই ধারণা হয়েছিল যে, পরাধীন থাকতে দেশে শিল্প বা বাণিজ্য গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

তিনি প্রতিদিন বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন, কিন্তু অতি পুরাতন জীর্ণ একটি সুট পরে। আমরা তাঁকে বারবার বেশ পরিবর্তনের কথা বলতাম। কয়েকদিন উপর্যুপরি এই রকম বলবার পর শেষে উত্তর দিলেন— "দেখ, তোমরা যদি রোজ এ রকম বিরক্ত কর, তাহলে আমিও তোমাদের জব্দ করবো। আমি তোমাদের অনেক আগে দেশে ফিরবো আর সকলের কাছে বলবো, তোমরা দু'জনে মেম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ।" ব্যস্, এরপর আমাদের মুখ বন্ধ। মনে সত্য সত্যই একটু ভয়ও হলো যে রকম মুখ-আলগা লোক, কি জানি কথাচ্ছলে কি বলে ফেলেন! অতি সাধারণ দীনহীন বেশে যে কোন সমাজে যেতে এবং নিঃসঙ্কোচে মিশতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত বোধ করতেন না, এমনই নির্ভীক, নির্লিপ্ত পুরুষ ছিলেন তিনি!

যখন তিনি জীবনে শেষপ্রান্তে, তখন দেখা করতে গিয়ে দেখি— স্মরণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি সবই হারিয়েছেন। প্রথমে কথা বলায় ঠিক চিনতে পারলেন না, পরে আমার নাম বলায় খুব জোরে 'ও' বলে উঠলেন। খানিকক্ষণ হেসে নিয়ে তারপর বিষণ্ণভাবে বললেন— "দেখ তোমাকে গ্রামের কাজে যেতে হবে।" আমি বললাম "রাসায়নিক হয়ে আর বেশী কি করতে পারি, Essential oil নিয়ে গবেষণা করছি, ইচ্ছা আছে ঐটিকে কুটির শিল্প করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া।" এই কথায় বিশেষ আনন্দিত হলেন এবং আমাকে বারবার উৎসাহিত করতে লাগলেন। গ্রামসেবা তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। সবাইকে তিনি এই কাজে অনুপ্রাণিত করতেন।

আচার্যদেব কত বড় নির্ভীক, ত্যাগী, তেজস্বী, কর্মবীর ছিলেন, সে আমি সামান্য কথায় কি করে বোঝাব! Chemical Service -এ তাঁর রচনাগুলি যাঁরা পড়েছেন এবং উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা হয়তো তাঁকে কতকটা জেনেছেন। পৃথিবীর সৃষ্টির আরম্ভ থেকে অনেক লোক দেশের জন্য অনেক ত্যাগ করেছেন, স্বদেশের সেবায় অনেকে রক্ত, অনেকে প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু মানুষের কাছে দেহ ও প্রাণের চেয়েও বড় হচ্ছে মান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেই মানকেও দেশের কাজের কাছে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। আরো কত ছোটখাটো ঘটনা মনে আসছে, কিন্তু সব কথা এই অল্প সময়ে আর রোগশয্যায় শুয়ে বলে যেতে পারছি না। জানি না কতটা সঠিকভাবে বলে গেলাম। সর্বশেষে এই জন্মশতবার্ষিকীতে মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংস্পর্শে

আব্দুস সাত্তার

হিজলী জেল থেকে বেরিয়ে ১৯৩৩ সালে সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছি। কলকাতার ১২নং রামলোচন মল্লিক স্ট্রীটে থাকতাম। সেই সময় সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে চিঠি লিখতাম। তারিখটা মনে নাই- সকালবেলাকার ডাকে একটি পোস্টকার্ড পেলাম। পোস্টকার্ডটির উপরে লেখা-''সায়েন্স কলেজ, ৯১নং আপার সার্কুলার রোড''– তলায় পি. সি. রায়। চিঠিখানা পেয়ে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হলাম; প্রশ্ন হতে লাগলো--এটা কি সত্যই আচার্য পি. সি. রায়ের পত্র? তিনি আমাকে কেন চিঠি লিখতে গেলেন? মনটা সত্যই তোলপাড় হচ্ছিল এই ভেবে–সেদিনের এক নগণ্য ছাত্রের কাছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পত্র। আমার ঠিকানাটা, পোস্টকার্ডটা পড়লাম–আচার্য লিখেছেন ইংরেজিতে--''তোমার লিখিত 'সম্পাদকের নিকট পত্র' পড়লাম এবং আমি তোমার সঙ্গে একমত। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করলে সুখী হবো।'' আমি তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলাম কবে কোন্ সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে সায়েন্স কলেজে উপস্থিত হলাম। আমার পরিচয় হিসাবে আচার্য রায়ের আমাকে লেখা চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন। আচার্য আমাকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন– ''তুমি, আব্দুস সাত্তার–এত ছেলেমানুষ! তুমি কর কি?'' আমি বললাম আমি বললাম– বি. এ. তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। ''তোমার বয়স কত?'' আমি বললাম- ২১ বৎসর। বললেন– ''একটু বেশী বয়স হয়ে যায় নি'' আমি বললাম– আমি তো পড়া বন্ধ করে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম এবং তিনবার জেল ঘুরেও, এসেছি। আইন–অমান্য আন্দোলনেযোগদান ও জেল যাওয়ার সংবাদে আচার্য বিশেষভাবে আনন্দিত হলেন এবং তিনি আমাকে কিল-ঘুষি মারতে লাগলেন; শুনেছিলাম আচার্যের এইটাই নাকি স্নেহ প্রকাশের ভঙ্গী ছিল। বললেন– ''তুমি বড় রোগা, তোমায় কোথায় মারবো? তুমি বর্ধমানের লোক–ম্যালেরিয়ায় ভোগো, বোধ হয়''– এই বলে তিনি ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কয়েকটি উপদেশ দিলেন। আমি চলে আসবার সময় বললেন- ''তুমি মাঝে মাঝে এসো– এই পোস্টকার্ডটাই হবে তোমার ছাড়পত্র।''

আমি কলকাতায় বি এ. পড়াকালীন মাঝে মাঝে আচার্য সন্দর্শনে গেছি। তিনি বাঙ্গালী যুবকদের ব্যবসা-বাণিজ্য করবার উপদেশ দিতেন। একদিন আমাকে বললেন– তুমি নিশ্চয়ই চাকরি চাওনা।'' আমি বললাম– না। তিনি আমাকে বললেন– ''জানো, বড়বাজারের একজন ভাটিয়া, মাড়োয়ারি ঘন্টায় কত উপার্জন করে? তোমরা হাইকোর্টের

জর্জিয়াতে করে একমাসে যা পাও, তার চেয়ে ঢের-ঢের, ঢের বেশী।" আর একদিনের কথা বলি: সেদিনকার কথা হল—তখনকার শিক্ষাব্যবস্থার। বললেন— "সেদিন একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম মীরাট কোথায়? সে আমাকে কি বললো জান? বললে-'স্যার, আমার তো ভূগোল নাই, ওটা আমার পাঠ্য-বিষয় নয়।" আচার্য বললেন— "শোন শোন কথা শোন। ভূগোল তার পাঠ্য-বিষয় নয়। আরে— ম্যাট্রিকটা তো এমনিই হওয়া চাই যেটা পড়লে সব বিষয়েই প্রাথমিক জ্ঞানটা হয়—এমনকি বিজ্ঞানের।" এমনি করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য হয়েছিল। কয়েকটি দিনের কথা আমার মনের মণি-কোঠায় আজও জ্বলজ্বল করছে।

The Great Loss

"I have heard with the deepest regret of the death of Sir P C Ray C I E. which took place last evening at the University College of Science A great scientist a distinguished educationist and a noted philanthropist his death will be mourned by all sections of his countrymen and I join with them in expressing my sorrow at the great loss which the country has sustained "

HIS EXCELLENCY MR. R. G. CASEY

Scientist, Patriot and Great Man

"My homage to the memory of a great scientist a great patriot and a great man "

SAROJINI NAIDU

A TRIBUTE

Prof. HUMAYUN KABIR

The passing away of Acharyya Prafulla Chandra Ray marks the closing of an epoch in Indian history He belonged to the generation of giants thrown up by Bengal in the middle of the last century With Rabindranath Tagore and Jagadish Bose, Chittaranjan Das and Ashutosh Mookerjee, Syed Ameer Ali and Abdul Rasul Acharyya Prafulla Chandra was one of those rare figures who combined great intellectual qualities with a deep nobality of character. It is in fact this combination of spiritual integrity and intellectual vigour that lifted Acharyya Prafulla Chandra and his great contemporaries into figures of such historic importance and prominence

Acharyya Prafulla chandra was a pioneer among Indian scientists and his early reputation was built up by his achievements in the scientific sphere He was, however much more than a mere scientist He was the creator of a new school of chemistry in modern India His intellectual interests were wide and varied and ranged from investigation into the property of matter to necessities of the human heart He followed up his scientific researches by an enquiry into the growth and development of science in ancient India and displayed in these enquiries a rare historical acumen and scientific detachment of spirit Not content with this, his old age was taken up with a study of Shakespeare and his portrayal of the infinite variety of human character and feeling Acharyya Ray believed, and acted according to his belief, that imagination and analysis are equally important in all spheres of human life and thought--- be it science, poetry or philosophy THIS combination of imagination and analysis explains Acharyya Prafulla Chandra's devotion and life-long service tohe cause of Indian humanity He was one of the pioneers of Indian industry and long before the professional businessman realised, he saw that the foundation of the chemical industries was a basic factor for Indian prosperity His exhortations to the Bengalees to take to commerce and industry must be understood in the same light His superhuman labours for the relief of the suffering and distressed sprang from his deep imaginative sympathy with the fate of the Indian masses The one over-riding

passion of his life was the improvement of the condition of the toiling millions of India, and the restoration to them of a decent and human standard of life Acharya Prafulla Chandra was a patriot in the great sense of the term. His burning love for truth expressed itself as a burning love for liberty. With a scientist's intuitive grasp of truth he saw that life cannot flourish without freedom Death and slavery were for him synonymous term, and he fought against bondage and falsehood in every sphere His greatest gift to his people was a life dedicated to the cause of truth, freedom and love Generations will pass away but we shall not see his like again.

The Calcutta Municipal Gazette. (Sir P.C. Ray Memorial supplement) : 24th June 1944

Tower Of Strength

"For many decades he had been a tower of strength to all who have been connected with chemical and scientific research in this country and his death is a grievous loss specially at a time when steps are being taken to place scientific and industrial researches throughout India on a well-planned basis."

SIR AZIZUL HUQ

Blessings of His Spirit

"India has lost in Sir P C Ray one of her great sons but he is leaving behind him his treasuries of knowledge, his wonderful example and blessings of his spirit to animate and guide those who follow his path "

SIR JOGENDRA SINGH

গুরু-শিষ্য প্রসঙ্গ

ডঃ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইছামতী নদী তখন ছিল ভয়ঙ্করী। একপারে বর্দ্ধিষ্ণু টাকী গ্রাম। মহাকুমার শহরকে হার মানায়। নামকরা জমিদারদের বাস। ওপার পারে টাউন শ্রীপুর। এখানকার জমিদারেরাও ধনী। তবে টাকীর জমিদারদের সাথে পাল্লা দেওয়ার মত ধনী নন। টাউন শ্রীপুর তখন খুলনা জেলার অন্তর্গত আর টাকী ২৪ পরগণার অধীন।

সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে টাকীতে সরকারী হাইস্কুল স্থাপিত হয়। খুলনার দক্ষিণাংশে টাকী স্কুল সবেধন নীলমণি। আর কোন হাইস্কুল ছিল না। বড়লোকের ছেলেরা কলকাতায় অথবা অন্যত্র হাইস্কুলে পড়ত। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা মাইনর স্কুলে (ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) পড়ার পর পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হত।

টাউন শ্রীপুরের শ্রীশরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী তখন হাইকোর্টের উকিল। আচার্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান। দেশদরদী। আচার্য রায়ের অনুরোধে ১৯১৫ সালে টাউন শ্রীপুরে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে প্রাণ হাতে করে বর্ষার উন্মত্ত নদী পার হয়ে আর এপারের ছেলেদের টাকী স্কুলে পড়তে যেতে হত না। কিন্তু হাইস্কুলের ছেলে মেলে কই? অনুন্নত শ্রেণীর বাস সারা অঞ্চল জুড়ে। সবাই তো চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত। পড়াশুনায় আদৌ আগ্রহ নেই। তাই আচার্যদেবের পরামর্শে শরৎবাবু একটি বিরাট আটচালা ঘর তৈরী করলেন। চারিদিকে বারান্দা। অনুন্নত শ্রেণীর ছেলেরা থাকবে এখানে। হাইস্কুলে পড়বে। আমি ১৯১৭ সালে এই স্কুলে সম্ভবতঃ নীচের ক্লাসে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম।

আচার্যদেব যখন এখানে আসতেন তখন এই মেসবাড়ীর একটি ঘরে দু'চার দিন থাকতেন আর ছেলেদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতেন। দেখতাম তিনি এইসব ছেলেদের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করছেন- বিজ্ঞান পড়তে হবে কেন আর কুসংস্কার থাকলে জীবনের উন্নতি হয় না কেন। আমি তখন ছোট; তবে আমাদের লোভ হত কবে আমরাও তাঁর কাছে এমনি করে গল্প শুনব।

আচার্যদেব যখন আসতেন তখন সাথে আনতেন বিস্কুট। অকাতরে সব ছেলেদের বিস্কুট দিতেন খেতে। একদিন আমাকে যখন বিস্কুট দিতে গেলেন তখন আমি বিস্কুট নিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে চাপড় মেরে প্রশ্ন করলেন, "তুমি বুঝি বাওনের ছেলে?" উত্তরে বললাম– "হ্যাঁ"।

পর দিনের ঘটনা। আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে আমায় বললেন "চৌলি পরে এক উড়ে

বাওন আর নুচি পরে এক মুসলমান বাবুর্চি আলাদাভাবে ভাত রান্না করে থালায় করে তোকে ভাত খেতে দিলে। তুই দেখিসনি কে কোন থালায় ভাত দিয়েছে। ভাতের থালার রান্না ভাত দেখে চিনতে পারবি কোন ভাত কে রান্না করেছে? কোনটি অস্পৃশ্য আর কোনটি নয়?'' আমি প্রশ্নটি শুনে হকচকিয়ে যাই। উত্তর দিতে পারিনি। চুপ করেছিলাম। কিন্তু যত বড় হয়েছি ততই এ প্রশ্ন দিন দিন আমার মনে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে।

ব্রাহ্মণের ছেলে। যথাসময়ে পৈতে হ'ল। গলার পৈতে বিঁধতে লাগল আমার মনকে। ক'দিন বাদে ছিঁড়ে ফেললাম এই পৈতে গলা থেকে। মনের ভার লাঘব হ'ল। সমাজে যারা অচ্ছুত বলে পরিচিত এবার তাদের সাথে মন খুলে মিশতে পারলাম। উপলব্ধি করলাম এবার তাহলে আচার্যদেবের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারব। ইতিমধ্যে আত্মীয়-স্বজন ব্রাহ্মণেরা যখন আমাকে ওদের সমাজে অপাংক্তেয় মনে করতে লাগল তখন আরও স্থির নিশ্চিত হলাম যে আমি মনের দিক থেকে অস্পৃশ্যতাকে ঘৃণা করতে শিখেছি। মনে মনে গর্ব অনুভব করলাম যে আমি আচার্যদেবের আদর্শকে অনুসরণ করতে শিখেছি।

তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। আচার্যদেব এসেছেন স্কুল পরিদর্শনে। গেলাম তাঁর সাথে দেখা করতে। আমার সংকল্পের কথা শুনে সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, ''তুই তাহলে বাওনদের মধ্যে শূদ্র হয়ে গেলি। এতে শাপে বর হ'ল।''

সত্যই শাপে বর হয়েছিল। চাষীদের সাথে মিলে চাষ করতে ভাল লাগত। কায়িক শ্রম করে আনন্দ পেতাম—আদৌ মনে হত না যে আমি এর জন্য ছোট হয়ে গেছি। পরের বার আচার্যদেব এলেন। শুনলেন আমার কথা। সেই সজোরে পিঠের চড়-সারাজীবন মনে রাখবার মত স্নেহের স্পর্শ। মুখ ভরা হাসি নিয়ে সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ''বাওনের ঘরে জন্মে যদি চাষী হতে পারিস তবে তোর বুদ্ধি ওদের সাথে মিশে দারুণ কাণ্ড ঘটে যাবে। যারা তোকে সমাজ ছাড়া করেছে তারা একদিন তোকে মাথায় নিয়ে নাচবে।''

গুরুর নির্দেশে মনে প্রাণে চাষী হলাম। পড়াশুনো আর করলাম না—এন্ট্রান্স (বর্তমানে মাধ্যমিক) পর্যন্ত পড়েই বিদ্যামন্দির ত্যাগ করলাম। নীল আকাশের তলায় এসে নূতন পাঠ শুরু করলাম। চাষই ধ্যান, চাষই জ্ঞান আর চাষই সাধনা হয়ে গেল। চাষের জমি আমার ল্যাবরেটরী হ'ল। আজ চাষবাসের ক্ষেত্রে হাতেকলমে গবেষণা করে সমাজের যতটুকু কল্যাণ করতে পেরেছি তার জন্য আচার্যদেবকে জানাই শত প্রণাম।

আমি বোধহয় তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। সেইসময় আমাদের স্কুলে এক নূতন এসিষ্ট্যাণ্ট টিচার এলেন। তাঁর নাম শ্যামাপদ চক্রবর্তী। ভীষণ রবীন্দ্র বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বলতেন- প্রকৃত কবি হলেন ভারতচন্দ্র, নবীনচন্দ্র আর মধুসূদন।

যখনই আচার্যদেব শরৎচন্দ্রের মেসবাড়ীতে ৩/৪ দিন থাকতেন তখনই দেখা যেতো একটি ছিপছিপে ছেলে আর তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করছেন। তখন আর কেউ সেখানে যেতে পারত না। পরে জেনেছি এঁর নাম নিত্যানন্দ সেনগুপ্ত। আচার্যদেবের প্রিয় ছাত্র। জার্মানী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আচার্যদেবও একপ্রকার সম্মতি দিয়েছেন। ইংরাজী ভাল জানেন। ইতিমধ্যে জার্মান এবং ফ্রেঞ্চ ভাষাও শিখেছেন।

একদিন এঁর সাথে শ্যামাপদ চক্রবর্তীর তিন রাত ধরে তর্ক হয়। রবীন্দ্রনাথ আদৌ কবি কিনা তাই নিয়ে তর্ক। শেষ পর্যন্ত শ্যামাপদবাবু হার মানলেন। ভবিষ্যতে এই শ্যামাপদবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক হন এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মে। এই ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে নিত্যানন্দের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আচার্যদেবের সাথে নিত্যানন্দের গোপন আলোচনা কি বিষয় নিয়ে হয়েছিল তা অল্পদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল। নিত্যানন্দ জার্মানী গেলেন না। আচার্যদেবের নির্দেশে অনুন্নতদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। মহান ব্রত। নিরলস পরিশ্রম। সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলে খুলনা জেলার দুরমুজখালীতে প্রথমে প্রাইমারী স্কুল পরে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দেশ ভাগের পর তিনি এদেশে এসে ২৪ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত সাহেবখালীতে একটি হাইস্কুল স্থাপন করেন। পরে তিনি আচার্যদেবের নামে এই স্কুলের নামকরণ করতে চান। আচার্যদেব নিত্যানন্দের নামেই স্কুলের নাম স্থির করে দেন। অনুন্নত শ্রেণীর বহু ছাত্র এই স্কুল থেকে পাশ করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলে জ্ঞানের প্রদীপ তিনিই প্রথমে জ্বালেন।

আজকের দিনের যুবকেরা অনুন্নত সমাজের মাঝে শিক্ষাবিস্তারের সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না। জার্মানী গিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা করে খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিক হওয়ার মোহ ত্যাগ করে এমনিতর সমাজসেবায় আত্মবলিদান যে কতবড় ত্যাগ ও আদর্শবোধের পরিচায়ক তা তাদের পক্ষে বোঝাও খুবই কষ্টকর। নিত্যানন্দের মত নিঃস্বার্থ মানবদরদী সমাজ সংস্কারক আজ একান্তই দুর্লভ। একমাত্র যোগ্য গুরু আর উপযুক্ত শিষ্যের মিলনে এরূপ মহৎ কর্ম হওয়া সম্ভব।

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্র

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রে রায় রাজনীতিক ছিলেন না। কিন্তু দেশ যখনই কোনও সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, তখনই তিনি জনস্বার্থ রক্ষাকল্পে নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং পরিস্থিতির সমাধানে অগ্রণী হইয়াছেন। জনসাধারণের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে কয়েক বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলে কংগ্রেস না-গ্রহণ না বর্জন নীতি গ্রহণ করায় আচার্য রায় মুক্তকণ্ঠে ঐ নীতি ভ্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে আচার্য রায় দেশের বিভিন্ন স্থলের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯৩৪ সালের ১৮ই ও ১৯ শে আগস্ট কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরীতে ঐ সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

অর্গানাইজিং কমিটির সভাপতিরূপে আচার্য রায় তাঁহার অভিভাষণে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে,—"হোয়াইট পেপার" বর্ণিত প্রতিক্রিয়াপন্থী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি সংগ্রাম-ধ্বনি তুলিয়া থাকেন; কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহারা নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিতেছেন। এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত চিরদিনের জন্য ভারতবাসীকে বিরামহীন সংগ্রামরত দুইটি দলে বিভক্ত করিবে।"

এই সম্মেলনের ফলে 'কংগ্রেস জাতীয় দল' গঠিত হয়; এই দল সাফল্যের সহিত কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে এবং বাংলার সমস্ত আসন দখল করিতে সমর্থ হয়। বাংলার জনসাধারণ যে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে এতদ্বারা সেই সঙ্কল্পই প্রকাশ পায়। তদবধি আচার্য রায় কংগ্রেস জাতীর দলের বন্ধু ও পরিচালক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৩৯ সালের ২৭শে আগস্ট আর একটি নিখিল ভারত বাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মেলনের অধিবেশন হয়। আচার্য রায় এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বক্তৃতা প্রসঙ্গে আচার্য রায় বলেন,—

"দুঃখ ও বিরক্তির মিশ্র মনোভাব লইয়া আজ আমি এই সম্মেলনে বক্তৃতা করিতেছি। আমার দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের রাজনৈতিক জীবনের এক দিকে সাম্প্রদায়িক কোলাহল ও অত্যধিক স্বার্থপূর্ণ মনোভাব প্রকট হইতেছে; আমার বিরক্তির কারণ এই যে, আমাদের রাজনৈতিক জীবনের ঘৃণিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যাধি সম্পর্কে ভারতের প্রতি কর্তব্য পালন সম্বন্ধে দিল্লীর ও হোয়াইট হলের কর্তৃপক্ষের মতিগতি আছে বলিয়া

মনে হইতেছে না। আমি বিশেষ করিয়া আমার সেই সকল স্বদেশবাসীর জন্য দুঃখিত যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের আপাত-মনোহর যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল বিরোধী নীতির সহিত আপোষ রফা করিতে অগ্রসর হন। কারণ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িক নীতি প্রবিষ্ট হওয়ায় মীমাংসার যাবতীয় সম্ভাবনা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। তাঁহাদের 'না-গ্রহণ না-বর্জন' নীতি নিঃসংশয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূটনীতির সহিত সহযোগিতা করিয়া বিভেদ, মনোমালিন্য এবং বিদ্বেষের বিভীষণ দৃশ্য প্রকট করিতেছে। জগতের চক্ষে ভারতের মর্যাদাহানির জন্যই সুকৌশলে উহা উদ্ভাবিত হইয়াছে।" পরবর্তী ঘটনাসমূহ এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

অভিভাষণের উপসংহারে আচার্য রায় বলেন,– "গত আড়াই বৎসর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত কার্যকরী হইয়াছে। উহা যে যথার্থই অনৈক্যের বীজ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার ফলে আইন সভায় বিভিন্ন প্রকারের আইন এবং এই প্রদেশের স্বার্থহানিকর ও বিপদজনক মৌলিক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি আমি হতাশ হই নাই। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, পরিশেষে ন্যায়েরই জয় হইবে।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জনসেবায় যোগদানের ইহাই একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে। ১৯৩৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক যখন একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন ইহা দ্বারা এই প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে সমূহ অসুবিধা সৃষ্টির আশঙ্কা করিয়া আচার্য রায় ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য এলবার্ট হলে যে জনসভায় আয়োজন হয় তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তদুপরি উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সুরু হয়, তিনি তাহার পুরোবর্তী হন। ইহাতে আকাঙ্খিত ফল ফলে ও উক্ত প্রস্তাব আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

১৯৪০ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত কুখ্যাত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদেও তিনি অগ্রবর্তী হন এবং ১৯৪০ সালের ২১শে ও ২২শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বঙ্গীর মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি উক্ত বিলের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়সমূহের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন। তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলেন, – "এই বিল রচনায় বাঙ্গলার শিক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয় নাই ; বস্তুতঃ এই বিলটি রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার সহিত শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই। এই বিলের ব্যবস্থাসমূহও অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ বিলটিকে সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সিলেক্ট কমিটির পক্ষে ঐ সকল প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার বিশেষ

কোন উন্নতি সাধন সম্ভব নহে। সুতরাং ঐ বিলটি প্রত্যাহার করাই উচিত. অন্যথা এই প্রদেশে অত্যন্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মী হিসাবে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে তাহা হইতে আমি বলিতে পারি. এই বিলটি দূরভিসন্ধিমূলক ও অনিষ্টকর । এই বিলটির দ্বারা কাহারও কোন উপকার হইবে না. এমন কি ইহা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরও কোন কাজে আসিবে না । স্পর্শকাতর চারাগাছের ন্যায় মৈত্রীর মুক্ত আবহাওয়াতেই শিক্ষার বিস্তার হইয়া থাকে এবং জাতীয় ঐক্যই শিক্ষার মূল ।"

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে সিলেক্ট কমিটি কতৃর্ক মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় । আচার্য রায় সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে এই রিপোর্টের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন ও ইহার প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়সমূহের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন– " বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদের সুনির্দিষ্ট অভিমত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের আদৌ উন্নতি হয় নাই । এবং বহু বিষয়ে উক্ত বিল পূর্বের চেয়ে ক্ষতিকারক হইয়াছে । আপাতদৃষ্টিতে কমিটি কতৃর্ক উক্ত বিলের সামান্য উন্নতি হইলেও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে. ইহাতে কোন সারবত্তা নাই । সুতরাং পরিষদ পুর্নবার উক্ত বিলটি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করিতেছে ইহা প্রত্যাহৃত না হইলে এই প্রদেশের জনবিক্ষোভ বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয় পড়িবে।"

ভারতের কল্যাণ ও উন্নতি জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যেরূপ তাগিদ অনুভব করিয়াছেন. স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সেইরূপ অনুভব করিতে পরিয়াছেন এবং স্বীয় অনুভূতিকে তিনি যেমন সাহসের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন. সেইরূপ সাহসী ব্যক্তির সংখ্যা আরও স্বল্প ।

এইবার যোগশয্যা হইতে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন. তাহাও সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছে ।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা: ৪ঠা আষাঢ়. রবিবার. ১৩৫১ (ইং ১৮ই জুন ১৯৪৪)

His Love For The Common Man

Acharyya P. C. Ray was undoubtedly a great scientist and a great pioneer of industries but there are in India to-day others as great. But what was unique in him was his great and selfless love for the common man and for his country.

RAJSHEKHAR BOSE

আচার্যদেব

নদীয়াবিহারী অধিকারী

আমি আচার্যদেবকে প্রথম দেখি ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তিনি কোন কারণে পাবনায় গিয়েছিলেন। শুনেছিলাম পাবনা কলেজের নতুন Building উদ্বোধন করবেন। সেখানে Physics Chemistry ইত্যাদি পড়ানো হবে। নতুন হল-এ আচার্যদেব বক্তৃতা দেবেন। যদিও সেটা আমার জানার কথা নয় তবুও ঐ কলেজের মাঠে আমরা বেড়াতে যেতাম। আমার বাড়ি থেকে ৩/৪ মিঃ এর পথ। আমরা প্রথমে গ্যালারীতে গিয়ে বসলাম। আচার্যদেব বক্তৃতার আগে কতকগুলো বৈজ্ঞানিক Jugglery দেখালেন। যেমন Sealed tube -এর মাথা কেটে ঝাঁকানি দিলে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসছে। বাহিরের হাওয়ার সংস্পর্শে আগুন জ্বলে উঠছে। এইরকম কিছু ঘটনা দেখে রসায়নশাস্ত্র সম্পর্কে মনের মধ্যে একটু আলোড়ন হ'ল। ইচ্ছা দানা বেঁধে উঠল। সেই ১৯২১ সাল থেকেই পাবনা কলেজে Science পড়ানো শুরু হল। আমি সে বছর 1st Div -এ ম্যাট্রিক পাস করলাম। পরে Intermediate Science- এ Physics, Chemistry এবং Mathematics নিয়ে I Sc পাস করলাম। Physics -এ 80% এর উপর নম্বর পেলাম কিন্তু Chemistry - তে 72% নম্বর পেলাম তবুও রাজশাহী কলেজে Chemistry -তে Honours নিয়ে B Sc -তে ভর্তি হলাম। কিন্তু Chemistry Honours -এর Practical পরীক্ষা; কলকাতায় সায়েন্স কলেজে রাজশাহী থেকে এসে দিতে হত। সেই আমার জ্ঞানতঃ প্রথম কলকাতা দর্শন। সায়েন্স কলেজ প্রথম দর্শন।

যা হোক সেপ্টেম্বর মাসে 5th year M Sc -তে ভর্তি হলাম। সে সময় ঠিক করতে হল Chemistry -তে কোন Special বিষয় নিয়ে পড়বো— Organic, Inorganic অথবা Physical? ঠিক হল Organic Chemistry তে Research Paper করবো। কিন্তু কার কাছে করা যায়। চিন্তা হল আচার্য রায়ের কাছেই করবো। একবার তাঁর কাছে যেয়েই দেখা যাক, তিনি কি বলেন। যখন প্রথম তাঁর কাছে গেলাম তখন তিনি Laboratory -তে বসেছিলেন। ছাত্ররা কাজ করছিল। আচার্যদেব হাফহাতা ফতুয়া এবং একটি চেক কাটা লুঙ্গি পরে টুলের উপর বসে ছিলেন।

যা হোক ১৯২৬ সালে এপ্রিল মাসে যখন আমি Research paper করতে চাই সেই ইচ্ছাটা তাঁকে জানালাম তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "ওরে তুই থাকিস কোথায়?" আমি বল্লাম মেসে থাকি। তিনি বল্লেন "ও সব মেসে ফেসে অত দূরে থাকা চলবে না সময় নষ্ট হবে। এখানে থাকতে হবে। এখানেই খাওয়া দাওয়া করে Laboratory -তে

যারা কাজ করছে তাদের কাছে কাজ শিখে নে; আমি মাস চারেক পর যখন বিলাত থেকে ফিরবো তখন Research- এর বিষয় ঠিক করা যাবে।" এই হল তখনকার ব্যবস্থা। পরে তিনি যখন ফিরলেন তখন Platinum Compound -এ তাঁর কাজ হচ্ছিল সেটাই হল আমার পরীক্ষার বিষয়। সেটাই হল আমার পরীক্ষা। তখন আচার্য রায়ের কাছে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি চাইলাম, বল্লাম অনেকদিন বাড়ী যাই নি, বাড়ীতে একবার ঘুরে আসি। মাসখানেক পর কলকাতা থেকে আমার এক বন্ধু আমাকে লিখলেন "ওরে এখানে অনেক কাণ্ড হচ্ছে, তোর Result কি, এখনো জানতে পারিনি, তুই শিগ্‌গিরই চলে আয়।" এসে দেখি "অনেক কাণ্ড" হয়ে গেছে। M.Sc পাশ করলাম।

তারপর আচার্যদেব আমার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "তুই এখন কি করবি?" বল্লাম কি আর করব, 2nd class পেলাম। তিনি ২/৩ জায়গায় চিঠি দিলেন কিন্তু তখনকার দিনে চাকরী জোগাড় করা অত সহজে হত না। সুতরাং চাকরী হল না। আচার্যদেবের কাছেই আছি। ওখানেই খাই, থাকি। এই সময় Laboratory-র কিছু কাজ শুরু করলাম। তাতে আচার্যদেব খুশী হলেন, তিনি ভেবেছিলেন, না এর তো কাজের দিকে নজর আছে। সে কারণে কিছু কাজের জন্য আচার্যদেব নিজের দিক থেকে একটু চেষ্টা করলেন। আমার বরাতটা এমনি যে তখন যিনি আচার্যদেরে অধীনে Research Scholar ছিলেন তিনি এলাহাবাদের একটি Sugar Mill -এ ভাল চাকুরী পেয়ে চলে গেলেন। ঐ Research Scholarshipটা vacant হল। তিনি আমাকে ঐ Research Scholarship টা দিয়ে বল্লেন "এখন ওসব চিন্তা ছাড়, কাজ শুরু কর"। ১৯২৭ সালে M.Sc পাস করার পর থেকে ওনার সাথে Research- এর কাজ শুরু হল। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ওখানে আমি ছিলাম। বছর দেড়েক থাকার পর তখন আমার ৩ খানা paper হয়ে গেছে। এটা ১৯২৯ সালের শেষের দিকের ঘটনা। তখন আচার্যদেব আমাকে বল্লেন "তুই Research Assistant-এর কাজ করবি কিনা? ১৫০ টাকা মাহিনা।" আমি সেই কাজ শুরু করলাম। যারা Research Scholar থাকবেন তাঁদের condition ছিল ২ বছর Professor -এর under-এ কাজ করতে হবে; পরের একবছর নিজের খুশী মত কাজ করা যাবে যাতে D.Sc করা যায়। আমার ক্ষেত্রে এসব condition ছিল না। যেহেতু আমি Paid Research worker সেহেতু Joint paper-ই হবে। আচার্যদেবের Laboratory Assistant হওয়াতে আমার সুবিধা হল Laboratory -তে আমার control আছে, সে কারণে কাজের জন্য ছেলেরা যারা আসতো তারা Joint paper করতো (আচার্যদেব ২/৩ জনকে নিতেন) তার জন্য আচার্যদেবের নাম, আমার নাম এবং ঐ যে ছেলেরা কাজ করলো তাদের নাম থাকতো। এই রকমভাবে খান আষ্টেক paper হয়েছিল যার বিবরণ ১৯৩১ সালে Indian Chemical Society-র Journal -এ বের হয়েছিল। আগে এই ধরণের paper গুলি London এ পাঠাতে হত, খুঁটিনাটি, দোষ-ত্রুটির জন্য আবার ফেরত

আসতো, তা আবার ঠিক করে পাঠাতে অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। প্রকাশ করতে দেরি হত, তাছাড়া priority-র একটা প্রশ্ন থাকতো। আচার্য রায়ই সর্বপ্রথম Indian Chemical Society প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩৪ সালে আচার্যদেব বল্লেন "আমি পালিত Professor পদ থেকে Resign করছি, তা এরা বলছে আমি পথ আগলে আছি। খয়রা Professor, ঘোষ Professor, পালিত Professor পদে এদের সকলের আসার ইচ্ছে আছে", যে সময় ঘোষ Professor ছিলেন P C Mitra, সাংসারিক লোক এবং বাস্তব বুদ্ধিসম্মত। সেই বিষয়ে আমার সংগে সামান্য মতভেদও হয়েছিল, আচার্যদেবের পালিত Professor-এর Research Grant ছিল ২৫০০ টাকা। এই টাকায় তিনি Research Instrument, Chemicals ইত্যাদি কিনতে পারতেন। আমরা ৪/৫ জন যাঁরা তাঁর ওখানে কাজ করতাম তার জন্য ২৫০০ টাকা যথেষ্ট ছিল কিন্তু Dr P C Mitra -এর Research Grant ছিল ৫০০ টাকা, একারণেই মনোমালিন্য হয়েছিল। আচার্যদেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "কিরে তুই Dr. Mitra -এর সঙ্গে কাজ করতে পারবি?" আমি বল্লাম আমার দ্বারা হবে না। "তাহলে তুই কি কাজ করবি?" তিনি বল্লেন "গরমের ছুটির দু'মাস Bengal Chemical-এ কাজ কর। একটা Application কর। ৭৫ টাকা মাহিনা। আমি বল্লাম সে আবার কি? যা হোক, বর্তমান Research Assistant হিসাবে ১৫০ টাকা পাচ্ছি সেটা ছেড়ে ৭৫ টাকায় আমি কি করে কাজ করব? যাহোক আচার্যদেবের হস্তক্ষেপে আমি ১৫০ টাকা মাহিনায় Research Chemist হিসাবে বেঙ্গল কেমিক্যাল-এ যোগ দিলাম ১৯৩৪ সালে। রিসার্চ কেমিষ্ট হিসাবে সেখানে রিসার্চ করার কিছু ছিল না, তাছাড়া তাদের কাজের পদ্ধতি এবং আমরা যেভাবে সায়েন্স কলেজ-এ কাজ করেছি তার মধ্যে বিরাট তফাৎ ছিল। ওখানে যেন একটা রাজসিকভাব। যাহোক মাস তিনেক পর আমাকে বলা হল এখন তো কোন Laboratory-তে কাজ নেই, Manufacturing-এর কাজ শুরু কর। আচার্যদেব আমাকে বলেছিলেন "তুমি ওখানে কাজ করবে, কে কি করল না করল এ বিষয়ে তোমার কিছু বলার দরকার নেই, ভাল করল না মন্দ করল। তুমি যে রকম এখানে আসা যাওয়া করছ সেই রকমই করবে।" সে সময় আমি অন্য জায়গায় থাকতাম। যাতায়াত আছে; সপ্তাহে ২ দিন অন্তর সায়েন্স কলেজে বিকালে ছুটির পর যেতাম। এতে ওখানকার কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। একটা কমিটি করে এঁরা Cost Minimize করে কিভাবে in the light of new pharmacopoeia অনুসারে production করা যায় তার চেষ্টা করেন।

স্যার রায়-এর সম্বন্ধে রকমারী কথা প্রচলিত ছিল। আমি নিজে কিছু দেখিনি। তখন প্রায় সকলে political-detenu হয়ে গেয়ে। একটা জিনিস আমার মনের মধ্যে ছিল। কোনদিন জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাইনি যে তিনি বোমা তৈরী করেছিলেন কিনা? একদিনের ঘটনা

বলি। একদিন ডঃ পঞ্চানন নিয়োগী সায়েন্স কলেজে এসে বড় ছেলের বৌভাতের নেমন্তন্ন করলেন স্যার রায়কে। এটা ১৯২৮/২৯ সাল হবে। স্যার রায় বল্লেন "বাড়ী চিনবো কি করে?" তখন নিয়োগী আমাকে দেখিয়ে বল্লেন "ঐ তো নদীয়া আছে ও আপনাকে চিনিয়ে নিয়ে যাবে।" স্যার রায় বল্লেন "ও কি করে চিনবে?" তখন তিনি বল্লেন "ওর Research paper-এর Examiner ছিলাম সেই সময় ওকে একদিন আমার বাড়ীতে ডেকেছিলাম। ওর সাথে আমি আলাপ-পরিচয় করেছিলাম।" যা হোক ঐদিন বিকাল চারটার সময় স্যার রায়কে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। সঙ্গে নিলাম Tiffin Carrier। বিয়েতে গেলে এটা নিতে হত কেন না আচার্যদেব তাঁর সময় ছাড়া কিছুই খেতেন না। ডঃ পঞ্চানন নিয়োগী নিজে এসে আচার্য রায়কে আপ্যায়িত করলেন। একটু আলাদা জায়গায় তাঁরা বসলেন। হঠাৎ আচার্যদেব তখন বল্লেন "পঞ্চানন তোমার মনে আছে ১৯০৫ সালে তোমার drawer থেকে সেই..... ... (তখন হাতের ইঙ্গিতে বোমা দেখাচ্ছেন)।" তখন তো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বোমা তৈরী হয়ে বেরিয়ে যেত। সেইটা পঞ্চাননবাবু 'কদমা' বলতেন আর সেই পঞ্চাননবাবু এখন বড় ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন। পঞ্চাননবাবু তখনকার দিনে I. C. S ছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী Indian Educational Service- এর লোক। তখন পঞ্চাননবাবু ভাবলেন আচার্যদেব যদি এরকমভাবে বলতে শুরু করেন তাতে তো সবাই জেনে যাবে। এতে তো তাঁর চাকুরীর ক্ষতি হবে। আমি এটা চিন্তা করে Tiffin Carrier গাড়ীতে তুলে দেওয়ার কথা বলে ওখান থেকে চলে গেলাম। এই কথা বলায় পঞ্চাননবাবু ওখান থেকে কেটে পড়ার সুযোগ পেলেন। তিনি নিজেই Tiffin Carrier ভর্তি করে পৌঁছে দিলেন। এটা হল আমার স্বকর্ণে শোনা ঘটনা। দু'জনের আলোচনার সারাংশ।

তখন পেডি সাহেব ছিলেনমেদিনীপুরের জেলাশাসক। সে সময় বিপ্লবীরা তাঁকে সহ পরপর ৩ জনকে হত্যা করে। এই সব ঘটনা আচার্য রায় অত্যন্ত মন দিয়ে ল্যাবরেটরীর মধ্যে পড়তেন এবং উচ্চস্বরে বলতেন জীবনকে তুচ্ছ করে যারা এরকম করতে পারে তারা নমস্কারের যোগ্য।

১৯৩৩ সালে ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি(Hydrabad)-এর উদ্যোগে Hindu Chemistry-র উপর বক্তব্য রাখার জন্য স্যার পি. সি. রায় আমন্ত্রিত হন। আমি তাঁর সাথে সেই যাত্রায় ছিলাম। স্যার রায় Hydrabad যাচ্ছেন শুনে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আচার্যদেবকে জানালেন যে অনর্থক বেজওয়াদা স্টেশনে হায়দ্রাবাদের connecting train -এর জন্য ৬ ঘন্টা বসে না থেকে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে (Waltair) আসুন। একটু আলাপ আলোচনা করা যাবে। ঐ সময়টাও কেটে যাবে। তাছাড়া ট্রেনটা তো Waltair থেকেই ছাড়ছে। তাঁর লোক স্টেশনে থাকবে, সে সব ব্যবস্থা করে রাখবে। যাহোক আচার্যদেব ও আমি

সেই মত Waltair- এ নামলাম। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সাথে কুশল বিনিময়ের পর তিনি নিজেই আমাকে বল্লেন "জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে আসুন, ভাল লাগবে তবে "Beware of dirt"। যাহোক, জায়গাটা ভাল লাগলো। ওদিকে স্যার রায় ও সর্বপল্লী আলোচনা সেরে নিলেন। ট্রেনে আচার্যদেব বল্লেন "ওরে এসব অসহযোগ আন্দোলনে কিছু হবে না। ইংরেজদের মেরে না তাড়ালে এরা দেশ ছাড়বে না। এটা সর্বপল্লীরও মত।"

১৯৩৪ সালে Trivandrum-এ Youth Conference-এ সভাপতি ছিলেন। সেবারও আমি তাঁর সাথে ছিলাম। Courtesy call হিসাবে স্যার রায় তখন কিন্তু ত্রিবান্দ্রাম-এর দেওয়ান C P Ramaswamy Iyer এর সঙ্গে Courtesy visit করে ফিরে এসে বল্লেন "ওহে এনারো ঐ একই মত। মেরে না তাড়ালে ইংরেজরা এদেশ থেকে যাবে না।"

আচার্যদেব চরকা ও খাদির সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একমত ছিলেন না। পরে অবশ্য Convinced হয়েছিলেন। গান্ধীজী তাঁকে বলেন যে, আমাদের দেশের লোকেরা বসে সময় নষ্ট করে, যদি আধঘন্টা করে সুতাকাটে তবে তার নিজের যতটা কাপড়ের দরকার সেটা তৈরী করতে পারে। Theoretically এটা খুব ভাল প্রস্তাব। আচার্যদেব rigorously নিজে আধঘন্টা করে চরকা কাটতেন এবং সেই সুতা থেকে খাদি প্রতিষ্ঠান খদ্দরের কাপড় দিত। ওঁর কাটা সুতা খুব fine হত। আমরা কাটতে গেলে অত fine হত না। আচার্যদেব সব সময়ই বলতেন দেশভক্তিতে যে ছেলেরা দেশের জন্য প্রাণ দেয় এদের জন্য কিছু করা দরকার। যতখানি তিনি পারেন সাহায্য করতেন। একবার তাঁর কাছে Internee এবং ৭ বছর দ্বীপান্তর ফেরত একজন (নাম ভুলে যাচ্ছি) দেখা করেন। তিনি তাকে টাকা দিয়ে বৌবাজারের কাছে বৈঠকখানায় মিষ্টির দোকান করে দিয়েছিলেন। আচার্যদেব রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন "আমার শিষ্যকে (পরশুরাম–রাজশেখর বসু) কাব্য এবং সাহিত্যে উৎসাহ দিচ্ছেন, তাতে বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষতি হচ্ছে।" রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরও দিয়েছিলেন আচার্যদেবের কাছে। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যই তাদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতেন।

সমবায় সম্পর্কে আচার্যদেবের অনেক উৎসাহ এবং অবদান ছিল। সমবায় প্রথা যে ভাল তা তিনি সর্বত্র প্রচার করতেন। তাঁর নিজের গ্রামের সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন pioneer।

মনে পড়ে তিনি আর. কে. বি. কে. স্কুলের জন্য বিনোদ চক্রবর্তী নামে এক Headmaster কে Regularly টাকা দিতেন। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গে বন্যা হয়েছিল। তিনি সঙ্কট ত্রাণ সমিতি গঠন করেন। তখন আমি কলেজে পড়ি।

১৯৩০ সালে লবণ আন্দোলন হল। তখন আমি ওঁর সাথে ছিলাম। একদিন গাড়ী করে

মহিষাদলে আচার্যদেবের সাথে গিয়েছিলাম। সেখানে সতীশবাবুর নেতৃত্বে লবণ আন্দোলন হচ্ছিল। জ্বালানী পুড়িয়ে নোনা জল থেকে নুন তৈরী করা ছিল খুব Expensive ব্যাপার।

বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা আসতেন প্রায়ই। J. C. Ghosh ঢাকায় থাকতেন। তিনি কলকাতায় এলেই স্যার রায়-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে রকমারী কাজে উৎসাহিত করতেন। আচার্যদেবের Backing -এ ডঃ পি.সি. গুহ Indian Institute of Science, Bangalore-এ Professor হয়েছিলেন।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আচার্যদেব ভূমিকা ছিল সাংঘাতিক। তিনি বলতেন গরুর হাড়, মানুষের হাড়ের মধ্যের Composition-এ কোন পার্থক্য নেই। আগুনে পুড়িয়ে নিলে সবই Calcium phosphate হয়। সেই Calcium phosphate -এ গরুর, মানুষের বা শুয়োরের হাড়ের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। বোঝাও যাবে না। তিনি বলতেন "তোকে একজন গ্লাসে জল দিলে—জাত কিভাবে কাঁচের গ্লাসের মধ্য দিয়ে জলে ঢুকবে। তুই জলটা খাবি না। ছোঁয়া লেগেছিল বলে?" এ হচ্ছে তাঁর কথা। এ রকম অনেক ব্যাপারে তাঁর মতামত ছিল। ওঁর একজন কুক ছিল। সে জাতে ডোম ছিল। তার নাম ছিল 'দুমন'। সে অতি জঘন্য রান্না করতো তবুও স্যার রায় তাকে রেখেছিলেন। সে ছুটিতে গেলে আমরা রান্না করতাম।

১৯২৯/৩০ সাল থেকে আমি নিজেই বাজার করতাম। আগে ঐ 'দুমন'ই বাজার করত। আচার্যদেব কলা খেতে খুব ভালোবাসতেন। আমি রোজই বাজার থেকে কলা আনতাম। তাঁর সকালবেলার খাদ্য তালিকা ছিল ১/২টি কলা, ২টি কেক, ১টি মিষ্টি এবং এক কাপ চা সঙ্গে এক গ্লাস খাঁটি দুধ। চা-টা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। ফ্লাস্কের মধ্যে গরম জল দিয়ে চা পাতা ৮/১০ মিঃ ভিজিয়ে রেখে ১ পোয়া দুধ দিয়ে তিন কাপ চা তৈরী হত। তাই খেতেন। যাহোক সেই আগের কথায় আসি—একদিন বাজারে দেখি চমৎকার দেখতে ১ পয়সায় ১টি কলা। খুব পছন্দ হ। ঠিক করলাম রোজই তো ১ পয়সায় ২টি কলা নিয়ে থাকি আজ ২ পয়সায় ২টি কলা নেব আচার্যদেবের জন্য। প্রথমে কলা দেখে তো আচার্যদেব অত্যন্ত খুশী হলেন। তারপর কলার দাম বলায় তিনি বল্লেন যখন ১ পয়সাতে ২টি পাওয়া যায় তখন এ খরচের অর্থ হয় না। বল্লেন "নবাব হোয়েছিস।" মাথার চুলের মুঠি ধরে কিল-ঘুষি মারলেন। কিন্তু সেই দিনই ডঃ পি.সি. ঘোষ এসে আচার্যদেবকে বল্লেন "অভয় আশ্রমের জন্য টাকা দরকার।" এ কথা বলায় আচার্যদেব আমাকে বল্লেন "নদীয়া, পাস বই বের করে দেখ তো কত টাকা আছে।" দেখলাম ২৭৩০ টাকা আছে। তখন স্যার রায়ের নির্দেশ মত ২৫০০ টাকার Bearer Cheque লিখলাম। তিনি সহি করে ডঃ ঘোষকে দিলেন। ডঃ ঘোষ ওটা নিয়ে চলে গেলেন। এ

ঘটনায় তখন আমার চিন্তা হল লোকটা কি রকম? যে লোকটা ২ পয়সা কলার জন্য আমার চুলের মুঠি ধরল আর সে অনায়াসে তার জমা ২৭৩০ টাকার মধ্যে ২৫০০ টাকা দিয়ে দিল। তাঁর মাসের পেনশন ছিল ৪৫০ টাকা, সেটা জমা হত ঐ অ্যাকাউন্টে। সেই টাকা থেকে তাঁর মাসের খরচা হত। এ ছাড়া Indian Institute of Science, Bangalore-এর তিনি সদস্য ছিলেন। সেখানে Lecturership-এর জন্য কিছু সাম্মানিকও পেতেন।

আমি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল কেমিক্যালের বোম্বে ইউনিটের ম্যানেজার ছিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে আচার্যদেব জগদীশচন্দ্র লাহিড়ীকে নিয়ে বোম্বে গিয়েছিলেন। পরে আমাকে বরোদাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে Rest House-এ ছিলেন। সেখানে Indian Chemical Manufacturer-দের নিয়ে একটি সভা হয়। Bengal Chemical ছিল প্রথম সদস্য। এরূপ চারটি Company নিয়ে একটি Association গড়ার জন্য স্যার রায় গিয়েছিলেন।

১৯৪৪ সালের প্রথম দিক থেকে তাঁর শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। আমি রোজই দেখতে যেতাম। শেষের বছরটি মোটেই চলাফেরা করতে পারতেন না। এমন একটা শারীরিক অবস্থা তাঁর হয়েছিল যা দেখলে চোখে জল এসে যেত। খুবই খারাপ অবস্থা! সেই সময় তাঁকে দেখাশুনা করত বৈদ্যনাথ সর্দার এবং তার ভাই অরবিন্দ সর্দার।

যেদিন আচার্যদেবের মৃত্যু হল ঠিক তার আগেরদিন আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। তখন আচার্যদেবের নিকট পৌঁছাতে পারিনি। ডঃ পি. সি. মিত্র তখন উপর থেকে নেমে এসে বল্লেন "আর যেয়ে কি হবে এখন বোধহয় ঐভাবেই কিছুদিন থাকবেন (সংজ্ঞাহীন)। কি লোকের কি হল।" তাই শুনে আর উপরে গেলাম না সেদিন।

আরও কিছু কথা মনে পড়ছে । ওঁর একজন Lady Lover ছিল। নামটা মনে পড়ছে না। তিনি স্যার জে. সি. বোস-এর সম্পর্কিত এক আত্মীয়া ছিলেন। যোগাযোগও ছিল কিন্তু তিনি স্যার রায়ের স্বাস্থ্যের কারণে বিবাহ না করার পরামর্শ দেন। এরপর স্যার রায় বিবাহের আর কোন চেষ্টা করেননি।

এ রকম মহৎ জীবন সাধারণতঃ একটা হয় না। তিনি ব্যবসা সম্পর্কে একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন "বাঙালীর ব্যবসা তিন পুরুষের বেশী টেকে না।" It is very ture। তিনি Bengal Chemical -এর পত্তন করলেন। ১৯৩৯-এ Resign করে বেরিয়ে এলেন। Director-দের সাথে মনোমালিন্য ঘটেছিল। কারণ আচার্যদেব চেয়েছিলেন কোম্পানীর Profit যা হোচ্ছে সেটাকে Plough back করে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি কেনা হোক। স্যার রায় Director-দের নানা বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করতেন। তারা একটার পর

একটা ভুল Decision পাস করিয়ে নিত।

স্যার রায়-এর কোম্পানী এ্যাক্ট সম্পর্কে ধ্যানধারণা ছিল না। Company Management কি করে চালাতে হয় তার জটিল আইন সম্পর্কে ধারণা ছিল না বলেই আমার ধারণা। অতএব সেই সুযোগ নিয়ে কিছু Greedy vultures এসে পড়লো। এই কথাটাতে স্যার রায় নিজের লেখার মধ্যেও বলেছেন। (My last will and testament-- 1935-36 সনে লেখা বইটিতে সব কথা বলা ছিল)।

তখন রাজশেখর বসুই ছিলেন all in all। স্যার রায় বলতেন "Rajshekhar is my conscience-keeper in the matters of business in Bengal Chemical !"

স্যার রায়-এর আদর্শ নেওয়ার মত মানসিকতা থাকা দরকার। তাঁর রচনাবলী প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ।

এই সাক্ষাৎকারটি কাপতাম্র পত্রিকা (দশম বর্ষ ; ২৩তম সংখ্যা) থেকে (সংক্ষিপ্ত) গৃহীত।

১. ১১. ৯১ তারিখে সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সহ সম্পাদক শ্রীপিনাকপাণি দত্ত গ্রহণ করেন।

TRIBUTE

" In the death of Dr P C Ray the country has lost a very great scientist and an equally great philanthropist He was also a great patriot and friend of the poor His Spartan simplicity was a pattern for all. but more specially for the student world "

MAHATMA GANDHI

A Unique figure

"Sir P C Ray was one of the most widely esteemed sons of the motherland and brought honour to it His death has removed a unique figure from the public life of Bengal "

PANDIT M.M. MALAVIYA

Acharya Prafulla Chandra Ray

Joges Chandra Ghosh

The very caption of Acharyadev's autobiography made many people feel as to why he, the father of the modern Indian chemistry, preferred to introduce himself as a Bengali chemist instead of an Indian chemist This did not certainly enhance his prestige In outside world also people knew Bengal as a part of India only Then why this choice?

I had a mind to ask the Acharyadev from whom I got my lessons in chemistry and who initiated me to carry on research on Ayurveda, as to the reasons which prompted him to do so But the chance came rather late when he visited our Sadhana Ausadhalaya at Dacca some time in the year 1930 along with the late Dr J C Ghosh of the Dacca University

According to Acharyadev, India could be made great only if her provinces were great So the duty of all Indians was primarily to look after the well-being and improvement, both economical and otherwise, of their own provinces and thereby to raise the overall stature of India Had Acharyadev been born in Maharashtra, Bihar or Tamilnad he might have written life and experiences of a Maharashtrian, a Bihari or a Tamil Chemist But thereby he would not have meant any disrespect, or ill will, or any aspersion to other provinces When Acharyadev observed that the Bengalis were moving towards economic collapse-he felt that it would ultimately bring down the whole Indian nation to the same level of degradation So he felt for his country both as a Bengali and an Indian The Bengalis, particularly of the new generation, must not lose heart and must have unflinching faith in the destiny or the future of Bengal and Bengalis They must be made to believe, both in theory and practice, that Bengalis too can do big things and achieve distinction in different walks of life That belief possibly forms the background for the captions, Bengali chemist, Bengal Chemical & Pharmaceutical Works and Bangiya Sankat-Tran Samity Acharyadev used to say "Let Bengal be revived, let Bengalis arise from their deep slumber, despair, and lethargy and let them be conscious about the dignity of manual labour and let them do some thing in trade, commerce and industry." In short, mother India would feel stronger so far as this particular limb of her was concerned, resulting in an overall improvement of the whole country

There was a saying about Rabindranath that "Gurudeva was international

because he was truly national". I think that similarly, Acharyadev also was non-provincial because he was truly provincial, and that was his way to become truly Indian and to serve mother India more effectively

Acharyya Prafulla Chandra Ray: Birth Centinary Souvenir

Bengal National Chamber of Commerce

At a special meeting held on Friday June 23, the Committee passed a resolution condoling the death of Acharya Prafulla Chandra Ray

"The Committee of the Bengal National Chamber of Commerce deeply mourn the irreparable loss sustained by India at the death of Acharyya Sir Prafulla Chandra Ray Pre-eminently a scientist of international repute and a savant, Acharya Ray did not confine his activities only to scientific researches but took an abiding interest in the economic development of the county, and had placed his knowledge and experience at the disposal of all industrialists big and small"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সান্নিধ্যে

ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

ছাত্রজীবনে আচার্য রায়ের সান্নিধ্যে আসার অভাবনীয় সুযোগ লাভ করেছিলাম। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তাঁর অতুলনীয় ছাত্রপ্রীতি, নিয়মনিষ্ঠা অধ্যাপনায় গভীর অভিনিবেশ প্রভৃতি দিকগুলি আমরা জানতে পেরেছিলাম। এজন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

বিজ্ঞান কলেজে ভর্তি হওয়া প্রসঙ্গে আলাপের সময় স্যার রায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন- ''রসায়নের কোন বিভাগ নিয়ে পড়তে চাও?'' আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে বললেন, 'কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়। আমি অঙ্কে কাঁচা ছিলাম। তাই ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়িনি। ফিজিক্সে অঙ্ক থাকার জন্যে ফিজিক্সেও আমার তত আগ্রহ ছিল না।' অবাক হলাম শুনে। এত বড়ো বিজ্ঞানী, একজন নবাগত ছাত্রের কাছে দুর্বলতা সম্পর্কে এমনি করে বললেন! পরেও জেনেছি পাণ্ডিত্যের অহমিকা তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করেনি। এই প্রথম সাক্ষাৎকার আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমি অবশ্য ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়েছিলাম। কারণ এ বিষয়টি আমার ভাল লেগেছিল। আমি তাঁর উপদেশ শুনিনি জেনে তিনি কোনও দিনই আমাকে কিছু বলেননি বরং ভালভাবে পড়বার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

আর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। ছাত্রদের অনেক সময় বেশী সময় ধরে ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে হয়। গ্যাসের ফ্লেম বেশী খরচ না করার জন্য আচার্যদেব উপদেশ দিতেন। খালি পেটে দীর্ঘক্ষণ গবেষণা করা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। কারণ তাঁর জানা ছিল, অধিকাংশ ছাত্রের অবস্থা ভাল নয়। পুষ্টিকর খাদ্য তারা নিয়মিত খেতে পায় না। সেই জন্য সন্ধ্যার আগেই গবেষণাগার ছেড়ে বাড়ী চলে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিতেন। প্রতিদিন বিকালে আচার্যদেব বেড়াতে বের হতেন। সন্ধ্যার পর বিজ্ঞান কলেজে ফিরে আসতেন। ছাত্ররা এই সময় ল্যাবরেটরীতে কাজ করত, তিনি ফিরে আসার সময় ঘরের আলো নিভিয়ে দিত। তিনি মনে করতেন ছেলেরা বাড়ী চলে গেছে। পরবর্তীকালে তিনি ছেলেদের এই চালাকি জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি কাউকে কিছু বলেননি। বরং আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। তবে এইভাবে কাজ করলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে— এই মন্তব্য তিনি প্রায়ই করতেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁর পিতৃসুলভ স্নেহ তাঁর কথায় প্রকাশ পেত।

আর একটি ঘটনা বলি। একদিন ক্লাশ চলছিল। নির্ধারিত অধ্যাপক না আসার জন্য তিনি ক্লাশে ঢুকে পড়েন। হঠাৎ তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করেন- 'কে কে বিয়ে করেছে?' একজন

হ্যাঁ বলতেই তিনি বললেন 'তোমার কিছু হবে না। সবশেষ হয়ে গিয়েছে।' তারপর তিনি বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর এবং অসঙ্গত দিকগুলি আলোচনা করেন। রসায়ন ক্লাশে সমাজতত্ত্বের এই আলোচনা আনন্দদায়ক হয়েছিল।

আর একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ''স্যার, আপনি চা পান না বিষ পান কেন বলেন?'' তিনি উত্তরে বলেন, 'আমি তো চা খাই। সেজন্য এই রকমের চেহারা হয়েছে। এই চেহারা কোনও মেয়ে পছন্দ করবে না। এজন্য তোরা চা পান করিস না।' কিন্তু বিষয়টি আস্তে আস্তে আমাদের কাছে প্রতিভাত হল। ভারতবর্ষের 'চা' এর ব্যবস্থা তখন ইংরেজদের হাতে ছিল। এই ব্যবসার মাধ্যমে দেশের বহু টাকা বাইরে চলে যাচ্ছিল। তিনি এর বিপক্ষে ছিলেন। ভারতবাসী চা খাওয়া ছেড়ে দিলে ইংরেজদের মুনাফা লুঠবার সুযোগ থাকবেনা। দেশের টাকা দেশেই থাকবে। তাই তিনি চা পানের বিরোধিতা করতেন। এই ঘটনা তাঁর গভীর জাতীয়তাবোধের পরিচয় দেয়।

আমাদের অন্যতম অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের চালচলন একেবারে সাহেবী ছিল। তিনি ছিলেন রাশভারী মানুষ। সবাই তাঁকে খুব ভয় করত। একদিন দেখলাম করিডরের পরস্পর বিপরীত দিক দিয়ে তিনি এবং আচার্যদেব আসছেন। আচার্যদেবকে দেখে তিনি হঠাৎ একটি ক্লাশে ঢুকে পড়লেন। আচার্যদেব চলে গেলে তিনি ঐ ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের ক্লাশে এলেন। তখন আমরা ভাবলাম— এহেন অধ্যাপককে শায়েস্তা করার মত এখানে একজন আছেন।

আমরা লক্ষ্য করতাম অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা দিনের কাজ সুরু করার আগে আচার্যদেবের ঘরে যেয়ে জিজ্ঞাসা করতেন দিনের কি কি কাজ তাঁকে করতে হবে। অধ্যাপনা ছাড়াও সেবামূলক কাজে তিনি ব্রতী ছিলেন। আাচর্যদেব তাঁকে ওই পথ দেখিয়েছিলেন। বক্তৃতা দিয়ে নয়, দৃষ্টান্ত দিয়ে।

হাস্য রসিকতায় আচার্যদেবের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। একদিন তাঁর শরীর খারাপ থাকায় বিজ্ঞান কলেজের উপরে উঠতে পারছিলেন না। আমাকে বল্লেন— দিলীপকে ডেকে আনতে। আমি বললাম 'স্যার আমি ১১০ পাউন্ড পর্যন্ত ওজন তুলতে পারি। আপনার ওজন তো বড়জোর ৮৫ পাউন্ড হবে।' যাহোক আমি অনায়াসে তাঁকে উপরে তুলে নিয়ে এলাম। তিনি বললেন 'এনেছিস ভালই করেছিস। কিন্তু তোর মাংসপেশী বড় শক্ত। দিলীপের মাংসপেশী তুল তুলে।' আমি বললাম 'স্যার, আপনার শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছু নেই। আরও অনেক তুলোর প্যাডিং লাগাতে হবে।' এইভাবে আমরা তাঁর সাথে হাস্যরসিকতা করতাম। তিনি খুবই রসিক ছিলেন।

তখনকার দিনে আচার্যদেব এক কলম লিখে দিলে অনেক দুস্থ ছাত্রের [illegible]

কনসেশান হয়ে যেত। আমার আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় আমার এক অধ্যাপক আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। আমাকে দেখে বললেন- 'মনে হচ্ছে তো পয়সা কড়ি নেই। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করতে পারে না।' যাই হোক তিনি চিঠি লিখে দিলেন। হঠাৎ ঐ অধ্যাপকের নাম ধরে বল্লেন- দেখতো ও সোনার বোতাম পরে এসেছে কিনা? তিনি নিজেই বললেন তাঁর অভিজ্ঞতা- একদিন একটা ছেলে সোনার বোতাম পরে তাঁর কাছে তার খারাপ অবস্থার কথা জানাতে এসেছিল। এজন্য তিনি সতর্ক হয়েছিলেন।

একবার এক বারাঙ্গনা তাঁর সাথে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। সে তার ব্যবসা ছেড়ে সদুপায়ে কিছু আয় করতে চায়। ভাবছিলাম, আচার্যদেব এর সাথে দেখা করতে চাইবেন কিনা। ঘরে ঢুকে আমি তাঁকে বারাঙ্গনার কথা বললাম। তিনি তার সাথে দেখা করলেন, তার কাছে সব শুনলেন।মেয়েটি যাতে পুনর্বাসন পায় তার জন্য তিনি চিঠি লিখে দিলেন। কি উদার এবং সহৃদয় মানুষ ছিলেন তিনি।

মেয়েটি চলে যেতেই জিজ্ঞাসা করলাম 'স্যার, এত মন দিয়ে কি পড়ছিলেন? উত্তরে বললেন 'সেক্সপিয়ারের 'ওথেলো' পড়ছিলাম। যতবার পড়ি ততবারই নূতন লাগে।' তারপর আমাকে বল্লেন, বলতো বই থেকে কোন একটি জায়গা– দেখি তার পরবর্তী অংশ আমি বলতে পারি কিনা। দেখলাম তিনি গড়গড় করে বলে গেলেন, এমনি অভাবনীয় স্মরণশক্তি ছিল তার।

জীবনে 'সেক্সপিয়ারিয়ান প্যারেলস' নামে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকা একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিজ্ঞানী হয়েও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ কত গভীর ছিল এটা তারই অন্যতম প্রমাণ।

তিনি সাহিত্য ও ইতিহাসে উৎসাহী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় যখন বিলাতে ছিলেন, তখন বি-এস-সি পরীক্ষা সমাগত জেনেও 'ইন্ডিয়া বিফোর এন্ড আফটার দি মিউটিনি' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি লেখেন। ভারতে তৎকালীন বৃটিশ শাসনের স্বরূপ এই প্রবন্ধে উদঘাটিত হয়।

তাঁর লেখা 'অটোবায়োগ্রাফি অফ এ বেঙ্গলী কেমিস্ট' বাঙ্গালীর কাছে ছিল একটা ম্যানুয়াল: কি ভাবে দেশকে ভালবাসা যায়, দেশের উন্নতি করা যায় তার বর্ণনা। তাঁর লেখা 'হিস্টোরি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' একটি অনন্য অবদান। তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের দেশে যে বিজ্ঞান-গবেষণার সুপ্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল বর্ণবৈষম্য প্রথা প্রবর্তনের ফলে তা অবলুপ্ত হল।

পরবর্তী কালে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি এই বইটির কিছু পরিবর্তন করে অন্য জিনিস

সংযোজন করেন। আচার্যদেবের প্রিয়শিষ্য প্রিয়দারঞ্জন রায় এই বইটা সম্পাদনা করেছেন। আমার মতে এই পরিবর্তন ও সংযোজন দুঃখজনক। এটা করা ঠিক হয় নি।

আচার্যদেব সম্পর্কে যত আলোচনা করা যাবে ততই তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হবে। তিনি শুধু একজন ব্যক্তি ছিলেন না। অনেক ব্যক্তির সমাহার ছিলেন। তিনি যত বেশী লিখেছেন ও বলেছেন তার চাইতে অনেক বেশী হাতে কলমে করেছেন। আজকের দিনে আমরা দেশপ্রেম ও পলিটিক্যাল পাওয়ারের সাথে গোলমাল করে ফেলি। আমার বিশ্বাস এই ধরণের আলোচনা সভা নেশান বিল্ডিং এর কাজে সহায়ক হবে।

P.C.Ray Museum

It is authoritatively learnt that the room in the Science College where Acharya Ray breathed his last will be preserved as a Museum The exhibits therc will include his books, the small number of furniture and clothes that he used and similar other small things.

A tablet, on which will remain briefly inscribed his activities in the Science College will be, it is understood, fixed on the wall out side,

The Calcutta Municipal Gazette,
(Sir P.C. Ray Memorial supplement)
24th June,1941

প্রফুল্লচন্দ্র

অমিতাভ সেন

যৌবনেরে বেঁধে ছিলে তব শীর্ণাকায়।
জ্বলন্ত কর্মের দীপ্তি, তুমি হে মহান্,
যেখানে আর্তের দল রুদ্ধ কণ্ঠে চায়,
উর্দ্ধাকাশে হাহাকারে-সেথা আগুয়ান,
সবাকার ভীড় ঠেলি-প্রদীপ্ত আভায়,
করুণার বারিধারা আঁখিকোণে ছায়া।
ভিক্ষাপাত্র লয়ে ফির মহেশের সম,-
দ্বারে দ্বারে, শোনা যায় তব সিক্ত বাণী;
তখন তোমারে হেরি হয়েছে বিভ্রম-
স্বরগের জ্যোতিঃ হেথা কে দিয়েছে আনি।
সে আভা নিভিয়া গেল হেরিব না আর
তোমার সস্নেহ সিক্ত আঁখি করুণার।
আর্ত হাহাকার শুধু ব্যাকুল আশায়,
চাহিবে আকাশ পানে, নীরব ভাষায়।
দীনতায় হীনতায় আর কেহ আসি;
শুনাবেনা রূঢ় কথা। আঁখি জলে ভাসি।
ছাত্রের আছিলে রাজা হৃদয়-আসনে
শ্রদ্ধানত ছিল সবে স্নেহের শাসনে।
তাহারা হারাল যাহা, শুধু তারা জানে;
কি যে হাহাকার, আজি তাহাদের প্রাণে।
সবে আজি বন্ধুহারা, সাশ্রু চোখে চায়-
আর না জ্বলিবে রবি প্রদীপ্ত আভায়।

দেশ : ১১বর্ষ : ৩২শ সংখ্যা, ১৭ই জুন, ১৯৪৪

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রসঙ্গে

শতদলবাসিনী বসু

আচার্যদেব যখন নিজের বাটীতে আসিতেন প্রত্যেকবারেই আমাদের গ্রামে এবং এমন কি আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সভা হইত, গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু বহু লোক সভায় যোগদান করিতেন। এখনকার মত আগের দিনের মেয়েদের সভা সমিতিতে যাইবার প্রথা তেমন ছিল না। বৃদ্ধাগণ যদিও চিকের আড়ালে গিয়া বসিতে পারিতেন, ছোট ছোট বউদের আদৌ যাইবার উপায় ছিল না।

একবার মিটিং-এর দিনে আমাদের বাটীর নূতন বউদিগণ আচার্যদেবকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছাদে উঠিয়া দেখিতে গেলেন। কিন্তু ভালভাবে দেখা যায় না বলিয়া— আমাদের বাটীতে চাকুরী করিতেন রাখাল সিংহ নামে একজন, আমরা তাঁকে রাখাল দাদা বলিয়া ডাকিতাম— তাঁকে বলা হইল আলোটা আচার্যদেবের মুখের নিকটে ধরিতে। বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'এ কুৎসিত রূপ কি আলো দিয়া দেখিতে হয়?' সত্যিকারের রূপ না থাকিলেও তাঁর গুণে সকলে এমনি মুগ্ধ ছিল যে তিনি আসিবেন শুনিয়া ছোট-বড় শিশু-বৃদ্ধ সবাই সকাল হতে পথ চাহিয়া থাকিত এবং তাঁহাকে দেখিয়া পরম পুলকিত হইত।

তখনকার দিনে সার্বজনীন প্রথা না থাকায় এবং সমাজ শৃঙ্খলা অধিক থাকায় বিলাতে গেলে জাতিচ্যুত হইত। সেকারণ আচার্যদেব উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাত যাওয়াতেও সমাজে একটু গোলযোগ হইয়াছিল শুনিয়াছি। তিনি যখন বাড়ী আসিতেন অন্দরমহলে যাইতেন না। মায়ের মৃত্যুর সময়েও তিনি মাসিক শ্রাদ্ধের পূর্বেই মেয়েদের ন্যায় মায়ের চতুর্থী শ্রাদ্ধ করিয়া আত্মীয়-স্বজনদের, ফল সিরাপ ও মিষ্টান্ন খাওয়াইয়াছিলেন। সেসময়ে আমরা তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। যতবার তিনি বাটী গিয়াছেন প্রায় সকলবারই আমরা তাঁর দর্শন পাইয়াছি।

বাবার (কানাইলাল ঘোষ) নিকট শুনিয়াছি নেশাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন সেকারণ মাদক দ্রব্য নিবারণের জন্য সভাসমিতি করিয়া কাটীপাড়ার মদের ভাঁটি ভাঙ্গিয়া দেন। তাঁহার মধ্যম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমার বাবাও সে-সময় তাঁর সহকর্মী ছিলেন। সেই হইতে প্রকাশ্যে আর কখনও ওই গ্রামে মদের কারবার হয়নি।

সরকারী ডাক্তারখানায়, যখন আমার দাদা কালীপদ ঘোষ ডাক্তার ছিলেন তখন একবার আচার্যদেবকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। অন্যান্য মিষ্টি ও [illegible]

তৈরী (নারিকেলের) খাবারও ৪/৫ রকমের করিবার জন্য বাবা আদেশ করেন। আমরা সকলেই তখন দাদার সরকারী ডাক্তারখানার কোয়ার্টারে থাকিতাম। সকাল হইতে সকলে মিলিয়া খাবার করিয়া বেলা ৩টা হইতে পথ চাহিয়া আছি। ৪টায় তাঁহারা আসিলেন শিষ্য ও ছাত্র সমেত প্রায় ১৫/১৬ জন। খাবার সব টেবিলে সাজাইয়া খঞ্জিপোষ দিয়া ঢাকা ছিল। ঢাকা খুলিয়া দেখিয়া আচার্যদেবের কি আনন্দ! খাইবার সময় ছেলেদের বলিলেন, আমাদের দেশে কত সুন্দর খাবার তৈরী হয় খাইয়া দেখ। বাবা বলিলেন, 'সব ঘরে তৈরী, মেয়েরা করিয়াছে।' শুনিয়া কত যে প্রশংসা করিলেন— আমরাও আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলাম।

বাংলা ৫১ সাল পড়িতেই নিষ্ঠুর কালের ডাক আচার্যদেবের অন্তরে পৌঁছিয়াছিল তাই জন্মের মত শেষবার জন্মস্থান দর্শন করিতে এবং প্রিয় দেশবাসীকে দর্শন দিতে বৈশাখ মাসে বাটী গিয়াছিলেন। মেঘনাদ প্রভৃতি প্রিয় শিষ্যগণও সাথে ছিলেন। ১৪ই বৈশাখ শেষ মিটিং হয়। কাটীপাড়া হইতে রাড়ুলী নিকট গ্রাম হইলেও কাটীপাড়ার কায়স্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে-বউরা কোনদিন হাঁটিয়া যাতায়াত করেন নাই। কিন্তু ঐ মিটিং-এর দিনে কোনও যানবাহনের অপেক্ষা না করিয়া কুলবধূরাও হাঁটিয়া তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলেন। শারীরিক অবস্থা তাঁহার খুবই খারাপ ছিল; তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিলাম যে ইহাই শেষ দেখা। ৫/৭ মিনিট মাত্র সভায় তাঁকে রাখা হইয়াছিল, ২/১টী কথা যাহা বলিয়াছিলেন সকলে শুনিতে পাই নাই। মাল্যভূষিত করিবার পরে ইজিচেয়ারে করিয়া ছাদের মুক্ত বায়ুতে নিয়া যাওয়া হয়। আমরা তথায় গিয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসি।

আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে শুনিলাম ৩রা আষাঢ় বিজ্ঞান কলেজেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। যদিও তাঁহাকে দেখিয়া সকলে বুঝিয়াছিলাম আর বেশীদিন বাঁচিবেন না তবুও এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে আমরা বড়ই মর্মাহত এবং পিতৃ-মাতৃহীন শোকার্তের ন্যায় শোকাভিভূত হইয়াছিলাম।

শুনিয়াছিলাম কলিকাতায় তাঁর শিষ্য ও ছাত্রগণ তাঁহার পারলৌকিক কাজ সমারোহে করিয়াছিলেন এবং বাটীতেও তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র চারুচন্দ্র ও অবনীকান্ত যথাসাধ্য সমারোহে পারলৌকিক কাজ করিয়াছিলেন। বৃষোৎসর্গের বৃষটি দেখিলে তাঁহার মত পুণ্যাত্মার পুণ্য প্রভাব মনে করাইয়া দিয়া যেমন আনন্দ দেয় তেমনি তাঁর তিরোভাবজনিত বেদনাও অনুভব করি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

নলিনীকান্ত সরকার

নির্দিষ্ট করে সমিতির সভ্যেরা স্ব স্ব চেষ্টায় সমস্ত টিকেট বিক্রি করে ফেলেছেন। প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখের সারির মধ্যস্থলে বসে আছেন স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

জলসা আরম্ভ হলো। জনকয়েক গায়কের গান শেষ হবার পর আমার গাইবার পালা। আমি ধীরে ধীরে মঞ্চের উপরে উঠে গিয়ে হারমোনিয়মটি নিয়ে বসলাম। সম্মুখের যবনিকাটি সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হলো প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে। দেখি, তাঁর চোখে একটি বিস্ময়ের চিহ্ন। পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন শ্রোতাকে কি-যেন জিজ্ঞাসা করলেন। অনুমানে বুঝতে পারলাম তিনি যেন পার্শ্ববর্তীকে বলছেন— 'এ তো সাংবাদিক জানতাম, গানও গাইবে নাকি?'

আচার্যদেব এর আগে আমার গান শোনেননি। আমি দ্বিজেন্দ্রলালের— 'এবার হয়েছি হিন্দু করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজি হে' গানটি গাইবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল এ-গানটিতে কীর্তনের সুর যোজনা করেছিলেন। কীর্তন ব'লে আমি তাঁর মূল গানের মাঝে মাঝে আখর দিয়ে গানটি গাইতাম। তাতে কীর্তনের রসটা ফুটতো আরও বেশী। বন্যা-সাহায্য উপলক্ষে জলসা ব'লে— গানের শেষে সেদিন একটি লাগসই আখর জুড়ে দিয়েছিলাম। গানের শেষে আছে—

'ভবে মিছে কেন গোল, বল হরিবোল,
রবে নাকো ভয়-ভাবনা।
দেখ, হরির কৃপায় দশ জনে খায়,
আমরাই কেন খাব না?'
এইখানে আমি আখর দিলাম—
বেশ করে নিলে—
হরির কৃপায় সবাই তো ভাই, দু'পয়সা বেশ করে নিলে।
ফন্ড খুলে দাও—
হরির কৃপায় হবে না পন্ড,
ফন্ড একটা খুলে দাও।
একটা কিছু অজুহাতে

ফন্ড খুলে দাও,
কন্যাদায় কি বন্যাদায়
অজুহাতে ফন্ড খুলে দাও।

এই 'বন্যাদায়' কথাটি শ্রোতারা খুবই উপভোগ করেছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে করতালি উপহার পেয়ে, উপহার পাওয়ার লোভ প্রাণের মধ্যে আরও প্রবল হ'য়ে উঠলো। ইচ্ছা হলো বেরিয়ে গিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে আসি। একটি বিরতির সময় প্রেক্ষাগৃহে তাঁর সমীপস্থ হতেই তিনি আমার দিকে চাইলেন। আমি তখন হাঁটু গেড়ে বসে নতমস্তকে তাঁকে প্রণাম করতে গেলাম। আর তৎক্ষণাৎ আমার আনত পৃষ্ঠদেশে গুম করে পড়লে একটা প্রচণ্ড কিল। আচার্যদেব বললেন, 'বাঁদর, পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে আমাকে গালাগালি দিয়ে এখন এসেছিস পেন্নাম করতে। তুই কেন বললি, হরির কৃপায় পাঁচজনে যেমন করে খায়, আমিও তেমনি এই বন্যাদায়ের ফন্ড খুলে বসেছি। বেরো আমার সুমুখ থেকে।'

তমলুকে খাদি-প্রদর্শনী। আচার্যদেবের কৃতী ছাত্র ডক্টর পুলিনবিহারী সরকার প্রফুল্লচন্দ্রকে তমলুক নিয়ে যাচ্ছেন সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধনের জন্যে। আমিও চলেছি সেই প্রদর্শনীতে উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইতে। পুলিনবাবুর নির্দেশমতো অপরাহ্নকালে হাওড়া স্টেশনে এসে দেখি, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আচার্যদেব বসে আছেন। পুলিনবাবু আমাকে ডেকে নিয়ে ঐ কামরাতেই তুললেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই উঠলাম ঐ কক্ষে। ধূমপানের বদঅভ্যাস ছিল বলে আচার্যদেবের সঙ্গে এক কামরায় যাবার ইচ্ছা ছিল না। সে-কথা পুলিনবাবুকে বলবার অবকাশই পেলাম না। কামরায় আর যে-সব যাত্রী ছিলেন অনেকেই আমার অপরিচিত। মনটা ভালো নেই। ট্রেন ধরবার তাড়াতাড়িতে বিকেলের চা ভাগ্যে জোটেনি, তার ওপর ধূমপানের এই ব্যাঘাত। ঠিক করলাম, মাঝের কোনো স্টেশনে অন্য কামরায় চলে যাবো।

ট্রেনের জানালার কাছে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছি। এমন সময় একটি স্টেশনে গাড়ি প্রবেশ করলো। ট্রেন মৃদুমন্দ গতিতে চলেছে। প্ল্যাটফর্মের উপরে দেখি, চা-বিক্রেতারা দু তিনজন দাঁড়িয়ে। তাদের ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে ট্রেন থামলো। আমি জানালা দিয়ে মুখ বের করে 'এই চা—এখানে— এই চা' বলে বারম্বার চিৎকার করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার চা-ওলা আমার কাছে আসতে না আসতে গার্ড বাঁশি বাজালে, আর গাড়িও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল।

হতাশ হয়ে ফিরে বসলাম নিজের আসনে। আচার্যদেব আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর ভর্ৎসনায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললেন। এ আর স্নেহ-সঞ্জাত শাসন নয়— একেবারে

মর্মভেদী তিরস্কার। বাঙালী জাতিটা যে ধ্বংসের পথে চলেছে তার অন্যতম কারণ চা--এ কথা বলতেও তিনি ইতস্ততঃ করলেন না। কতকগুলি অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্মুখে তিক্ত গালাগালি দিয়ে আমার প্রাণান্ত করে তুললেন। আমি নীরবে সমস্ত লাঞ্ছনা সয়ে যেতে লাগলাম। প্রায় আধ ঘন্টা সমানে আমার উপর বাক্যবাণ চালিয়ে তিনি নিজে থেকেই নিরস্ত হলেন।

সন্ধ্যা নাগাদ একটি ষ্টেশনে আমাদের নামতে হলো। সেখান থেকে মোটরযোগে তমলুক যাত্রা করতে হবে। ষ্টেশনে নেমে আচার্যদেব পুলিনবাবুকে বললেন, 'ও পুলিন, দেখ তো ষ্টেশনে চা পাওয়া যায় কিনা। নলিনীকে চা খাইয়ে নাও।'— ব'লে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কি রে, চা না পেয়ে খুব কষ্ট হচ্ছে? অমন নেশা করিস কেন?' সে- ষ্টেশনেও ভালো চা মিললো না। আমরা মোটরযোগে তমলুক অভিমুখে ছুটলাম। তমলুকে গিয়ে উঠলাম পুলিনবাবুর বাড়িতেই; একটি সুপ্রশস্ত ঘরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের থাকবার ব্যবস্থা হলো— আর তাঁর ঘরের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আমি! আমার ঘরে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছি, এমন সময় পুলিনবাবু ডাকলেন, 'এ ঘরে আসুন।'

আচার্যদেবের কক্ষে দেখি, চায়ের সরঞ্জাম সব এসে পড়েছে। আমি একখানি চেয়ারে বসলাম। পুলিনবাবু স্বয়ং চা তৈরি করতে বসলেন। একটি ছোট্ট টি-পট— তার মধ্যে চার-পাঁচ চামচ চা ফেলে আন্দাজ দেড় কাপ গরম জল দিয়ে সেটি পূর্ণ করলেন। পুলিনবাবুর কাণ্ড দেখে আমি তো ভেবেই আকুল। এ চা যে আমারই জন্যে তৈরি হচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেড় কাপ জল চার পাঁচ চামচ চা! পুলিনবাবু বিজ্ঞানের অধ্যাপক,কাজেই প্রতিবাদ করতে সাহস হলো না। দেখি, শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়! বেশিক্ষণ নয় – মাত্র দু'মিনিটকাল চা ভিজিয়ে তিনি সেই চা একটি বড় পেয়ালায় ঢেলে দুধ চিনি মেশালেন। অতঃপর যা ঘটলো তা আমার কাছে অচিন্তনীয়, সাধারণের কাছে অবিশ্বাস্য। সেই পেয়ালাটি পুলিনবাবু তুলে ধরলেন আচার্যদেবের সম্মুখে। আর আচার্যদেব পেয়ালাটি পরম আগ্রহভরে গ্রহণ করে বললেন, 'ওরে, আগে নলিনীকে দে— ও যে মরে গেল চা না পেয়ে।'

পুলিনবাবু আমার জন্য ঠিক হিসেবমতো জলে পরিমাণ-মতো পাতা দিয়ে চা তৈরি করলেন। বলতে ভুলে গেছি, চায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জন্য দুটি রেকাবিতে লবণাক্ত ও শর্করা-রস-সম্পৃক্ত খাদ্যসম্ভার পূর্ব থেকেই টেবিলের উপর সজ্জিত ছিল। আচার্যদেব পরমানন্দে চা পান করছেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি চা খাচ্ছেন যে বড়?' 'কেন, তাতে হলো কি? ও আমি একবার মাত্র খাই,সন্ধ্যায়।' আমি বললাম, 'ঐ একবারেই আপনি চার-পাঁচ বারের খাওয়া খাচ্ছেন। আপনার এক পেয়ালা তৈরি হয় চার-পাঁচ চামচ চায়ে। আমরা দিনে তিন বারে তিন চামচ চা খাই।'

আচার্যদেব বললেন, 'কিন্তু হিসেব করে দ্যাখ— শেষ পর্যন্ত ফল দাঁড়াবে এই যে, আমি চা খাই আর চা তোদের খেয়েছে! আজ বিকেলে চায়ের জন্যে যে কাণ্ডটা করলি! মনে হচ্ছিল, জানালা গলিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঝাঁপিয়ে পড়লি বুঝি।' কাঁহাতক আর তর্ক করি। হয়তো গালে একটি চড় বসিয়ে আমাকে থামিয়ে দেবেন। এত বড় যুক্তি তো আর নেই!

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কিন্তু তিনি যে কত বড় মানুষ ছিলেন তার সম্যক পরিচয় ভারতের বাইরের বিশ্ব বোধহয় জানে না। তাঁর মস্তিষ্কের খবরই তারা পায়নি। দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি অবতরণ করেননি কিন্তু তাঁর দেশাত্মবোধ রূপপরিগ্রহ করত অন্যভাবে। ধ্বংসাত্মক কার্যে নয়, সংগঠনের শক্তি প্রয়োগ করে তিনি দেশের অশেষবিধ কল্যাণসাধন করে গেছেন। বাঙালী জাতির দুর্দশা দেখে তিনি যেমন মর্মপীড়া অনুভব করতেন, তেমনি সেই দুর্দশা মোচন করবার উপায়ও নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করতে দ্বিধা করতেন না। এ-জন্য একশ্রেণীর লোকের কাছে তিনি প্রাদেশিকতা ও সঙ্কীর্ণতার অপবাদে অপকীর্তিতও হয়েছিলেন।

একদিন একটি সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইবার ভার ছিল আমার ওপর। সেই সভার সভাপতি আচার্যদেব। দক্ষিণ কলকাতায় সভা। আমি থাকি উত্তর কলকাতায়। বাসে রওনা হয়েছি। তখন কলকাতায় যাত্রিবাহী বাস চলাচলের সবে সূত্রপাত। ঘাঁটি থেকে বাস ছাড়ার বা গন্তব্যস্থলে বাস পৌঁছনোর বিশেষ সময়-নিয়ন্ত্রণ ছিল না তখন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাসের চালকরা ইচ্ছানুরূপ বিলম্ব করতো। এজন্যে আমি নির্দিষ্ট সময়ে সভায় পৌঁছতে পারলাম না। সভাক্ষেত্রে পৌঁছে দেখি, একা আমি নই— বক্তারূপে যাঁর বিজ্ঞাপিত হয়েছেন, তাঁরাও অনেকে তখনও পৌঁছতে পারেননি। কিন্তু আচার্যদেব আগেই এসে মঞ্চের উপরে বসে আছেন। আমি কাছে যেতেই তিনি বললেন, 'দেরি করলি যে?' আমি বিলম্বের কারণ জানালাম। তিনি বললেন, 'তুই বুঝি বাসেই যাতায়াত করিস?'

'বাসেও চলি, ট্রামেও চলি।' 'আচ্ছা বল দেখি, যতগুলি বাসে চড়েছিস তার মধ্যে ক'খানা বাঙালীর আর ক'খানা অবাঙালীর? আর সে-সব বাস যারা চালায়, যারা টিকিট বিক্রি করে, তাদেরই বা বাঙালী-অবাঙালীর হার কত?' আমি বললাম, 'তা আমি কি করে বলবো? তবে, এটা ঠিক যে, বাঙালীর হার খুবই কম। অধিকাংশ বাস অবাঙালীর। বাসের ভিতরেই মালিকের নাম লেখা থাকে। আর সে-সব বাসের চালক ও টিকিট-বিক্রেতারা প্রায় শতকরা একশো জনই অবাঙালী।' আচার্যদেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'বাংলা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে অবাঙালী হাতে। আর এদিকে তোরা ভারত স্বাধীন করবার জন্যে অন্ধের মতো বোমা রিভলবার ছুঁড়ছিস!'

বাংলার প্রতি তাঁর একটা অন্তরের দরদ ছিল। উগ্র রাজনীতিতে তিনি কোনো দিনই প্রমত্ত

হননি— সমাজনীতি ও অর্থনীতির দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল বিশেষরূপে নিবদ্ধ। আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলতেন, 'খেতে না জেনে জাতটা মরে যাচ্ছে! তোরা ভাত খাবি ফ্যান ঝরিয়ে, ডাবের জল খাবি শাঁসটুকু ফেলে দিয়ে,— সারবস্তু ত্যাগ করে গোটা জাতটাই অসার হয়ে গেল। এতে আর জাত কতদিন বাঁচবে? কর্তব্য-বুদ্ধি যার মরেছে তাকে বাঁচাবে কে?'

কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে নূতন শর্ট-ওয়েভ ট্রান্সমিটার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 'বেতার জগতের' একটি বিশেষ সংখ্যা বের করবার চেষ্টা করছি। যদি একটি লেখা আদায় করতে পারি, এই ভরসা নিয়ে একদিন সকালবেলায় গেলাম আচার্যদেবের কাছে। সায়েন্স কলেজের বাড়িতে গিয়ে একটি প্রণাম করে দাঁড়ালাম তাঁর সম্মুখে। তিনি বললেন, 'মতলব কি?'

আমি আমার প্রস্তাব নিবেদন করলে, তিনি বললেন, 'কি কাগজ বললি?— বেতার জগৎ। সেটা আবার কারা বের করে?' 'আজ্ঞে গবর্নমেন্টের কাগজ, এই কলকাতা রেডিও ষ্টেশনের মুখপত্র।'

আচার্যদেব একেবারে দুর্বাসা মুনির ভূমিকা অভিনয়ের ভঙ্গীতে বললেন, 'রেডিওর কাগজ? তুই তার সম্পাদক? বেরো আমার ঘর থেকে। রেডিওর কাগজের জন্য আমার কাছে লেখা চাইতে এসেছিস? দূর হ।'

আমি অবলীলাক্রমে সমস্ত অপমানের গ্লানি মুছে ফেলে বললাম, 'আপনি বৈজ্ঞানিক হয়ে রেডিওর ওপর এত চটা কেন? রেডিও বিজ্ঞানের কত বড় দান, সেকি আমাকে বলতে হবে আপনার মতো বৈজ্ঞানিকের কাছে? রেডিও দেশের কত উপকার করছে।'

আচার্যদেব আমার লেকচার থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'সে ইয়োরোপ আমেরিকার রেডিও। আর দেশের সর্বনাশ করছে তোদের রেডিও। খালি গান আর থিয়েটার।' আচার্যদেবের উষ্মা দেখে আমার হাসিই পেল। বললাম, 'আপনি আমাদের কলকাতা ষ্টেশনের সব প্রোগ্রাম কোনদিন শুনেছেন?' 'রক্ষা কর বাবা, সব কাজকর্ম ফেলে তোমাদের রেডিওর গান শোনার আমার সময়ও নেই আর ও-রকমের রুচিও নেই।'

আমি বললাম, 'আপনি জানেন, আমাদের কলকাতা ষ্টেশনে বিদ্যার্থীমণ্ডল বলে একটা অনুষ্ঠান আছে, সে অনুষ্ঠানে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে নিয়মিত আলোচনা হয়? আর সে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন স্যার সি ভি রমন, অধ্যক্ষ জে আর ব্যানার্জি, ডঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ সরোজকুমার দাস প্রভৃতি অধ্যাপকেরা?' আচার্যদেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বলিস কি রে? সত্যি বলছিস?'

আমি বললাম, সত্যি-মিথ্যার প্রমাণ পরে দেব। আর শুনুন, বাংলাদেশের পল্লী গ্রামের

অবস্থা-উন্নয়নের জন্যে পল্লীমঙ্গল আসর আছে, সেখানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে পল্লীসংগঠনমূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। মহিলা-মজলিস আছে একটি। সে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের নারী উন্নতির জন্য বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হয়ে থাকে। অনেক শিক্ষিত মহিলা সে অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে তাঁদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। একটি অনুষ্ঠান আছে— ছোটদের বৈঠক। বারো বছরের নিম্নবয়স্ক ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সে বৈঠকে যোগদান করে বৈঠকের পরিচালকের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে অনেক বিষয় শেখে। পরিচালক মহাশয় গল্প-বলার ভঙ্গীতে বহু বিষয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেন।' ইত্যাদি অনেক কথা বলে একখানি 'বেতার জগৎ' তাঁর সামনে খুলে ধরলাম। 'বেতার জগৎ' খানি আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাঁকে দেখাবার উদ্দেশ্যেই। আমি যে-কয়টি অনুষ্ঠানের কথা বললাম, সেই অনুষ্ঠানগুলি এবং বক্তাদের নাম বেশ ভালো করে নিরীক্ষণ করে তিনি বললেন 'তাইতো রে, এ-সব সত্যিই হয় কলকাতার রেডিওতে? কই, এ-সব কথা তো কেউ আমাকে এতদিন বলেনি?'

আমি সাহসে ভর দিয়ে বললাম, 'এখন আমাকে লেখা দেবেন তো?'

আচার্যদেব বললেন, 'লেখা দেবো তোকে। কিন্তু ঐ যে-কটা প্রোগ্রামের কথা বললি, ঐগুলোর খুঁটিনাটি ব্যাপার আর আর যা আছে সবগুলি বেশ গুছিয়ে যদি আমাকে লিখে দিস, তাহলে আমার প্রবন্ধটি রচনা করবার সুবিধে হয়।'– ব'লে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ আমার সামনে রেখে বললেন, 'এই নে কাগজ। তাড়াতাড়ি লেখা চাস যদি, তাহলে ওগুলো লিখে দিয়ে যা!'

আমি ঘরের একটি কোণে বসলাম, লিখতে লাগলাম। আচার্যদেবকে বেশী পরিশ্রম না করতে হয়, এইভাবে বিদ্যার্থীমণ্ডল, মহিলা মজলিস, ছোটদের বৈঠক এবং সাধারণপ্রোগ্রামের মধ্যেকার শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের কথাগুলি বেশ বিশদ করে গুছিয়ে লিখলাম। ফুলস্ক্যাপের দুটি পৃষ্ঠা পূর্ণ করে লিখতে এক ঘন্টারও বেশী সময় লাগল। লেখাটি শেষ করে তাঁকে দিলাম। তিনি বললেন, 'কি লিখলি, পড় তো শুনি।'

পড়লাম: লেখাটি শোনার পর আচার্যদেব বললেন, 'বাঃ, এ তো বেশ হয়েছে রে।' – ব'লে সেই লেখাটিরই তলায় নিজের নাম-সই করে দিলেন— শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। আমি বললাম, 'ও কি, আপনি যে এতেই আপনার নাম-সই করে দিলেন!' আচার্যদেব হাসতে হাসতে বললেন, 'বড়লোকদের সেক্রেটারিরাই লেখে, আর তাঁরা শুধু নাম-সই করে থাকেন, জানিস নে?' কী আর করি,— ঐ লেখাই ছাপা হলো বিশেষ সংখ্যার 'বেতার জগতে'।

CORPORATION PAYS ITS HOMAGE

THE Corporation of Calcutta, at their meeting on Wednesday the 22nd June, 1944 placed on record their deep sense of sorrow and loss at the death of Acharyya Prafulla Chandra Ray, "a great scientist, educationist and philanthropist and a pioneer in industry" and desired that an expression of their sincere sympathy and condolence be conveyed to the members of the bereaved family.

As a mark of respect to his memory the meeting called for the day was adjourned without transacting any business.

Two motions of condolence had been tabled-- one by Kabiraj Satya Brata Sen and the other by Mr. Dhirendra Nath Ghosh. The Mayor himself moved them from the chair, the House adopting them standing in solemn silence.

The Last of the Giants

Addressing the House, the Mayor, Mr. Anandi Lal Poddar said--

"India mourns the death of Sir P C. Ray. He was one of the giants among Bengalis, who made Bengal famous not only in India but throughout the world One by one, such towering personalities have left us, and Sir P.C. Ray is the last of these giants."

"He was a great scientist and the founder of a school of Chemists in India. He was also a pioneer industrialist. He felt that the economic salvation of Bengal could not be achieved without the Bengalee taking to trade, commerce and industry The Bengal Chemical Pharmaceutical Works, the Indian Pottery works and other similar industrial organisations bear eloquent testimony to his achievements in this line."

"Sir P.C Ray was one of the greatest social reformers and philanthropists that Bengal has produced He always stretched forth his helping hand to the down-rodden and suffering humanity He was a great patriot and it was he who said, 'Research can wait, Swaraj cannot."

"Sir P C Ray was associated with the Corporation as Chairman

of the Primary Education Special Committee, appointed at the instance of the first Mayor, Deshabandhu Chittaranjan Das in 1924 and in that capacity he gave a new orientation to the scheme for promoting primary education in the city of Calcutta."

"In his death, India has lost one of her noblest sons and the city of Calcutta, one of its distinguished citizens."

"With these words, I move the resolutions of which Mr. D.N. Ghosh and Kabiraj Satyabrata Sen have given notice."

'I ask you gentlemen, to rise in your seats and carry the resolution standing '

MR. D.N. MUKHERJEE

On behalf of the Hindu Mahasabha group, Mr. Debendra Nath Mukherjee rose to offter his reverential homage and tribute of respect to the memory of the departed great. He said that Acharyya Prafulla Chandra Ray was one of those illustrious sons of Bengal who revived the ancient glories of India and won the respect and approbation of the entire civilised world. Like the ancient Rishis he cheerfully embraced the austerities of Brahmacharyya and dedicated his life to the service of his countrymen. It was impossible to make a correct appraisal of his contributions as a scientist of international reputation , as the founder of a particular school of research, as a pioneer in the field of industrial development for the economic advance of his country and as an ardent patriot and lover of humanity

MR. S.C.RAY CHAUDHURI

On behalf of the Congress group, MR S.C. Ray Chaudhuri associated himself with the motion before the House. Acharyya Prafulla Chandra Ray was the last of those great Bengalees of the 19th century who excited the admiration of the world by their remarkable achievements in diverse spheres. He was not only a great scientist. He was also a great patriot and a great philanthropist. Although he had died full of years and full of honours, still his loss was an irreparable loss to Bengal

MR. J. H. METHOLD

Associating himself with the motion before the House, Mr J H. Methold said that Sir P C Ray was undoubtedly a pioneer of chemical industry in this country, which needed developing so much His philanthropy was such as made his name a household word in Bengal, and his membership of the Royal Society was a fitting recognition of his valuable contributions to Science

MR. A. SATTAR

On behalf of the Muslim League group, Mr Abdus Sattar associated himself with all the sentiments expressed on the floor of the House this afternoon The death of Sir P C Ray had removed from the scene a great scientist and industrialist His achievements in the domain of science and industry were unique He was held in high esteem by all sections of the community, and they deeply mourned his loss.

MR. SOMNATH LAHIRI

On behalf of the Communist Party, Mr Somnath Lahiri associated himself with the resolution before the House He pointed out that although Sir P C Ray was born at a time when Bengal was backward socially, yet he looked forward to the future and fought against superstitions and social tyrannies and iniquities He waged war against the Hindu society based on the feudal system He was one of the few great persons in Bengal who endeavoured to build a great collective society after the pattern of Soviet Russia.

The Calcutta Municipal Gazette: P.C.Ray Memorial Supplement
24th June, 1944

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY PROCEEDINGS, 1944

VOL. LXVII, No. 6. Page-436

Proceedings of the Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Govt of India Act, 1935

The ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta on Monday the 19th June 1944 at 4 PM

PRESENTS

Mr Speaker (the Hon'ble Mr. Syed Nausher Ali) in the Chair, 10 Hon'ble Ministers and 174 members

OBITUARY

Mr Speaker Ladies and Gentlemen it is my sad duty to bring before you a most painful event in the history of Bengal *Acharya Sir Prafulla Chandra Ray* passed away on Friday, the 16th instant in the University College of Science A Scientist of international repute his contribution to the science of Chemistry will make him immortal if he was a great as a man of science, he was perhaps greater still as the maker of a School of Indian Chemists and Industrialists who carried into effect the ideal of national service through Industrial and scientific achivements As a Philanthropist his heart spontaneously went out to the oppressed and the distressed and his services for relief of human sufferings will be remembered by generations As an ardent lover of his country, he wanted to see India raised to her fullest stature in all spheres of activity working shoulder to shoulder with the rest of the world in contributing to the peace, prosperity and happiness of mankind His dictum "Research can wait but Swaraj can not" will remain inscribed in the heart of every Indian so long as India does not attain independence He was a true Swadeshi in thought and action He lived a life of truth and simplicity and was the very embodiment of simple living and high thinking He is the last of the race of giants that Bengal produces during the latter half of the last century His was a great life mostly lived in the service of science and humanity Bengal and as a matter of that the whole of India mourn

his loss and I feel it is the desire of the house to sent a message of condolance to the bereaved family I hope members will signify their assent by rising in their places.(Members rose in their seats)

Thank you, Ladies and Gentlemen, Secretary will take necessary action. As a mark of respect to the great departed, ladies and gentlemen, I with your concurrence, adjourn the House till 4 P. M. tomorrow.

ADJOURNMENT

The house was accordingly adjourned at 4.05 P. M. till 4 P. M. on Tuesday the 20th June, 1944 at the Assembly House, Calcutta

Bengal Council's Tributes

A condolence resolution on the death of Sir P.C. Ray was passed by the Bengal Council on June 19 last and, as a mark of respect the House adjourned without transacting any business

The resolution, which was sponsored by Khan Bhadur Saiyed Muazzamuddin Hossain, Leader of the House, read: "This Council, express its deepest sorrow and sense of irreparable loss which the country has sustained at the death of Acharyya Sir P.C. Ray who distinguished himself during his long life as a scientist of international fame creator of an Indian school of chemists. founder of a great chemical industry,helper of the poor and the distressed and above all as a philanthropist and selfless man, and conveys its sincerest sympathies to the bereaved members of his family"

The President, Sir B.P. Singh Roy, described Sir P.C. Ray's death as a national calamity. Sir Prafulla, he said, was the creator of a band of selfless scientists who were helping in the expansion of the bounds of human knowledge.

Mr. Kamini Kumar Dutta, Khan Bahadur Abdul Hamid Chowdhury (Deputy President), Mr D.L Barua, Mr Haridas Majumdar, Mr. Lalit Chandra Das. Mr. Bankim Chandra Mukherji, Khan Bhadur Naziruddin Ahmed, Mr. Noor Ahmed, Mr. A E. Clarke and Mr Habibulla Bahar also spoke dwelling on various aspects of Sir P.C. Ray's liffe and work.

CONDOLENCES & TRIBUTES

The Last Of Bengal's Giants

"One of the greatest of Indians has passed away by the death of Acharyya Prafulla Chandra Ray If he was great as a scientist, winning international fame, he was greater as a builder of a vigorous school of chemists and industrialists who have spread, their activity in all parts of India. His was a truly dedicated life, and the like of him India will not see again for generations to come. As a man none can be simpler and nobler than he His services were always at the disposal of suffering humanity irrespective of race, creed or colour. The last of Bengal's versatile giants born in the 19th century has passed away after a full life dedicated to the cause of national regeneration "

Dr. S.P. MOOKHRJEE

One More Great Savant

"The death of Sir P. C. Ray removes one more great savant who has raised India in the esteem of the world His was a life dedicated in the truest sense to the service not only of science but also of his country It was his stirring exhortation at the beginning of this century which induced the Bengalee to take to Industry and commerce in increasing numbers He himself showed the way and if Bengal has now attained a position of major importance in the industrial sphere, it is largely due to Sir P C Ray's precept and example The debt which Bengal owes to him can never be repaid but the greatest tribute which Bengalees can pay to his memory is to concentrate on the industrial uplift of the province with the aid of science;."

KHWAJA SIR NAZIMUDDIN

Friend Of Bengal

"We were stunned by the news of the death of Sir P. C Ray, while we were conducting a public meeting in connection with the death anniversary of the late Deshabandhu C. R Das The 16th of June

will thus be ever memorable in the Bengali calendar as the date of the demise of two of the greatest men that Bengal has yet produced. Sir P C Ray and Sir J C. Bose both giants in Indian Educational Service were professors of Chemistry and Physics respectively in the Presidency College in June 1889, and I was fortunate in being one of the first batch of their students in the Presidency College What Bengal had lost in the demise of Sir P C Ray cannot be sufficiently described in words She has lost not merely an eminent scientist but a guide, philosopher and friend of the Bengali people The world at large is poorer to-day by the loss of an eminent scientist"

A.K. FAZLUL HUQ

Scientist And Social Worker

"In the death of Sir P C Ray, India has lost a distinguished scientist, research worker and social reformer He devoted his life to the pursuit of scientific knowledge and was the author of the "History of Hindu Chemistry"

SIR P. S. SIVASWAMY IYER

A Great Scientist

"Sir P C Ray was a great Scientist and his death is great loss to the nation specially in the post war period of industrial development"

Dr. N. B. KHARE

He Inspired Thousands

"India mourns the loss of one of her greatest sons Acharyya Ray was a great scientist, a great teacher and a still greater patriot He inspired thousands of young men to pursue of knowledge as no one else did"

SIR J.P. SRIVASTAVA

TRIBUTES OF THE UNIVERSITIES

Alma Mater's Tribute (Calcutta University)

The Syndicate of Calcutta University, at a special meeting on June 19, adopted a resolution of condolence on the death of Sir P C Ray

The resolution stated that by Sir Prafulla's death India had lost one of her greatest sons and the University had suffered an irreparable loss "Sir Prafulla had rendered great services to the University as its first Palit Professor of Chemistry, as Dean of the Faculty of Science, as a Fellow and as a benefactor, A scientist of world-wide reputation, the creator of a school of chemistry in India, an educationist of liberal ideas, a true patriot a great philanthropist, a friend of the poor and a pioneer of industrial regeneration in this Province Sir Prafulla was a dynamic personality and was deeply loved and revered by his countrymen To generations of students he was an ideal teacher and his saintly ways of life were an example to all"

Dacca University

At a meeting of the Executive Council of Dacca University, held on Saturday, June 17 last, Khan Bahadur Dr. M. Hasan, Vice-Chancellor made a reference to the death of Sir P C Ray, whom he described as one of the greatest personalities of India. Sir Prafulla was formerely a member of the Court of the University

Andhra University

The Vice-Chancellor of Andhra University in a telegram to the Vice-Chancellor of Calcutta University states "India and the world of science mourn Sir P C Ray's death An ideal patriot, scholar and teacher his was a unique personality enthroned on our love, esteem and admiration"

প্রফুল্লচন্দ্রের ভলান্টিয়ার

চিন্মোহন সেহানবীশ

ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে মনে পড়ে উত্তরবঙ্গের প্রবল বন্যার কথা। বন্যাপীড়িত মানুষদের সাহায্যের জন্য গড়ে উঠল সংকটত্রাণ সমিতি। সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসু। আর রোজই কাগজে পড়ি সংকটত্রাণ সমিতির পক্ষ থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবেদন "দুর্গতদের দুঃখ মোচনের জন্যে মুক্তহস্তে দান করুন।"

আমি তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আমি বন্ধুবান্ধব—আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে অনতিবিলম্বে সামান্য কিছু টাকা—বোধহয় টাকা পঁয়ত্রিশের মত-আর বেশ কিছু পুরানো কাপড়-জামা সংগ্রহ করে ফেললাম। চিঠির বয়ান নিশ্চয় ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য নয়, তবে খানিকটা তার ভাষা ছিল এই রকমের। তখন পর্যন্ত যত গুরুগম্ভীর ও কঠিন বাংলা শব্দ জানতাম সেইগুলো ব্যবহার করে আমার চিঠিটা দাঁড়িয়েছিল ঃ

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

> সংবাদপত্রে আপনার করুণ আবেদন পাঠ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি বিহ্বল বোধ করিতেছি। দুর্গতদের দুঃখ মোচনের জন্যে বন্ধুবান্ধব—আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে যে—সামান্য অর্থ ও জামা-কাপড় সংগ্রহ করিয়াছি তাহা আপনার শ্রীহস্তে দান করিয়া জীবন সার্থক করিতে চাই। আশাকরি আমার এই দীন সংগ্রহ গ্রহণ করিবেন।
>
> ইতি সেবক, চিন্মোহন সেহানবীশ।"

এক সপ্তাহের মধ্যেই উত্তর এল। আমার চিঠির ভাষা পড়ে প্রফুল্লচন্দ্র ঠাউরেছিলেন আমার বয়স অন্ততঃ ষাট। নইলে উত্তরে তিনি কেন চিঠির পাঠ লিখবেন 'শ্রদ্ধাস্পদেষু'। আচার্যদেবের সেই চিঠি নিয়ে পরদিনই আমি বিজ্ঞান কলেজের দোতলার বারান্দায় হাজির হই। দেখলাম তিনি একটি চেয়ারে বসে আছেন। আমি টিপ করে প্রণাম করে তাঁর হাতে তাঁরই চিঠিটা দিলাম। চিঠিটাতে চোখ বুলিয়ে তিনি আমায় বললেন, "ডেকে নিয়ে আয়।" অর্থাৎ আমার মামা, বাবা বা কাকা এমন কোন গুরুজন, সম্ভবত যিনি চিঠিটা লিখেছেন, তাঁকে ডেকে আনতে হবে। আমি বিনীতভাবে জানালাম "আজ্ঞে, আপনি আমায় এই চিঠি লিখেছেন।" শুনেই তিনি বললেন, "তোকে? এই বয়সেই জোচ্চুরি?" বলেই ঠাস্ ঠাস্

করে দু'গালে দুই চড়।

যাঁরা প্রফুল্লচন্দ্রকে কিছুমাত্র জানতেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন সে–চড়ের নিহিতার্থ এরপর থেকে তুই আমার ভলান্টিয়ার হলি। এরপর তিনি বললেন, চল দেখি, কি আনলি? বলেই সেই পঁয়ত্রিশ টাকা ও জামা–কাপড়ের পোটলা–পুটলি সমেত আমাকে নিয়ে নেমে এলেন একতলায়। সেখানে একটা মস্তবড় ঘরে ঢুকেই আমার চক্ষু স্থির! একদিকে কেমিষ্ট্রি ল্যাব্‌রেটারির সেই চিরপরিচিত সালফুরেটেড হাইড্রোজেনের বিশ্রী গন্ধ, আর অন্যদিকে ছোটবড় পোটলা–পুটলি ছাত অবধি পৌঁছেছে। তারই মধ্যে বিজ্ঞানের ডক্টরেট করছে এমন কয়েকজন তরুণ ছাত্র বসে আছে। প্রফুল্লচন্দ্র গিয়েই তাদের বললেন, টাকা আর জামা–কাপড়ের রসিদ লিখে দে। আমি তখন বললাম,পঁইত্রিশ টাকার একটা রসিদ দিলেই চলবে। শুনে তিনি আমায় ধমক দিয়ে যে কথাগুলো বলেছিলেন আজও তা আমার মনে আছে এবং আজও যারা চাঁদা আদায়কারী প্রত্যেক তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের পক্ষে একান্ত পথনির্দেশক। বললেন, "পঁইত্রিশ টাকার রসিদ দিলে তার মানে হবে তুই আমাকে পঁইত্রিশ টাকা দিয়েছিস। কিন্তু কথাটা কি তাই?" আমি বললাম, "না, আমি চার আনা আট আনা করে অনেকের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি।" প্রফুল্লচন্দ্র ধমক দিয়ে বললেন, "তাহলে? প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলবি এই রসিদের মধ্যে তোমার চার আনা আট আনা আছে? দ্যাখ, পাবলিক ফান্ড নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রত্যেককে রসিদ দিতে হবে। একথা কখনও ভুলিসনি!"

অতএব প্রায় আধঘন্টা ধরে চার আনা আট আনার হিসেব লিখতে হল। আমি ততক্ষণে কাতর হয়ে বললাম, জামা-কাপড়ের জন্যে অন্তত: লিখে দিন অতগুলো ধুতি, অতগুলো শাড়ী। এই লিখে দিলেই চলবে। নইলে, আমার মনে নেই কোন মাসী–পিসির কাছ থেকে কোন জামা–কাপড় পেয়েছি। প্রফুল্লচন্দ্র নরম হয়ে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির কাছে আবার একটু দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, "তোর গায়ে কেমন জোর আছেরে?" আঠার বছর বয়সের কোন ছেলে মানবে যে তার গায়ে জোর নেই? আমিও জানালাম, তা মন্দ নয়। উত্তর শুনে হঠাৎ প্রফুল্লচন্দ্র আমার পেছন দিকে গিয়ে পিঠে চড়ে বসলেন। তখন সত্যিই আমি রীতিমত আখড়ায় যাই, গায়ে যথেষ্ট জোর। তবুও বলি, সায়েন্স কলেজের দোতলার সিঁড়ি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা মানবেন সে বাড়ির দোতলা যেকোন বাড়ির তিনতলার সমান। তবুও আচার্যকে দোতলায় পৌঁছে দিতে তিনি খুশী হয়ে আমার বুকে দুটো ঘুষি মেরে বললেন, "বাঃ বেশ। চল, তোকে একটা প্রাইজ দেব।" আমাকে তাঁর ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি আমার হাতে দিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের এক বোতল 'রোজ সিরাপ'। আমি প্রফুল্লচন্দ্রের প্রাইজ নিয়ে সদর্পে সেদিন বাড়ি ফিরে বীরের সংবর্ধনা পেলাম। তারপর

থেকেই আমি প্রফুল্লচন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ভলান্টিয়ার।

মনে পড়ে, পরের বছর ১৯৩২ সালে টাউন হলে আয়োজন হয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্রের সপ্ততি জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের। তাঁর ডাকে সকাল থেকেই আমি টাউন হলে হাজির উৎসব কক্ষ সাজানোর কাজে হাত লাগাবার জন্যে। গিয়ে দেখি চেয়ারে বসে আছেন স্বয়ং আচার্য। আমার মনে একটা খটকা লাগল—ওঁরই সংবর্ধনা, অথচ উনি নিজেই তার আয়োজন করছেন! কিন্তু সে প্রশ্ন তাঁকে করবার মত আমার সাহস ছিল না। যাঁদের ছিল সে-রকম কয়েকজন তাঁর বিখ্যাত শিষ্য মেঘনাদ, দুই জ্ঞান প্রমুখ, ভেতর থেকে বেরিয়ে তাঁকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন "একি, আপনি এখন এখানে কেন? আপনার তো আসার কথা সন্ধ্যেবেলা সংবর্ধনার সময়।" প্রফুল্লচন্দ্র সটান উত্তর দিলেন, "তা কি আর হওয়ার জো আছে? যেটি দেখব না সেটিই আর হবে না।" অতএব, প্রফুল্লচন্দ্রকে নিজেকেই তদারকি করতে হবে তাঁর সংবর্ধনার। আর আমরাও প্রবল উৎসাহে তাঁর অবিশ্রাম 'এটা কর', 'ওটা কর' নির্দেশে ছুটোছুটি করতে লাগলাম চারদিকে।

যাহোক, বিকেলবেলা উৎসব শুরু হবার সময়তো এসে গেল। মঞ্চের উপর ছিল দুটি চেয়ার। একটি মস্ত বড়, অন্যটি তার চেয়ে কিছুটা ছোট। ঘরে ক্রমশ: লোক জমছে। ওদিকে বড় চেয়ারটায় বসে আচার্য আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন 'এটা কর', 'ওটা কর'। ঘড়ির দিকে আমরা কেউ তাকাইনি। তিনিও না, আমরাও না। অথচ ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে উৎসব কক্ষে উপস্থিত হলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের নির্দেশ দিতে দিতে হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন। তারপরে দ্রুতপায়ে মঞ্চ থেকে নেমে কবিকে হাত ধরে আমন্ত্রণ জানালেন মঞ্চে আসবার জন্যে। অথচ অনুষ্ঠান-সভাপতিকে মঞ্চে আনবার দায়িত্ব নিশ্চয়ই তাঁর ছিলনা। কিন্তু কে তোয়াক্কা করে অতসব আনুষ্ঠানিকতার। তারপর আমরা মঞ্চ থেকে নেমে এসে দেখলাম রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র দুই মহারথীর কিছুটা যেন ধস্তাধস্তি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আজ এই বড় চেয়ারে বসবার কথা আপনার। আর প্রফুল্লচন্দ্র বলছেন, এই চেয়ারে বসতে গেলে যে চেহারা লাগে সবাই জানে আমার সেরকম চেহারা নেই। আর সবাই এও জানে সে-চেহারা ভারতবর্ষে কার আছে।

সভা তো শুরু হল। রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার ভাষণের কথা সকলেই জানেন। আমি তার পুনরাবৃত্তি করব না। 'একোহং বহুস্যাম' কথাটি বলে তিনি বলেছিলেন, এক প্রফুল্লচন্দ্র বহু হয়েছেন তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে দিয়ে। আর সবকিছু ভাগ করলে কমে যায়, কিন্তু জ্ঞান ভাগ করলে কমে যায়না তা বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সে বক্তৃতা পাওয়া যায় তাঁর রচনাবলীতে।

কিন্তু আমার খুব দুঃখ হয় যে কবির ভাষণের উত্তরে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভাষণের কথা আজ সবাই ভুলে গেছে। হয়তো পরদিন সামান্য কিছু বেরিয়েছিল। কিন্তু ঐ সময় টেপ করবার ব্যবস্থা ছিল না, এমনকি কবির ক্ষেত্রে যেটা হত সেই অনুলিখনেরও আয়োজন ছিল না প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষণের ক্ষেত্রে। তাই প্রফুল্লচন্দ্রের সেই আশ্চর্য প্রতিভাষণ আজ হারিয়ে গেছে।

তবুও, তারই কয়েকটা কথা স্মৃতিথেকে উদ্ধার করে বলবার চেষ্টা দিয়ে আমি এই লেখাটি শেষ করব। স্বভাবতঃ, এইসব উপলক্ষে সংবর্ধিত ব্যক্তিরা একটু স্মৃতিচারণে প্রবৃত্ত হন। প্রফুল্লচন্দ্রও হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ ছোটবেলা থেকেই আমি একটু Precocious ছিলাম, আপনারা যাকে বলেন এঁচোড়ে পাকা। বাড়িতে 'বঙ্গদর্শন' আসত। তাতে তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল 'বিষবৃক্ষ'। আমি মুগ্ধ হয়ে ধারাবাহিক সে উপন্যাস পড়ে ফেললাম। এই বলে তিনি নিজের দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন, সে বিষবৃক্ষের ফল যে কি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। কবি সাধারণত উচ্চহাস্য করতেন না। তবে তিনি যে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিটি কথা বিশেষভাবে উপভোগ করছিলেন সেটা কবির মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তারপর, প্রফুল্লচন্দ্রের ছিল বিস্ময়কর স্মরণশক্তি। শুধু তাঁর নিজের বিষয় নয়, দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও (যাঁরা পড়েছেন তাঁদের নিশ্চয় মনে পড়বে Calcutta Gazette-এ শেক্সপীয়র সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধের কথা) তিনি ছিলেন বেশ ওয়াকিবহাল।

সেদিনও তিনি ক্রমাগত আমাদের শোনালেন মাইকেল থেকে আরম্ভ করে মানকুমারী বসু, কামিনী রায় প্রমুখ নানা কবির বিচিত্র ধরনের সব কবিতা। আর তারপর, রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন তাঁর অজস্র কবিতা। তাতে 'কথা ও কাহিনী'ও ছিল, 'কচ-দেবযানী' এমনকি 'পূরবী', 'বলাকা' কিছুই বাদ থাকেনি। কিন্তু হঠাৎ তিনি কবির দিকে হাতজোড় করে বললেন, কিন্তু দোহাই, আপনি এখন যে কবিতা লিখছেন তা আমি কিছুই বুঝছি না। আমরা, যারা তরুণ সেখানে উপস্থিত ছিলাম তারা বুঝলাম যে, তখন যাকে বাজারে বলা হত 'গদ্য কবিতা' সেটা প্রফুল্লচন্দ্রের ঠিক পছন্দ নয়--মিলটিল না থাকলে তাঁর বোধকরি মন উঠত না। রবীন্দ্রনাথ একটু হেসে বললেন, আজকে যা বলেছি সেটা বুঝতে পেরেছেন তো? আচার্য বললেন, নিশ্চয়ই। কবি বললেন, তাহলেই হবে।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে যে, কবির জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছিল গত বছর আর আমারটা পালিত হচ্ছে এ বছর। এর থেকে আপনারা কেউ মনে করবেন না কবি আমার চেয়ে বছর খানেকের বড়। আসলে তিনি আমার চেয়ে মাত্র তিন মাসের বড়। "তবুও বড় তো !" বলেই তিনি আমাদের সকলের সামনে নীচু হয়ে কবির প্রবল

আপত্তি সত্ত্বেও তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমরা সকলেই অবাক হয়ে দেখলাম মঞ্চের উপর ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মনীষীর এই আশ্চর্য ঘাত-প্রতিঘাত--সবটাই অবশ্য পরম সহৃদয়ে ও কৌতুকভরে।

STUDENTS' HOMAGE

Like Dadhichi of old Acharyya Ray had given himself away in the service of his country and its people. observed Prof Humayun Kabir presiding at a largely attended public meeting convened by the United Students' Association at the Mahabodhi Society Hall, Calcutta on Sunday, June 18

A resolution expressing sorrow at the passing of Acharyya Ray and calling upon the people to work for the freedom of the country and emancipation of its people in the light of his example was unanimously adopted at the meeting

Himself a student all his life, said Prof. Kabir. Acharyya had a profound love for the student community His door was ever open to them, as was his heart. Science was, no doubt, his pet subject but he had a profound knowledge of other subjects as well His work, "The History of Hindu Chemistry", displayed his remarkable knowledge both of science and history

Referring to Acharyya Ray's partiotism, Prof Kabir said that Acharyya Ray had a burning love for the country which found expression through his humanitarian work His work in connection with the Bangiya Sankat Tran Samity would ever be remembered by his grateful countrymen His was a noble nature which made no distinction between the rich and the poor. the high and the low He had made the cause of the country his own and therein lay his popularity In his death they were feeling the loss of a dear relative. like Dadhichi of old he had given himself away in the service of his country and its people. The best honour that they could do to his memory would be to imbibe the lesson of his great life and to strive to work up to it

Acharya Ray and Chemical Research in Modern India

J. N. Roy

.... "He worked with a mission despite all the humililation he had to suffer and his greatest achievement was the fulfilment of his mission. A story which Mr. Hemendra Prasad Ghosh, the Editor of the Basumati, related at a public meeting may be recorded here. It was in the early part of this Century, when Sir J.C. Bose and P.C. Ray were at the Presidency College, the former was insulted by the then Principal of the College. Tagore, the poet, advised Sir J.C. Bose to resign from the College along with P.C. Ray. The National Council of Education (a non–Government body) would give the scientists facilities for research in a new institution which they would build for them. Bose was all in favour of resigning but Ray advised him not to do so He was doubtful if another laboratory with necessary equipments could be built easily and it might take ages to build a laboratory. The consequence would be that their researches and training of students would be halted. Therefore, personal insult was considered to be too small a thing in the greatest interest of their mission. Had Bose & Ray resigned in 1905, we shudder to think what would have been the state of science in this country now He was once offered the principalship of a muffasil College.The acceptance of this post would have removed the stigma of his serving as a Provincial Service Officer at the Presidency College, but as that muffasil College did not have adequate laboratory facilities, he promptly turned down the offer. Had he elected to accept this post, there would have been no school of Chemistry nor probably the **Indian Chemical Society**"....................

আচার্যদেব (১৯৪০)

সত্তা

সহজ মানুষকে নমস্কার

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষক হিসেবে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র দেশের ছাত্রদের মনে কত বড় স্থান অধিকার করে আছেন, তা কারো অবিদিত নাই। দু'একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখেছি কি গভীর স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রীতির আদান-প্রদান চলেছে রায়মহাশয় এবং তাঁর শিষ্যমণ্ডলীতে! মনে তখনি খেদ জেগেছে হায় এই মানুষটিকে ঐ গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধ নিয়ে বোঝা আমার অদৃষ্টে ঘটলো না। আমরা কয়েকজন আছি যারা যুবা স্যার প্রফুল্ল রায়কে দেখেছি, আজও দেখছি সেই মানুষটিকে; বুড়ো হয়ে গেছেন কিন্তু সেই আগেকার সদাপ্রফুল্ল পুরুষ। কালের সঙ্গে আমরা বদলাই প্রায় বেশিরভাগ মানুষই; বয়স এসে পরিয়ে দিয়ে যায় নানা সাজ: ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নানানতরো মুখোস বদলিয়ে চলি সংসার পথে; আড়ালে পড়ে যায় আসল মানুষটি। এই যে ইচ্ছাকৃত এবং কালের কৃত বদল— সাজে গোজে চালে চোলে— ঘরে বাইরে মানুষকে একটা কৃত্রিমতার আবরণে আড়াল করে তফাতে মঞ্চে তুলে রাখে, তেমনটি ঘটা থেকে নিস্তার পায় ক্বচিৎ কোন মানুষ। তারি একজন হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়— অত বড় নামজাদা মানুষ, একেবারে কিন্তু সাদাসিধা সহজ মানুষটি! নামের বদনাম স্পর্শই করেনি তাঁকে। তাইতো ছোট ছেলে থেকে ষাট বছরের বুড়োর কাছে তিনি অবারিতদ্বার হয়ে বসে আছেন। সেদিন বাগান-অঞ্চলে যেতে 'বেঙ্গল কেমিক্যালের' কারখানা চোখে পড়লো এক বিস্ময়কর বিরাট শক্তির প্রতিমূর্ত্তি! এই কারখানার স্রষ্টাকে দেখি—ভয়ও দেন্‌না কাছে যেতে, বিস্ময়ও জাগান্ না গাম্ভীর্য্যের মস্ত আড়ম্বর নিয়ে। এই রকম সহজ মানুষকে দেখেই কবিরা বলে গেলেন—

"নিরঞ্জন সৃষ্টি নর অমূল্য রতন,
ত্রিভুবনে কেহ নাহি নরের মতন—
তারাগণ শোভা দিল আকাশমণ্ডল,
নরজাতি দিয়া হল পৃথিবী উজ্জ্বল।"

নমস্কার! নমস্কার!! নমস্কার!!!

Acharyya Ray Commemoration volume : 1932

APPRECIATION

Sir Jagadish Chandra Bose

Sir P C Ray has produced a deep impression in his dual capacity as a pathfinder and originator of work of great utility. From the earliest days he exhibited a special faculty for carrying out original investigations of a high order It is impossible at the present time for others to realise the numerous difficulties and obstacles that confronted him But these were never able to stand in the way of reaching the goal he had set before him, on the contrary they served as a stimulus to awaken to the utmost his latent powers

In his long and distinguished career as a scientific investigator, which happily is not over yet, he has not only made important contributions in advancement of science, but has also evoked the true spirit of research among his disciples, many of whom now occupy very prominent positions in the scientific world Such an achievement in the lifetime of one man is indeed remarkable but Sir P C Ray has done a great deal more

He was one of the first to realise the importance of Indian industries for the economic advancement of the country With this object in view he risked the very little he possessed, and the venture started in this modest way has now grown into perhaps the most successful chemical industry in the whole of India By his personal faith and enthusiasm he has succeeded in enlisting for this work the whole-hearted devotion of his collaborators

His twofold achievement of a scientific investigator as well as the founder of an important industry in this country on up-to-date lines, has rightly entitled him to be regarded as a benefactor of his country

How far these works are traceable to his extreme simplicity of life and the innate spirit of self-denial is known to me as an intimate friend who has known him for nearly half a century The self-discipline that he acquired in his earlier days of struggle, has been his greatest asset, enabling him to work ceaselessly inspite of his having a none too strong constitution. It is the strength arising from his innate belief in the future that has preserved in him the vitality

and optimism of youth inspite of his age of three score years and ten.

Others have also profited by his self-denial. He has wanted little and kept even less for himself, the rest being given away freely to poor students and in Charities. The association of plain living and high thinking is always very rare; in addition to these there is in Sir P C Ray the element of vigorous action which knows no rest. The combination of such qualities in a single individual is indeed rare in any country, and there can be no higher example for the young generation to emulate than the life of this great teacher

Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932

Message Sent By Gurudeva To Sir P.C.Ray Eightieth Birthday Celebration Committee

Neogy Commercial Museum
College Street Market,
Calcutta

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি আমার এবং দেশের অর্ঘ্য দেয় তা বিপুল। কিন্তু আমার অসুস্থ শরীরের শক্তি সামান্য অতএব অধিকাংশ রইল মৌনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতন, ২৭-৩-৪১

অভিনন্দন

প্রিয়ম্বদা দেবী

হে আচার্য, তোমারে স্মরিতে আমারে যে হইল ফিরিতে
সুদূর কৈশোর তীরে, সবে যবে ফিরে ফিরে
শুনিতাম তপস্যার কথা,
পূত তব চরিত্র বারতা।।
অপূর্ব্ব সে তব অবদান, জাতির জীবনে নব দান,
অভিনব রসায়ন, খুলে দিল যে অয়ন
শুষ্ক রুক্ষ শিক্ষার মাঝারে, পরিত্রাণ করিলে সবারে।।
চিতাভস্মে প্রাণ দিলে তুমি, মৃতপ্রায় ছিল জন্মভূমি;
ওগো "নব ভগীরথ" শঙ্খে তব পেল পথ,
কত শত তরুণ পরাণ, স্বদেশে বিদেশে অভিযান।।
যে জ্ঞান করিলে বিতরণ, পুরাতন করি আহরণ,
আজ তাই ছাত্র সবে, প্রচার করিছে ভবে,
প্রাচ্যের গৌরব অনুরাগে প্রতীচ্যের আঁখিপুরোভাগে।।
দেশে দেশে দেশমাতৃকার সকল ব্যথার প্রতীকার।
হে তপস্বী তব পরমায়ু, স্বদেশের চেতনার স্নায়ু,
নবীন জীবনে ভরি' সব অবসাদ হরি,
আগুসার করুক সবায়, প্রাণপূর্ণ দীপ্ত প্রতিভায়।।
তুমি থাক সারথী সবার, এই মত নিত্য অনিবার,
জীবন সুদীর্ঘ হোক, পেয়ো নাক দুঃখশোক,
অজাতশত্রুর মত জয়যাত্রা অব্যাহত
হোক, শেষজীবনের পথ,
হও তুমি পূর্ণমনোরথ।।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

প্রমথ চৌধুরী

গত শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন গভর্ণমেন্টের ব্যয়ে বাঙলাদেশে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করবার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, তখন কোন্ ভাষায় আর কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে, তা নিয়ে মহা তর্ক উপস্থিত হয়।

এক দল প্রস্তাব করেন যে, এই সরকারী শিক্ষার ভাষা হবে সংস্কৃত, আর বিষয় হবে সংস্কৃতশাস্ত্র। আর দ্বিতীয় দলের মত, ইংরাজী ভাষায় ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়াই গভর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য।

প্রথম দলকে সেকালে Orientalist বলত, আর দ্বিতীয় দলকে Anglicist। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এই দ্বিতীয় দলের মুখপাত্র। প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টা ও তাঁর যত্নে Hindu College প্রতিষ্ঠিত হয়, যে Hindu College—এর পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ হচ্ছে বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

এই উপলক্ষে রামমোহন রায় Lord Amherst কে পত্র লেখেন, তার এক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"When this seminary of education was proposed, we understood the Government of England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instructions of its Indian subjects We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing Europeans of talent and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful sciences, which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world."

আজ থেকে প্রায় একশ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, যে সময়ে ইউরোপের লোকেও বিজ্ঞানের এই অত্যাশ্চর্য্য ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পারেনি, সেই সময়ে একটি বাঙালী মহাপুরুষের জ্ঞানদৃষ্টিতে বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ধরা পড়ে; এবং তিনি ইউরোপের নব বিদ্যা যাতে দেশের লোক আয়ত্ত করতে পারে তার জন্য লালায়িত হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের চর্চ্চাই যে ইউরোপের অধিবাসীদের পৃথিবীর আর সকল জাতির অপেক্ষা উন্নত ও শক্তিশালী করেছে, এ সত্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় নি। ভারতবাসীদের কি উপায়ে শক্তিশালী ও উন্নত করা

যায় এই ভাবনাই ছিল রামমোহন রায়ের সকল জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রেরণা।

(২)

রামমোহন রায়ের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ কলেজে Useful Science শিক্ষা দেবার কোনও ব্যবস্থা ছিল কিনা, আমি জানিনে। খুব সম্ভবতঃ ছিলনা। কারণ ছেলেবেলায় উক্ত কলেজে শিক্ষিত যে সব লোকের সাক্ষাৎ লাভ করেছি, তাঁদের যে Newton -এর অপেক্ষা Shakespeare-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁরা ইংরাজী শিখেছিলেন, কিন্তু উক্ত ভাষার মারফৎ বিজ্ঞান শেখেন নি।

আমরা বাঙালীরা কতদিন হতে বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করছি , তা আমি জানিনে। তবে আমার জ্ঞান হয়ে অবধি দেখছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দু ভাগে বিভক্ত। Science course ও Arts course-এর বিভাগ অনেককাল হতে প্রচলিত আছে। Mathematics, Physics এবং Chemistry শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহুকাল পূর্ব্বে করেছেন। কিন্তু তার ফলে বহুকাল যাবৎ এদেশে কোনও বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেন নি। এর কারণ বোধ হয়, যে হিসেবে আমরা শাস্ত্রচর্চ্চা করে থাকি, সেই হিসেবেই আমরা পূর্ব্বে বিজ্ঞানচর্চ্চা করতুম। অর্থাৎ ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকরা জড়জগৎ সম্বন্ধে যে সকল সত্য আবিষ্কার করেছিলেন, সেই সকল সত্যকে চূড়ান্ত হিসাবে আমরা গ্রাহ্য করে এসেছি। জড়জগতের সকল রহস্য যে উদঘাটিত হয় নি, এবং আমরাও যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে Physics ও Chemistry -র বহু অনাবিষ্কৃত সত্য উদ্ধার করতে পারি, সম্ভবতঃ এ ভরসা আমাদের ছিল না।

রামমোহন রায় পূর্ব্বোক্ত পত্রে সংস্কৃতশাস্ত্র চর্চ্চা সম্বন্ধে নানারূপ বিদ্রূপ করেছেন। কারণ পূর্ব্বে কে কি বলে গিয়েছেন কেবলমাত্র সেই সব কথায় জ্ঞানলাভ করলেই এ বিশ্ব ও মানবজীবন সম্বন্ধে জ্ঞানের কোনরূপ বৃদ্ধি কি উন্নতি হয় না। রামমোহন রায় চেয়েছিলেন সেই সেই শিক্ষা যার ফলে স্বজাতির আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ ও প্রস্ফুটিত হবে এবং যার প্রসাদে বাঙালীজাতি ইউরোপের অধিবাসীদের তুল্য জ্ঞানে ও কর্ম্মে উন্নত হবে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে, মানুষে নিজের চেষ্টায় এ জ্ঞানের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে এবং এ জ্ঞানকে কর্ম্মে ভাঙিয়ে নিতে পারে যার ফলে সমগ্র সমাজ শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

(৩)

আমি যখন স্কুলের চৌকাঠ ডিঙিয়ে কলেজে প্রবেশ করি, তার অব্যবহিত পরেই এই সুসংবাদ শুনি যে রাজা রামমোহন রায়ের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। দু'জন বাঙালী অধ্যাপক

বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, —একজন Physics এর আর একজন Chemistry-র। একজনের নাম শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু আর একজনের নাম শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। যদিচ আমি বিজ্ঞানের কোনরূপ ধার ধারতুম না, তথাপি এ সংবাদ শুনে আমি মহা উৎফুল্ল হয়ে উঠি। কারণ সেদিন মনে হয় যে, বাঙালীজাতির মনের ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হল; এবং বর্ত্তমানে বাঙ্গালীজাতি সাহিত্যজগতে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, ভবিষ্যতে তারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সমান কৃতিত্বের পরিচয় দেবে এবং আমাদের বিজ্ঞানচর্চ্চা কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যায় পরিণত হবে না। এ সুফল যে ফলেছে, সে বিষয়ে আজকের দিনে আর সন্দেহের অবসর নেই।

এ বিদ্যার প্রধান গুণ এই যে, বিজ্ঞান প্রয়োগপ্রধান শাস্ত্র। বিশ্বের এ জ্ঞানকে যদি মানুষ কর্ম্মে ভাঙিয়ে নিতে না পারত, তবে আজকের দিনে মানবসমাজে বিজ্ঞানের এ অসাধারণ প্রতিপত্তি কখনোই ঘটত না।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর Chemistry-র জ্ঞানকে সমাজের কাজে লাগাতে তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছেন। Science যে মানুষের পক্ষে useful, শুধু ধ্যান ধারণার বস্তু নয়-– এ সত্য তিনি হাতেকলমে প্রমাণ করেছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি বহু নূতন জ্ঞানী ও নূতন কর্ম্মী সৃষ্টি করেছেন। কারণ এই উভয় দলের অন্তরে যে তিনি নূতন প্রাণের সঞ্চার করেছেন যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই কারণে বাঙালীজাতির কাছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একটি অপূর্ব্ব মহাপুরুষ হিসেবে যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

Acharyya Ray Commemoration volume : 1932

" *The politics of the annexationist is politics divorced from justice politics divorced from morality, politics divorced from humanity* "

" *A government which can squander £10,000,000 on 'palatial barracks but which cannot spare a farthing for laboratories, should forfiet the title of a civilized government* "

" *The Indian Government essentially a tax-squeezing machinery and not a Government for the people.* ."

ACHARYYA RAY–THE MAN

Prof. Devaprasad Ghosh, M.A., B.L.

I Do not know if people have noticed it, but there is a remarkable similarity in the appearances of Thomas Carlyle in his old age (as depicted in his portrait) and of Acharya Prafulla Chandra Ray. The same bushy eye-brows, shaggy beard, deep-set penetrating eyes, and general appearance of *malaise* with the ordering of things in general – cynics associate this last with dyspepsia – which mark the rugged features of the aged sage of Chelsea, mark also, perhaps only in a less pronounced degree, those of the saintly *savant* of Parsibagan I am not aware how far appearances are an index to the realities beneath and how far they are deceptive – but of this I am sure that there is much that is common between the two great men. The sturdy independence, the unbending backbone, the shrewd commonsense, so characteristic of the hard-headed Scot, the utter contempt for wealth, the most devastating indifference to manners and appearances, the absolute unconventionality of conduct and behaviour, the missionary zeal and the prophetic ire, and the somewhat rough exterior *withal*, the deep-seated love that flows ever increasingly unto suffering humanity--all these mark our great beloved Bengalee as much as they did the great venerated Scot

But I suppose that our revered Teacher is kindlier than the Scottish sage—perhaps the very vehemence of Carlyle's denunciations of the follies and foibles and mannerisms of mankind hardened him more and more into the mould of the irate prophet, while a less rigid and more human outlook on life and a more intimate contact with the sufferings of his fellow-men in this unhappy land have softened his mould, and made him at the present day less a denouncing prophet and more a loving friend and sympathetic guide of his countrymen. Further, the morbid self-consciousness and habit of exaggerating his personal distempers that grew upon Carlyle in later years—people used to say that what was a swelled finger to any one else was elephantiasis to Carlyle—the egotism that ultimately almost became repellant — there is not the slightest trace of all this is the great Bengalee

But the Carlylean philistinism remains—the philistinism that makes his life and behaviour unspeakably simple, natural and unaffected—that makes him a democrat to finger-tips that makes him feel absolutely at home with the nearest man in the street but rather ill at ease in the company of the genteel and the polished and the high brow aristocrat—that puts him, if I may say so without offence almost in a fighting mood against a specimen of the latter class–that makes him pour out his last penny for the succour of the poor and the distressed but instinctively makes him shirk from the patronizing touch of the wealthy and the plutocrat–it is this robust philistinism, I repeat, which makes of Acharya Prafulla Chandra, a most remarkable character in our present-day society.

It were idle to dwell upon the simplicity and plainness of his life and habits–that has by now become almost proverbial—perhaps after the great Vidyasagar no man of his eminence led so unutterably plain a life A bachelor all his life, essentially a student throughout, a teacher whose only love is the books that he teaches and the boys that he inspires, a man of most abstemious personal habits, a non-smoker a teetotaler, one whose diet has steadily been reduced to an almost incredible minimum a house-holder whose domestic paraphernalia are exhausted in an iron bedstead, a small table, a smaller chair, an almirah of books, a wardrobe which consists besides an occidental great coat–nobody knows how many decades old–of a dark-grey wrapper and a few pieces of coarse shirt and *Khaddar dhooties* eight cubits long, and very little besides which, by the way, this veteran Knight of the British Empire washes himself every week with big lumps of country-made soap—I do not suppose a veritable roving nomad of Tartary could be burdened with lesser luggage and chattels and *impedimenta* than this world-renowned scientist By the way, now that I come to think of it it seems that there really must be a strain of the nomad in Sir Prafulla Chandra and the strain is deepening with the passage of years for besides the daily or rather nightly *trek* to the *maidan* that he has been in the habit of indulging in for over a quarter of a century, the older he is getting the more he is developing roving propensities—and it is becoming increasingly his boast that his travels now-a-days average twenty-thousand miles a year And no wonder his health is positively thriving on his travels and journeyings So that to-day, in the seventy-second year of his life he is enjoying

a green old age much more verdant than twenty years ago All this, however, in passing. But the fact is that the simplicity of his *menage* is so very elementary that he has scarcely got any privacy left—there are no out-door manners and indoor conveniences for him—the door is always open, and manners are always en *deshabille*, so to speak, and life always *aunatural*. That is Acharyya Ray Indeed, to tell the truth, one could scarcely conceive such a state of things possible to a man of the world—and to a very eminent man of the world at that —unless one saw it with one's own eyes I do not think a *Sannyasi* in the wilderness could lead a simpler and more untrammelled existence than does this famous *savant* in the heart of Calcutta

This naturalness and elementary simplicity makes everyone who approaches him—some, perhaps, approaching with great nervousness and trepidation at the impending contact with a famous personage—at once feel quite at home. There is not the slightest pose about him—or what the Trans-Atlantics call "side"—no stand-offishness, not the slightest breath of patronising airs—but an overwhelming heartiness and unaffectedness of manners which first surprises and bewilders and then *charms and enthrals* the most distant visitor I confess that this heartiness sometimes becomes physically overwhelming—for it very often takes the shape of thrusts and blows and kicks and cuffs showered upon the person of the visitor—particularly if he is a young man on the right side of forty —perhaps to take a measure of his physical fitness —but if the visitor can survive this preliminary bombardment without blushing, the way to the citadel of the great man's heart lies open before him, and he will then find it difficult to wrench himself away from the varied and interesting conversation that Acharya Ray will regale him with. Whenever you catch him, in his so-called home, that is, an unobstrusive corner of an insignificant room in the first floor of the College of Science, partitioned off into a kitchen, a store-room, and an apology for a bed-room, or on his way to the *maidan* in the evening, or in his laboratory on the ground floor of the Science College, perched on a small stool three-feet high, handling test-tubes, measuring chemicals, and manipulating Bunsen burners, you will always find him the same—the same child-like, hearty, unaffected, unassuming, yet overwhelming Dr.Ray

This touch of Nature, that has made the whole world kin to him,

has made of him the quiet scientist with an instinctive shrinking from the lime-light, the great philanthropist and social worker that we know—this love of humanity has made him come out of the shell of his laboratory,and impelled him to lead great movements for the relief of the distressed, to tour the country throughout its length and breadth, to see for himself what could be done about our young men—bright and promising young men but with scarcely any scope, any opening, any decent prospect in life—the search for this remedy has brought in him a vivid realization of the economic backwardness of the land and with the practical bent of mind and shrewd commonsense that he is gifted with, it has made him a pioneer of industrial regeneration in India— it has inspired him, in recent years, with a love for the home-spun *khaddar* as a solvent of the economic problem—it has made of the erstwhile teacher, the cloistered scientist, the child-like saint, perhaps the most successful organizer of industry on this side of India.

All this is indeed remarkable and bears eloquent testimony to the plasticity of his mind, the capacity, of his energies, the generosity of his heart, and the multiplicity of the range of his interests Essentially a man of culture—and one of very wide culture—interested in history, economics, politics, sociology, poetry *belles-letters* as much as, perhaps more than, in his own subject, chemistry — indeed he is never tired of saying that he is a chemist only by mistake—yet with all this culture and scholarship and erudition he has proved a most successful man of action—succeeding and conducting great industrial enterprises, leading great social movements, practising the gospel of work and self--help to the rising youth of the country with all the fervour of Thomas Carlyle And all this culture and all these activities have been suffused with the glow of ardent love for his fellowmen and devoted adoration for his Motherland It is this radiance of love and self-less devotion that has invested Acharya Ray, the student, the *Savant* and the man of action with a halo ineffable It may indeed be said of him that in him have blended *Jnāna* and *Karma* and *Prema*–the triple fruition of a harmonious life. May this blessed life be spared for a long time yet to serve at once as a beacon--light and a comfort to his admiring and adoring countrymen!

The Calcutta Municipal Gazette, 17th December, 1932.

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে "প্রদীপ" পত্রে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। এই কাগজ অনেক বৎসর হইল উঠিয়া গিয়াছে; পুরাতন "প্রদীপ" দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। আমার পূর্ব্বে লিখিত প্রবন্ধটি আচার্য্য রায়ের স্মারকগ্রন্থে প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করি।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার অন্তর্গত রাড়ুলী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম অমর কবি মধুসূদনের জন্মগ্রাম সাগরদাঁড়ি হইতে ৮ মাইল দূরে কপোতাক্ষ নদের কূলে অবস্থিত। মধুসূদন এই কপোতাক্ষকেই উদ্দেশ্য করিয়া সুদূর ফরাসী দেশ হইতে লিখিয়াছিলেনঃ—

"সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়ামন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদদলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।"

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর কলেজে কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসনের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। তিনি আরবী ও পারসী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সুলেখকগণের বন্ধুর বঙ্গসাহিত্যানুরাগী হইবারই কথা। প্রথমোক্ত দুই মহাত্মার সংসর্গে পড়িয়া তিনি সর্ব্ববিধ সামাজিক সংস্কারের পক্ষপাতী হন। তিনি বার্ষিক ৪।৫ হাজার টাকা আয়ের পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি চাকরী কখনও করেন নাই, করিতে ইচ্ছাও করেন নাই। নিজ গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক প্রায় ২৫ বৎসর উহা চালাইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার মাসে ৪০/৫০ টাকা ব্যয় হইত, সরকারী সাহায্য হইতে অবশিষ্ট ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। উহাতে

প্রথমে মধ্যবাঙ্গালা, পরে মধ্যইংরাজী, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়ান হইত। তিনি স্বগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। তিনি অনেক ধনী ও বিলাসী লোকের সঙ্গে মিশিতেন, তাঁহাদের অনেকের চরিত্র বড় ভাল ছিল না। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র আজীবন পবিত্রচরিত্র ছিলেন। তিনি পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বড় উদাসীন ছিলেন। এ বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্র "বাপ্‌কা বেটা" a chip of the old block. তিনি নিজ সন্তানগণকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন; কখনও তাহাদিগকে তিরস্কার পর্য্যন্ত করিতেন না। বোধ হয় তিনি ভাবিতেন, ছেলে মেয়েদিগকে বাচনিক উপদেশ দেওয়া বা ভর্ৎসনা করা অপেক্ষা নিজ জীবনের সদৃষ্টান্ত প্রদর্শনই শ্রেয়ঃ।

দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র নিজ গ্রামের মাইনর স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তাহার পর হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। চারি বৎসর পরে তিনি অ্যালবার্ট স্কুলে যান। সেখানে তিনি নিজ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পঠদ্দশার এই সময়টি স্মরণ করিলে এখনও তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হয়। এখানেই তাঁহার শিক্ষক স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের সহিত তিনি বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। শিক্ষক ও শিষ্যের সাহিত্যানুরাগ এই বন্ধুত্বের একটি প্রধান কারণ। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতার একান্ত অভিলাষ ছিল যে, তাঁহার একটি সন্তান বিলাতে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু জীবনের শেষভাগে নানাপ্রকার আর্থিক গোলযোগে পড়ায় তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু পিতার এই অভিলাষ প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক ছিল। এই জন্য তিনি অ্যালবার্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে থাকিতে থাকিতেই গোপনে কাহারও সাহায্য না লইয়া ফরাসী ও লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন; — উদ্দেশ্য গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাতযাত্রা। তিনি এন্ট্রান্স পাশ করিয়া মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হন ; তথায় ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। প্রফুল্লচন্দ্র মেট্রোপলিটানে অন্যান্য বিষয় এবং প্রেসিডেন্সী কালেজে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লাভ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন। তিনি গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দেওয়ার কথা বরাবর পিতার নিকট গোপন করিয়া আসিয়াছিলেন; কারণ, কৃতকার্য্য হইলে পিতা বিস্মিত ও আনন্দিত হইবেন। বিলাতযাত্রা সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্রের জননীদেবীর কোন কুসংস্কার বা আপত্তি ছিল না। তিনি আহ্লাদের সহিত পুত্রকে বিলাত যাইতে অনুমতি দেন। প্রফুল্লবাবু এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। রসায়ন তাঁহার বিশেষ অনুশীলনের বিষয় ছিল। অবশ্য পদার্থবিজ্ঞানও তিনি সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তথায় ছয় বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন; এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ডি.এস.সি. উপাধি লাভ করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভার্থ তাঁহাকে যে রাসায়নিক প্রবন্ধ রচনা করিতে হইয়াছিল, তাহা এডিনবরা রয়্যাল সোসাইটির কার্য্যবিবরণের

মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। এডিনবরায় অবস্থিতি কালে তিনি "India before and after the Mutiny" নামকএকটি পুস্তক রচনা করেন। ইহার সম্বন্ধে প্রিন্সিপ্যাল স্যার উইলিয়াম মিওর বলেন "The Essay bore marks of rare ability." বিখ্যাত স্কটসম্যান পত্রিকা বলেনঃ "It is a most interesting little volume, and we do not profess to wonder in the least that is has earned a considerable amout of popularity. It contains information in reference to India which will not be found elsewhere, and it is deserving of the utmost notice" --The Scotsman, Oct 28, 1886.

মহাত্মা জন ব্রাইট্ .বলেন ঃ "You write what is true on the Indian question and I trust your effort will yield some fruit."

বিলাতে প্রবাসকালে প্রফুল্লচন্দ্র অভিনিবেশপূর্ব্বক তদ্দেশবাসিগণের রাজনৈতিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রায়মহাশয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতর রসায়নাধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। তিনি ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত ৯ বৎসরে নানা বৈজ্ঞানিক সভায় পঠন ও তাহাদের কার্য্যবিবরণের মধ্যে প্রকাশ করিবার জন্য ৯টি অভিনব গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। সমস্তগুলিই প্রকাশিত হইয়াছে। গত দুই বৎসরে তিনি পারদঘটিত তেরটি নূতন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার অবিক্ষিয়া সম্বন্ধে অধ্যাপক পেডলার বলেন ঃ "Dr. P. C. Ray by his discovery of the method of preparation of this compound (Mercurous Nitrite) has filled up a blank in our knowledge of the Mercury series."

অধ্যাপক এড্‌বার্ড ডাইবর্স অধ্যাপক রায়কে লিখিয়াছেন ঃ "Mr Haga and myself prepared Mercurous Nitrite 11years ago without knowing its composition a fact which does not lessen your own right to claim its discovery. You have discovered a very remarkable reaction in the oxidation in solution of potassium cyanide by Mercuric Nitrite becoming Hyponitrite."

কলিকাতা-রিভিউ পত্রে একটি প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি প্রকাশিত হয় ঃ—

"Although Lefort, Gerhardt, Marignac and other chemists have been for a long time engaged in the study of the action of nitric acid on mercury under varying circumstances yet they could not discover or prepare mercurous nitrite, the existence of which was indicated by the laws of chemical analogy. Mercury has been known to yield almost all the different classes of compounds known to chemists, such as sulphides, oxides, sulphates, nitrates etc. but the nitrate series of the element were found

wanting. There is scarcely any information worth the name to be found about mercurous nitrite in Fremy's Encyclopedie Chimique. Even Roscoe and Schorlemmer, in their well-known treatise, do not so much as mention this compound, nor is there any reference to it to be found in the latest edition of Watt's *Dictionary of Chemistry*. It was reserved for Dr. P. C Ray to discover this 'missing link' in the series of the compounds of Mercury, which had hitherto baffled all the efforts of the European chemists either to discover or to prepare."

স্থানাভাবে আমরা Chemist and Druggist প্রভৃতি পত্রিকা এবং বার্টলো (Berthelot), বিক্টর মাইয়ার, রস্কো প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিকগণের মত উদ্ধৃত করিলাম না।

প্রেসিডেন্সী কলেজে রাসায়নিক গবেষণাগার স্থাপিত হওয়ায় অধ্যাপক রায়ের মত ব্যক্তির গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়ার সুবিধা হইয়াছে। এখানে শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ও জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী ভ্রাতাদ্বয়ও রাসায়নিক গবেষণাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলও কিছু কিছু দৃষ্ট হইয়াছে। জ্যোতিভূষণ "On the transformation of the Hypochlorites into Chlorates" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া মৌলিক গবেষণার জন্য প্রদত্ত ইলিয়ট পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি ইহারা দুই ভ্রাতায় মিলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীতে অধ্যাবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ একটি সন্দর্ভ প্রেরণ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসংযোগে কোন তত্ত্বের প্রমাণ প্রদর্শনে চন্দ্রবাবুর মত নিপুণহস্ত লোক আমাদের দেশে অধিক দেখা যায় না। যন্ত্র রচনা ও নির্ম্মাণে তাঁহার হস্তের অসাধারণ কুশলতা দেখা গিয়াছে। সুযোগ অভাবে ইহার রাসায়নিক প্রতিভা সম্যক্ বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে না। প্রেসিডেন্সী কলেজের রাসায়নিক গবেষণাগার সংস্থাপনের জন্য অধ্যাপক পেড্‌লার আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহারই যত্নে ইহা স্থাপিত হইয়াছে।

অধ্যাপক রায় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত সতীশচন্দ্র সিংহ এম্,-এর সহকারিতায় বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ নামক রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে রাসায়নিক এবং অপরাপর দ্রব্যজাত প্রস্তুত হয়, ইহা অধ্যাপক রায়ের একটি জীবনব্যাপী অভিলাষ। সেই মনোরথ কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিবার জন্য তিনি এই কারখানা স্থাপন করেন। এ বিষয়ে তাঁহার মূলমন্ত্র সুইফ্‌টের সেই পরিচিত কথা— "Whoever could make two ears of corn, or two blades of grass, to grow upon a spot of ground where only one grew before, would deserve better of mankind, and do more essential service to his country than the whole race of politicians put together..."

মূলধন না থাকায় এবং সাধারণের সহযোগিতার অভাবে তাঁহাকে বহু অর্থসাপেক্ষ যন্ত্র

ও প্রক্রিয়াদির পরিবর্ত্তে অনেক সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। এক্ষণে এই কারখানাটি দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত, হইয়াছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু এজন্য প্রফুল্লবাবুকে অনেক আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে অনেক কোটি টাকার ঔষধ, নৈল রং (Aniline dyes), দিয়াশেলাই, বাতী, সাবান এবং নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী হয়। এই সমস্তই ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতে পারে। এতদ্দ্বারা যে কেবল হাজার হাজার লোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে, তাহা নয়; কারখানার অধ্যক্ষগণও প্রভূত লাভবান হইতে পারেন। জার্ম্মানীকে অধুনা রাসায়নিক দ্রব্যের আকর বলিলেও চলে। ইহার বাণিজ্যিক উন্নতির প্রধান কারণ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকরণ বিষয়ে জার্ম্মান গভর্ণমেন্টের উৎসাহলাভ। নানাবিধ নৈল রং এবং কয়লার আল্‌কাতরা হইতে উদ্ভূত ফেনাসিটিন, আন্টিপাইরিন, সাল্‌ফোনেল প্রভৃতি সংশ্লেষিক (synthetical) ঔষধ প্রস্তুত করিয়া জার্ম্মানেরা আজ ধনশালী জাতি হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দেশের প্রত্যেক রাসায়নিক কারখানায় গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়া চলিতেছে। আর আমাদের দেশের ধনী লোকেরা এ বিষয়ে উদাসীন, গভর্ণমেন্টও সহানুভূতিহীন। ইহার ফল যেরূপ শোচনীয় হইবার তাহাই হইয়াছে। কত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইয়াও চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের গভর্ণমেন্ট যদি জাপানী গভর্ণমেন্টের মত হইতেন, তাহা হইলে আমাদের দশা এমন হইত না। জাপানী গভর্ণমেন্টের বৃত্তির সাহায্যে অনেক জাপানী যুবক ইউরোপ ও আমেরিকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিয়া স্বদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং ইংরাজী ভাষায় একখানি বৈজ্ঞানিক কাগজ চালাইতেছেন। আমাদের বুদ্ধি আর কিছু জাপানীদের বুদ্ধি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। সুযোগের অভাবে আমরা জাতিসমাজে হীন হইয়া রহিয়াছি। গভর্ণমেন্ট না করুন, দেশের ধনীদিগকে তো কেহ দিব্য দিয়া বলে নাই যে তোমরা বিজ্ঞানশিক্ষার্থ যুবকগণকে পাশ্চাত্য দেশে পাঠাইও না; কারখানা খুলিয়া আপনাদের স্বদেশের ধনবৃদ্ধি করিও না!

চারি বৎসর হইল অধ্যাপক রায় "সরল প্রাণিবিজ্ঞান" নামে একখানি সুন্দর প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক সচিত্র পুস্তক লিখিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে অনেক শ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে বঙ্গভাষায় ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষাবিভাগে বা সাধারণ পাঠকসমাজে এরূপ পুস্তকের সমুচিত আদর হয় নাই।

বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক বার্টেলো * ইহাকে একটি পত্রে যে যে পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে রাসায়নিক দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াদি আছে, তৎসম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; তদুত্তরে প্রফুল্লবাবু একটি সারগর্ভ পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। ইহা এখনও

মুদ্রিত হয় নাই: সম্ভবতঃ অচিরে পরিবর্দ্ধিত আকারে লন্ডন ও প্যারিসে প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তিকার নাম "Materials for a neglected chapter in the History of Chemistry"। ইহার প্রথম খণ্ডে সংস্কৃত চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থসকলের যে যে শ্লোকে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াদি বর্ণিত আছে, তৎসমুদয়ের ইংরাজী অনুবাদ আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতীয় রসায়নবিদ্যার উৎপত্তি ও ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তিকা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বাগভটকৃত অষ্টাঙ্গহৃদয়, গোপালকৃষ্ণকৃত রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, রামচন্দ্রকৃত রসেন্দ্র-চিন্তামণি, শার্ঙ্গধরসংহিতা, চক্রদত্তসংগ্রহ, রসরত্নসমুচ্চয় এবং ভাবমিশ্রকৃত ভাবপ্রকাশ এই কয়েকখানি গ্রন্থে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। গ্রন্থগুলি একাদশ হতে ষোড়শ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রণীত। এতন্মধ্যে রসরত্নসমুচ্চয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ইহাতে নানাবিধ পারদঘটিত ঔষধ প্রস্তুতপ্রক্রিয়া ব্যতীত উর্দ্ধপাতন, তির্য্যকপাতনাদি প্রক্রিয়ার উপযোগী যন্ত্রের বর্ণনা আছে। অধ্যাপক রায়ের পুস্তিকায় উহাদের ছবি মুদ্রিত হইবে। বার্টলো মহোদয়ের ধারণা এই যে ভারতীয় রসায়ন পারোক্ষভাবে গ্রীকদিগের নিকট হইতে গৃহীত। প্রফুল্লবাবু নানা সুযুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ভারতবাসীগণ স্বাধীনভাবে রাসায়নিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক রায়ের দেহ সুস্থ ও সবল নহে। প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, তিনি অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন। তাহার উপর প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে অনিদ্রা রোগে কষ্ট পান। এখনও এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এই সকল কারণে প্রফুল্লবাবুকে রাত্রে, এমন কি সন্ধ্যাকালেও কঠোর জ্ঞানানুশীলন ত্যাগ করিতে হইয়াছে। সময় সম্বন্ধে এইরূপ বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিয়াও যে তিনি এক কঠিন শ্রমসাপেক্ষ আবিষ্ক্রিয়া করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা কেবল কার্য্যের শৃঙ্খলা এবং কঠোর নিয়মাধীনতার গুণে। প্রাতঃকালের ২ ঘন্টা (গ্রীষ্মকালে ৬।।০ টা হইতে ৮।।০ টা এবং শীতকালে ৭টা হইতে ৯টা) তিনি নিয়মিত

(* M Barthelot, Perpetual Secretary of the Acadamy of Sciences Paris সংশ্লেষিক রসায়নে (Synthetical Chemistry) পৃথিবীতে ইঁহা অপেক্ষা পণ্ডিত কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। ইঁনি Journal des Savants নামক পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ডাক্তার রায়ের নাম উল্লেখ করিয়া ফরাসী ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছেঃ- "However it is necessary to examine certain documents indicated to me by a recent letter of Ray, Professor Presidency College Calcutta. According to the Savant (D' apres ce Savant), there exist treatises on alchemy in Sanskrit.* * The subject is worthy of the most profound attention of those who are interested in the history of chemistry." ডাক্তার রায়কে Savant বলায় অত্যুক্তি হয় নাই।)

বিদ্যাচর্চ্চায় যাপন করেন। অধ্যাপনার জন্য ১ কি ২ ঘন্টা বাদ দিয়া ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত তিনি কলেজে বৈজ্ঞানিক অভিনব গবেষণায় যাপন করেন। এক্ষণে নানাবিধ গবেষণায় তাঁহার হস্ত পূর্ণ। গত বৎসর হইতে তিনি অপরাহ্নে মুক্ত বাতাসে অনেকক্ষণ ভ্রমণের পর সন্ধ্যার সময় এক বা দেড় ঘন্টা লঘু সাহিত্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কাজের নিয়ম। সমস্ত বৎসর কলেজের ছুটির সময়ও তিনি ঠিক এ নিয়মানুসারে কাজ করেন। ছুটির সময়েই তিনি প্রাণের আকাঙক্ষা মিটাইয়া স্বাধীন গবেষণা কার্য্যে সময় ক্ষেপণ করেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, জন মর্লী অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতাতে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তিনি তাহারই অন্তর্নিহিত সঙ্কেতানুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করেন।

"Now in half an hour I fancy you can read fifteen or twenty pages of Bruke; or you can read one of Wordsworth's masterpieces--say the lines on Tintern, or say, one third ** of a book of the Iliad or the Aeneid ** But try for yourselves what you can read in half an hour Then multiply the half hour by 365 and consider what treasures you might have laid by at the end of the year and what happiness, fortitude, and wisdon they would have given you for a life time"

একটি কথা আছে "ছাত্রাণামধ্যয়নম্ তপঃ।" প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যাপক কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ উপাধিকারীর মত তাঁহার শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই। এখনও জ্ঞানান্বেষণই তাঁহার প্রধান কার্য্য। কিছু দিন পূর্ব্বে একখানি পত্রে কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমায় লিখিয়াছিলেন— I was never a more bonafide student than to-day বাস্তবিক পুরকালে শিক্ষার্থীদের যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল, প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। ইনি এখনও অবিবাহিত আছেন। ইঁহার বাসভবনে, আহারে, পরিচ্ছদে বিলাসিতার লেশমাত্র নাই। ইনি চাল-চলন ও কথাবার্ত্তায় এরূপ সাদাসিধে ও আড়ম্বরহীন যে, "বিলাত ফেরৎ" বলিয়া কেহই ইঁহাকে সন্দেহও করিতে পারে না। এ সকল বিষয়ে তিনি বেহদ্দ বাঙ্গালী; কিন্তু ধর্ম্মভাবে, চরিত্রে পবিত্রতায় ও জ্ঞানস্পৃহায় বিদ্যার্থীমাত্রেরই এবং অপরের অনুকরণযোগ্য। দেশহিতকর নানাবিধ কার্য্যে ইঁহার যোগ আছে। গরিব দুঃখীর সেবায় ইনি মুক্তহস্ত। দানশীলতা ইঁহার চরিত্রে অন্যতম ভূষণ। বিখ্যাত স্যার আইজ্যাক নিউটন বলিতেন— "Those who gave nothing before death never in fact gave at all" অর্থাৎ যাহারা জীবদ্দশায় কিছুই দান করেন না তাঁহাদের দান দানই নহে। প্রফুল্লচন্দ্র এই মহাজন বাক্য সদা স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করেন। ভাল সাজিবে বলিয়াই বিধাতা বুঝি ইঁহার মত জ্ঞানলিপ্সুদিগকে বিনয়ভূষণে অলঙ্কৃত করেন। ইঁহার সরলতা বালকোপম।

পঠদ্দশায় প্রফুল্লচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও জীবনচরিত পাঠে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এখনও তিনি গোল্ডস্মিথ, আর্বিং, থ্যাকারে, ডিকেন্স ও জর্জ্জ ইলিয়টের গ্রন্থাবলী পড়িতে ভালবাসেন। জীবিত ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে তিনি কেবল এড্ নালায়েলের গ্রন্থাবলীর পক্ষপাতী, বিশেষতঃ তাঁহার "We Two" এবং "Donovan"-এর। বাইবেলের নূতন অংশ, এমার্সন, টেনিসন (কেবল In Memoriam, Enoch Arden এবং Guinevere), মার্টিনো (Endeavours after the Christian Life এবং Hours of Thought), এপিকটেটস এবং মার্কস অরীলিয়স্ তাঁহার অনুরাগভাজন। তাঁহার জীবনে শেষোক্ত দুই জনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্য্য যে ধনের প্রাচুর্য্যে হয় না, কিন্তু অভাবের অল্পতাতেই হয়, ইহা তিনি বিশেষভাবে অনুভব ও উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংখ্যা যেমন কম, প্রিয় গ্রন্থকারের সংখ্যাও তদ্রূপ। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রিয় কতকগুলি পুস্তক পুনঃ পুনঃ পাঠ করেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, কখন কখন উপন্যাসবর্ণিত অনেক নরনারীর সহিত তিনি দিবস রজনী ঘনিষ্ঠভাবে যাপন করেন। তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থসংগ্রহ, রহস্যসন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি মাসিকপত্রের অধিকাংশ প্রবন্ধ তিনি পাঠ করিয়াছেন। মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থকারের লেখাও তিনি পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার যে পরিচয় নাই, তাহা নয়; কিন্তু উহাতে তাঁহার বিশিষ্ট অনুরাগ নাই। তিনি বলেন যে, পাশ্চাত্য গ্রন্থকারেরাই জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করিতে পারেন। সে যাহা হউক, বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল তিনি খুব ভালোবাসেন। কিন্তু তিনি বলেন, "স্কট Count Robert of Paris ও Castle Dangerous লেখায় যেমন তাঁহার যশের লাঘবই হইয়াছিল, আনন্দমঠ, সীতারাম ও রাজসিংহ লেখায় বঙ্কিমবাবুরও তেমনি অগৌরব হইয়াছিল।"

অধ্যাপক রায় ফরাসী, জার্ম্মানি ও লাটিন ভাষা জানেন। জার্ম্মানি ও ফরাসী ভাষা না জানিলে রসায়ন বিজ্ঞানে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায় না। বিখ্যাত রাসায়নিক বুটস্ (Wurtz) বলেন La Chimie est Une Science francaise--রসায়ন ফরাসী বিজ্ঞান। প্রফুল্লবাবু বলেন তাঁহার রাসায়নিক জ্ঞানের চৌদ্দআনা ফরাসী ও জার্ম্মানি গ্রন্থ হইতে লব্ধ।

Sir P.C.Ray, the Man and his Work

Dr. F. G. Donnan (London)

It gives me the greatest pleasure to add my testimony to the many others that will be offered on this occasion to the personality and work of Professor Sir Prafulla Chandra Ray

It was about eleven years ago that I first had the privilege of meeting him He was on a visit to England and had come to see my laboratory at University College and some of his friends and former pupils who were researching there at that time (Bhatnagar, Ghosh, and Mukherjee). Did he arrive with much ceremony and a flourish of trumpets? No ! I found it extremely difficult to know when he had arrived The extreme modesty of the man was amazing Here was the Father of Modern Chemistry in India in my laboratory, and yet one scarcely knew he was there at all

I noticed how he was revered by his old pupils But not only revered--beloved also Here was a man who through the personal example of a life devoted to science and to the care and teaching of his disciples, could inspire in them the deepest reverence and affection I found then and afterwards that the words modesty and devotion could best describe the personality of Sir P C Ray From the great Buddha onwards through the stream of time, these qualities of mind and spirit have ever been the characteristics of the great leaders of Indian thought and Indian ideals They have shone with conscious and serene brightness throughout the life and work of Sir P C Ray

I used no idle words of conventional flattery when I called him the Father of Modern Chemistry in India Perhaps I should have called him simply the Father of Indian Chemical Science It was he who first devoted himself to a life of scientific research on chemical problems By his teaching and his example he has produced a great school of chemical research in India

His pupils occupy distinguished posts, Professorial and other, throughout his native land. When they have come to me in London, I have always found them to be men of high intelligence and enthusiasm for scientific research They were infused by the spirit

of their Master in India, and were determined to carry on the great work which he had begun Nobly have they done so India now ranks high amongst the nations of the world which contribute importantly to the advance of science It would be difficult to overestimate the part which the work and influence of Sir P C Ray has played in this splendid development

I shall not make any attempt to describe or discuss his personal contributions to chemical science Others more expert than I will do that Sir P C Ray, however, has been throughout his life no narrow laboratory specialist He has shown by his writings that he is a widely-read scholar in the history of science and the history of chemistry in India He has, through his energy and practical ability, founded and directed an important chemical manufacturing Company in Bengal.

His ideals have always been hard work and practical good in the service of his country Though devoted to the cause of pure science, he has never been the unpractical dreamer in the clouds But he has never asked much for himself living always a life of Spartan simplicity and frugality---a Saint Francis of Indian Science

I hope that future ages will cherish his name as one of the band of self-denying and devoted men who have revived and handed on the flame that once burned so brightly in India the search for truth and the hidden mysteries of things

F G DONNAN, C B E LL D D Sc Ph D F R S F I C
Professor of Chemistry, University College,
Gower Street London

Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932

প্রফুল্ল প্রশস্তি

কবিশেখর কালিদাস রায়

হে চিরতরুণ দেশতাত্ গুরু, প্রজাহীন প্রজাপতি,
উজল করেছে মনোলোক, তব শত শত সন্ততি।
কণ্বের মত কুলপতি তুমি,
মুখর করিয়া তব তপোভূমি
তোমারি পালিতা বালিকা হইয়া বিহরে সরস্বতী।

জনসংহতি তোমারে বাঁধিতে পারে নাই কোন দিন,
তারই বেদনায় তবু যে তোমার নয়ন তন্দ্রাহীন।
ইহসংসার কোন প্রলোভনে
ধরিতে তোমায় পারেনি বাঁধনে,
সারা দেশই যার সংসার, র'বে কেমনে সে উদাসীন?

যোগীঋষি কভু দেখিনি, শুনেছি পুরাণকথায় আছে।
কল্পলোকের স্বপ্নযুগের জীব তারা মোর কাছে।
তোমা হ'তে তাঁরা ছিলেন মহান্
একথা কিছুতে মানেনাক প্রাণ।
ভয়ে ভয়ে বলি, সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হই পাছে।

কার কথা কই? কত গৌরবই তোমারে রয়েছে ঘিরে,
সবার উপরে শিষ্যগরিমা দাঁড়ায় উচ্চ শিরে।
তোমার ধ্যানের শুচি আশ্রমে
উদ্ভাবনের কামধেনু ভ্রমে,
তোমার জ্ঞানের পরিবেশে দেশ অতীতে পেয়েছে ফিরে।

সত্যলোকের আহিতাগ্নিক তব তপোবনছায়,
মিথ্যামেধের মেধ্য অনল জ্বলে শত রসনায়।

পুড়িছে ভ্রান্ত আচার বিচার
সমাধি সেথায় সকল মিছার।
জাতির মুক্তি তাহারি মাঝারে পূর্ণাহুতিটি চায়।

আজিকে তোমার জন্মবাসরে নমি তোমা বাণীপূজারী
তব পাদযুগে এই শুভযোগে হৃদয়ের ডালা উজাড়ি।
কায়মনোবাকে শুভসংহতি
তোমার মাঝারে ধরেছে মূরতি,
তোমার জীবনে ত্যাগভাস্বর প্রাচীন ভারতে নেহারি।

তোমার মুখের জ্ঞানভূয়িষ্ঠ রসঘন মধুভাষণা
শুনিবার লাগি ছাত্রজীবনে ফিরে যেতে হয় বাসনা।
মানসসরসী করিয়া শোভন
তোমার সুরভি শুচি ও জীবন,
পঙ্কিল দেশমর্ম্মমৃণালে ফুটিল সুষমা বিথারি।

নবীন বঙ্গ যাত্রা করেছে তব শুভাশিষ বহিয়া
তোমারি মতন করি প্রাণপণ কৃচ্ছ্রসাধন সহিয়া।
তাহার বিজয়ে তোমারি বিজয়,
তুমি যার গুরু তাহার কি ভয়?
চলে সে তীর্থে তোমারি শেখানো "সত্যের জয়" ফুকারি।

নব নালন্দা তব চারিপাশে আবার লভেছে স্ফূর্ত্তি,
তোমার মাঝারে নাগার্জ্জুনের ব্রত ধরিয়াছে মূর্ত্তি।
সপ্ততিদলে লভিল যা জয়
শতদলে যেন পূর্ণ তা হয়,
এই নিবেদন লয়ে অনুখন বিভুপদে মোরা ভিখারী।

Acharyya Ray Commemoration volume : 1932

The Future of Chemistry in India

Dr. Henry E. Armstrong LL.D.,Ph.D.,F.R.S.C,London

I am specially drawn to Sir Prafulla Chandra Ray and would join my tribute to those of his other friends because of my interest in the unique combination of gifts in his intellectual character and my admiration of the work he has accomplished, as well as of the example he has set Of distinguished literary parentage his own early English training was literary in a way unknown even to Englishmen He is, in fact, an illustration of what might happen to us if we were trained through intensive study of our own language which we seldom, if ever, are advisedly As a youth, during a long period of illness, he was an ardent student of English classic writers but he heard both Prof Elliott's university lectures on Physics and Prof Pedler's on Chemistry before going to England, in 1882, when he came of age, as holder of a Gilchrist scholarship His intention was to remain a literary student foreseeing, however, that the future progress of India was bound up with the pursuit of scientific inquiry, he allowed himself to be gradually tempted away from literature and history, although he continued the study of economics and politics He was six years a student in Edinburgh University, where he came under Profs Tait and Crum Brown I am not surprised that he was attached into Chemistry Crum Brown personally was one of the most engaging men that it was possible to find and unquestionably the most philosophically minded chemist of modern times

Not a few English chemists have had an early so-called classical training in Latin and Greek I do not know of one who also had an English training such as Ray enjoyed He writes a perfect English What is striking in him is the completeness and breadth of his modern outlook, as opposed to the confined, purely classical, retrograde outlook of so many English literary scholars, we may learn a valuable lesson from him in this respect Despite his English training, he has remained absolutely oriental in habits and tastes and has always lived an ascetic life Probably, his health has suffered not a little from too spare a diet had our present knowledge been avaliable, he would scarcely have taken so little care of himself

He adopted Chemistry as a career on his return to India From 1889 onwards as a Professor in the Presidency College Calcutta, he was mainly engaged in abstract chemical inquiry work which has led to his being termed "Master of Nitrites", a description I myself applied to him years ago

He is noteworthy among his countrymen, even among academic chemists generally, by reason of the remarkable practical ability he has shown in founding and directing the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works. When I visited him in Calcutta late in 1914, I was much struck by the simplicity of his living quarters, the shelves laden with English classics, Carlyle, Emerson and many more I was still more impressed by what I saw in his most interesting chemical factory All idea of his being but a dreamer at once vanished obviously he had combined dreaming with practice in a most remarkable way The arrangements were strikingly original Whatever thought of his being narrow in his outlook one might have gained from his entire devoiton to one very special theme in academic chemistry, his handling of his science in the works gave clearest proof of his wide outlook and general grasp

Letters will out ' Whilst ever the practical chemist, he has found time to write an outstanding *History of Hindu Chemistry*, a work of great erudition, involving fifteen years of profound study In addition, he is an idealist an unsparing social worker, his whole mind has been given to helping forward his countrymen's interests Being what he is and where he is, the general sanity of his outlook has been most surprising. It is men such as he, of broad culture, highly imaginative but at the same time practical, that are needed for the public service of chemistry to-day, not mere academic research workers

In type Sir Prafulla Ray is perhaps more like a Frenchman than an Englishman in his receptive habit fo mind the nearest comparison I can make is to contrast him with Berthelot, not only a many-sided chemist but also an agronomist, man of letters and politician Let me say frankly, Ray is not great as a chemical specialist nor was Berthelot he has been occupied in too many directions, too much kept aloof from the field of chemical discovery and its masters, to have lost himself in the contemplation of the maze of chemical experience to the extent necessary to be entirely

overcome by the magic and immensity of its problems. None the less, he is the founder of the indian Chemical School. He has realised the truth of the wonderful words Rudyard Kipling has put into the mouth of the Holy Mahub in Kim-- "Education greatest blessing when of best sorts, otherwise no earthly use." In India, perhaps more than anywhere, in future success will depend more upon' the observance of the policy they indicate than in any development of research upon the narrow lines of academic practice.

His chemical character may be said to have been formed at a restful period--just before undermining storms set in. His first English teacher, Pedler, had been simply brought up, on thoroughly practical, honest lines. Crum Brown, a great master of his art, will have exercised a more philosophic influence upon his mental development. The period was not yet when chemistry was to be expanded, not on strictly scientific principles but, in large part, on religious lines, as the worship of faiths and doctrinal practices rather than of verified, unassailable fact. Ray is, therefore, not the modern, speculative, uncritical chemist but a late comer in the good old school that would take nothing for granted.

I can in large measure recapture the influences that were at work in framing his outlook as a chemist, as I knew both his trainers intimately. Pedler came to the Royal College of Chemistry, where I was a student, in 1867, after spending two years in studying pharmacy. We were intimate friends to the end of his life, in 1918. Frankland set him the task of separating the two amylalcohols in fusel oil, following Pasteur's directions; he was to oxidise these to the two corresponding valeric acids so as to ascertain the special properties of the active acid This was the first study of optically active compounds undertaken after Pasteur had specially directed attention to the phenomena of optical activity. The work was done in the basement laboratory at the Royal College of Chemistry, not at the Royal Institution, as Sir William Tilden states in his Obituary notice of Pedler In evaporating down large bulks of liquid, he stank the place out I have ever since 'smelt' Fusel Oil, Optical activity and Pedler together-

"Smells are surer than sounds or sights
To make your heart strings crack---"

Van't Hoff did not become the advocate of the tetrahedral hypothesis in explanation of optical activity until 1875. two years after Pedler was appointed Professor in Calcutta. The Amhenius electrolytic dissociation hypothesis had not attracted any great attention up to the time when Ray left Edinburgh. James Walker, who was his fellow student, had not yet visited Leipzig to be overcome by Ostwald. The two speculations which have most influenced modern opinion, up to the time when electronic considerations were introduced, were therefore brought under both Pedler's and Ray's notice from a distance, so did not influence either in any special way Both may be said to have been rational conservatives.

Merely as a chemical student I early became interested in India as the land of Indigo and a variety of other dyestuffs, also the land of the Poppy, at a time when we were only beginning to guess at the constitution of complex natural compounds. Early in the 70's. I came into touch with its snakes, as a considerable amount of cobra poison, collected by Sir Joseph Fayrer, was put into my hands by my friend Lauder Brunton, the physician. I did what little I could with it Nothing alkaloidal was to be found and at that time we were in no way able to account for its virulence. A few years later, I was fortunate in obtaining, through Kew. directly from India, two new turpentines--from *Pinus khasya* and *Pinus longifolia* The oil from *pinus khasya* was of special interest, as it proved to be the optical opposite fo French Oil of Turpentine " it is now known to be almost entirely dextro-a-pinene, *Pinus khasya* may therefore be ranked high among conifers as setting the highest example of a pure life " that its French cousin should be left-handed is more than passing strange--the two trees deserve close comparative study.

When the City and Guilds of London College was established. at South Kensington in 1884. there was much talk of the Indian Civil Engineering College, at Cooper's Hill. near Windsor. My friend McLeod, who had been lecture assistant to Hofmann and then to Frankland. was Professor of Chemistry there. My engineering colleague, Prof. Unwin, came from there. Unfortunately, the College was soon closed down and our College, in a measure, took its place, as a school for men going out to India-- (Sir) Alfred Chatterton and many others. In this way. I was more directly brought

into touch with Indian life and could better appreciate its diversity I made my first visit to India in 1914, on my return from the British Association meeting in Australia. Via Java Singapore and Ceylon I had thus gained an insight into tropical agriculture-- sugar cane, rice, palm, coffee, indigo, tea, rubber etc. Travelling up Ceylon, after visiting the marvellous ruins at *Anaradnapura*, I took train to Madras and thence to Calcutta; from there, I visited Pusa, as well as Darjeeling and the nearby Cinchona plantations and Quinine factory My ambition had ever been to see the Himalaya--at last it was satisfied ! My pilgrimage was made For sheer, ineffable beauty, nothing I have seen in the world can compare with the distant mountain view from Darjeeling of majestic Kanchenjunga, attended on either side by a long range of snowy giants of only slightly lower magnitude embanking the entire horizion--- "the greatest and grandest mountain range in the world". A couple of days later, a little lower down, when visiting the Cinchona factory, I had an entrancing view of the mountain, shortly after sunrise actually from my bed looking out of the window Ever since, I have thought of India in terms of Kanchenjunga With such beauty in the backgroud, there cannot for ever be strife in its shadow, though much suffering may be inevitable The future office of our science must be to minimise such suffering and to make the beauty of the mountains and of nature generally felt to the full It is to this end, I believe, that chemistry will need be cultivated in India No other science can so minister to the public weal

It was my privilege to give serveral lectures to Prof Ray's students in Calcutta. I dwelt, as I always must, on the need of studying method--*on the need of learning to use knowledge rather than to know* The way of the world is rather to misuse knowledge, if not to wallow in ignorance As yet we have little conception of the art that is to be- the art of using knowledge methodically, with logical purpose, to a calculated end , the art of comparative study We are too much carried away by sentiment, by our feelings and desires-- we rarely act with thought or recognise how great is our ignorance and how little right we often have to act upon what we are pleased to call our opinions This is our great difficulty to-day, the difficulty with which all government is beset The conditions under which we live-- our social systems- are very complex to unravel the complexities is more than difficult, few are competent

to do so. 'In a broad sense', the great Ruskin remarks, 'nobody has a right to have opinions but only knowledges' Still in the words of a common proverb-- "it is human to err." We can only overcome this inborn tendency by making a right use of knoweldge-by the practice of scientific method. Modern progress, particularly in engineering, is the outcome of our systematic use of the method We have yet to apply it to ourselves. The schools have not yet learnt to use it. When they do, they will meet with only limited success--just as they do in teaching subjects generally. The majority probably will never become scientific in outlook, but just hewers of wood and drawers of water, mere artificers These have to be taught far more simply than the few who have the ability to master method the few who can be artists I have written so much on this subject, specially in my Essays on the Teaching of Scientific Method (Macmillan) that I need now say no more

What is called Research has been grossly overdone in recent years. The vain attempt has been made to superadd a course in research to the ordinary all but entirely didactic course the degree by research has been made the fashion at our Universities It has long since worn out its welcome What is needed is to teach the spirit that is behind all true research work--the spirit of logical inquiry, whether by observation or experiment, throughout the entire course of school training When children are allowed and trained at school from the beginning to see and think for themselves, some progress will be made, some uplift of the general intelligence will follow. I gather from Ray's own writings that the need for such training in India is specially marked, but he foresees the difficulty of imparting it

A bad example has been set from our side--the themes given out for study have too often been trivial and of not future value A far better training is to be obtained by careful study and repetition of classic work of the old masters than by executing set exercises, which merely involve mastering another example in proof of an established rule. The student's aim should be proficiency, not publication of something which counts for nothing when published

My own feeling has always been that it would be to the advantage of an Indian School of Chemistry to work out its own salvation rather than resort to European training This is already being done

in advanced Physics-- with remarkable success. The exercise of individual effort is far more likely to lead to advance and the development of originality than is submission to a teacher, however eminent In chemistry specially practice alone maketh perfect. What chemists are most suffering from to-day is lack of serious purpose--lack of broad and fundamental knowledge through failure to study the ancient books of learning. Liebig's warning to Kekule, "that to be a chemist a man must ruin his health by study", true when he gave it, is more than true to-day. To be a chemist of worth a man must be everything else in some degree-botanist, geologist, physiologist, physicist and socialist.

As to subject matter, there will always be work to be done in connexion with industry. The great work of the future, however, specially in India, will be the development of agriculture with the definite object in view of providing food of approved value, far higher in quality than that now produced. Only in recent years have we been able to set this before us as our object.

We have failed thus far, even in England, to place Agriculture upon a pedestal of the highest scientific endeavour. We have had no efficient College to this end. I can imagine no higher service to India than the establishment of such an institution. Only a potential Liebig will be able to bring it into being and supervise its operations Twenty years hence, perhaps, such a leader may be forthcoming, if meanwhile a few men who feel that they have some call to such service, some biological feeling, will set themselves in training, disregarding academic traditions and forswearing all desire to advertise that they have knocked another spot off another atom or in some other way, of remote concern to the world, made themselves exceptional

Competent chemists, they will carry on their studies, both in field and laboratory, in every possible and desirable direction, so as to secure a commanding knowledge of the problems of animal and plant life and of the soil. Only men so qualified, with ripened powers of imagination, will be competent to act as saviours of the people in the not distant future. The example Sir Prafulla Chandra Ray has set may well serve to encourage such an order into being. They will be the scientific missionaries of the future, sworn to social

service alone.

When and if it be established, I suggest that the College be called *Kamet College-* in view of the many attempts made before the mountain was climbed and the arduous task undertaken at its final conquest. The Himalaya stand out-asking that real effort be made in the plain as well as upon their slopes. They will furnish the power, in due course, when it can be well used

Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932

TRIBUTE

Acharya Ray I had the privilege of knowing for the first time when Gokhale was his next-door neighbour in 1901 and I was undergoing tutelage under the latter It was diffcult to believe that the man in simple Indian dress and wearing simpler manners could pssibly be the great scientist and professor he even then was. And it took my breath away when I heard that out of his princely salary he kept only a few rupees for himself and the trest he devoted to public uses and particularly for helping poor students. Thirty years have made no difference to the great and good servant of India. Acharya Ray has set us an example of ceaselesss service, enthusiasm and optimism, of which we may well be proud

Y.C.P.
24 5.32

M.K.Gandhi

Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932

আচার্য ডাঃ সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রে যাহা প্রকাশিত হইত তাহাই পাঠ করিয়া মনে মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। তখন ভাবিতে পারি নাই যে প্রীতির আকর্ষণে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য আমার উপর প্রেমের আহ্বান আসিয়া পড়িবে। কিন্তু সংসারে অনেক অসম্ভব ঘটনাও ঘটিতে দেখা যায়, আমার উপরেও ডাঃ রায় সম্বন্ধে লিখিবার জন্য অনুরোধ অকস্মাৎ আসিয়া পড়িল। কোথায় তিনি, কোথায় আমি। তিনি বিজ্ঞানসাগরে সন্তরণদক্ষ সুপণ্ডিত; আর আমি প্রজ্ঞানসাগরের তীরস্থ বালুকণা সংগ্রহে অভিনিবিষ্ট! তদুপরি বর্ত্তমানে আমি "দৃষ্টিহীন ও নাড়ীক্ষীণ" সম্প্রদায়ের একজন হইয়া আছি। এখন আমার পক্ষে আচার্য রায় সম্বন্ধে এদিকে ওদিকে ছুটিয়া গিয়া কিছু জানিবার চেষ্টা করার অবকাশও নাই, আর ক্ষমতাও নাই; কিন্তু তিনি আমাদের এতই অন্তরঙ্গ যে তাঁহার বিষয়ে লিখিবার অনুরোধ কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারি না।

তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে সর্বপ্রথমেই তিনি যে কি রকম মানুষ তাহাই বুঝিতে ও বুঝাইতে লেখনী ধাবিত হয়। সভাসমিতিতে তাঁহার সহিত আমার দুই চারিবার চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় হইলেও অনেক দিন যাবৎ আমার বড়ই দুঃখ ছিল যে তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠতরভাবে পরিচিত হইতে পারি নাই। অবশেষে এক বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া শতাব্দীর মাঘোৎসবের রবিবারে তাঁহার সহিত উভয়ে দেখা করিতে গেলাম। আমাদের আশঙ্কা ছিল যে ডাঃ রায় যেরূপ কাজের লোক তাহাতে হয় তো তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কিন্তু সম্ভবতঃ রবিবার বলিয়া আমাদের সে আশঙ্কা নিরর্থক হইল-তাঁহার সহিত দেখা হইবার কোনই বাধা ঘটিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানমন্দিরের একপ্রকোষ্ঠে তিনি বোধ হয় আহারান্তে বিশ্রাম করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। দেখি, তিনি একটী ক্ষুদ্রায়তন চারপায়ায় শয়ান, কিন্তু জাগ্রত। দেখিয়া আমার মনে হইল এই দরিদ্র দেশের অধিবাসী যিনি এবং এই দরিদ্র দেশের অধিবাসীদিগের সেবাব্রত যিনি প্রাণের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ চারপায়াই বিশ্রাম করিবার উপযুক্ত উপকরণ। এত বড় বৈজ্ঞানিক যে গৃহ অধিকার করিয়া আছেন, সেই গৃহের কোথাও বিজ্ঞানের 'ব' হইতে 'ন' পর্যন্ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না। না ছিল কিমিয়াবিদ্যার উপযোগী একটি বোতল আর না ছিল কোন প্রকার রাসায়নিক উপকরণ। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সাদরে অভ্যর্থনা-

করিলেন. প্রায় এক ঘন্টা কাল ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজ. বিজ্ঞান. খদ্দর. প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলিয়াছিল। সমস্ত আলাপআলোচনার ভিতর বিজ্ঞান বিষয়েই হউক বা খদ্দর প্রচার সম্বন্ধেই হউক তিনি নিজে যে কত গুরুতর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন— এক কথায় তাঁহার নিজের কৃতিত্বের বিষয়ে একটি কথাও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। এত বড় বৈজ্ঞানিক ও মনীষী ব্যক্তি যে কিরূপ নিরহঙ্কার শিশুর ন্যায় সরল প্রকৃতি সেইদিন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। আজকালকার দিনে এ'প্রকার বিজ্ঞতার সঙ্গে সরলতায় মাখা মানুষ পাওয়া যে কি প্রকার দুর্লভ, তাহা হয় তো আমার না বলিলেও চলে। কথালাপের পর এই শিশুপ্রাণ পণ্ডিতের নিকট বিদায় লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। সে চিত্র এখনও আমার নয়নের সম্মুখে ভাসমান।

বিজ্ঞান অনেকেই অধ্যাপনা করেন ও করিতে পারেন. কিন্তু ছাত্রগণের উপর সকল অধ্যাপকের কেমন একটা সুদৃঢ় ও সুগভীর প্রভাব ও অধিকার থাকিতে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রভাব ও অধিকার কিন্তু ছাত্রগণের উপরে আশ্চর্য্যরূপ বিস্তৃত দেখা যায়—ছাত্রগণের মধ্যে তাঁহার নাম যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে—ছাত্রগণের নিকট his name is one to swear by and to conjure with! ইহা একটি মনস্তত্ত্ব বিষয়ক সত্য যে প্রীতি প্রীতিকে আকর্ষণ করে। এই মহাবৈজ্ঞানিকের বৈজ্ঞানিকতা নহে, কিন্তু ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও প্রীতি উহাদিগকে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করে এবং পরস্পরকে এক আশ্চর্য্য সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করে। পুরাণাদিতে আচার্য ও শিষ্যদিগের মধ্যে যে একটী প্রীতিমূলক সম্বন্ধের বিষয় যথাতথা উল্লিখিত দেখি. আচার্য রায় ও তাঁহার ছাত্রবর্গের মধ্যে সেই মধুর সম্বন্ধ সম্পূর্ণ জাগ্রত দেখিতে পাই। ডাঃ রায়ের আচার্য উপাধি সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে।

আমার ন্যায় নিতান্ত অবৈজ্ঞানিকের পক্ষে বিজ্ঞানের দিক হইতে প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা হইবে, তাহা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু দুই চারি কথা না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না।

বিজ্ঞানের দিক হইতে জগতের মহাসভায় ভারতের স্বর্ণসিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অধিকার যে সকল ভারতবাসী মহাপুরুষ লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে ডাঃ সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম—সর্ব্বপ্রথম না হইলেও একজন যে অগ্রণী তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ডাঃ রায় যখন Nitrite of Mercury প্রথম আবিষ্কার করেন, তখন তিনি ভারতবাসী হইয়া দেশে বিদেশে. প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন সেই সম্মানসূচক জয়ধ্বনিতে আমার ন্যায় অবৈজ্ঞানিকেরও বক্ষ উৎসাহ ও আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সত্রে তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা আমার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছিল. তাঁহার

প্রণীত "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" পড়িয়া তাহা আরও দৃঢ়তর হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন, এরূপ ধারণা আমার পূর্ব্বে ছিল না। তিনি বাঙ্গালীর দাস মনোভাব ছিন্ন করিয়া কেবল নিজেই যে জ্ঞানবিষয়ে মুক্তির আস্বাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন তাহা নহে, শত শত ভারতবাসীর সম্মুখে সেই মুক্তির রাজপথ উন্মুক্ত করিয়া এক নবতর আশার সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত করিবার চেষ্টায় প্রাণপাত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারই সেই প্রাণপণ প্রচেষ্টার ফলে আজ আমরা কত ভারতবাসীকে বিজ্ঞানবিষয়ক শ্রেষ্ঠতা লাভের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিতেছি।

কিমিয়াবিদ্যা (Chemistry) সম্বন্ধীয় গবেষণা ও আলোচনায় কি প্রকার মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিতে হয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রই নিজের জীবন ও উপদেশের ভিতর দিয়া তাহার আদর্শ ভারতবাসীর সম্মুখে সর্ব্বপ্রথম ধারণ করিলেন এবং তাঁহার ছাত্রবর্গের অন্তরে সেই ভাব সম্যক উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার প্রেরণা তাঁহার ছাত্রবর্গকে যে কিরূপ অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

রসায়নকে কেবল পুঁথিগত তত্ত্বহিসাবে তিনি দেখিতেন না, কিন্তু বিজ্ঞানের এই অংশকে কিরূপে দেশের উন্নতি ও মঙ্গলসাধনে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহাই এই দেশসেবক নীরব কর্ম্মীর একান্ত ধ্যানের ছিল। মঙ্গলময় ভগবান তাঁহার এক সুন্দর সুযোগ ও অবসর প্রদান করিলেন। Bengal Chemical & Pharmaceutical Works যখন নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া যাইতেছিল, তখন ডাঃ রায়ই উহার কর্ণধার হইয়া ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে উহাকে কেবল সঞ্জীবিত করিয়া তুলেন নাই, বলিতে গেলে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সমস্ত ভারতের মধ্যে অন্যতম শক্তিমান রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানরূপে দাঁড় করাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার সকল কার্য্যেরই মূল প্রবর্ত্তক স্বদেশপ্রেম। সেই স্বদেশপ্রেমই তাঁহাকে এত বড় প্রতিষ্ঠানের বলিতে গেলে একচ্ছত্রী ভারগ্রহণে অকুতোভয়ে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। তিনি কেবল রসায়নবিৎ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি যে কিরূপ কর্ম্মকুশল ও practical লোক ছিলেন এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি ১৮৯২ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একাদিক্রমে আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ উহার কর্ণধারস্বরূপে উহার সকল বিভাগে যথাযুক্ত কর্ম্মের ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতেই সম্যক প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি প্রাণমন ঢালিয়া ইহার পরিচালনায় দক্ষিণ হস্ত বিস্তার না করিলে বঙ্গের গৌরব তথা ভারতের গর্ব্বস্থল এই প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা দেখিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ।

তাঁহার কর্ম্মকুশলতা আশ্চর্য্য, তিনি দেশের ভাল বলিয়া যাহামনে করিতেন তাহার সফলতা সাধনে সমস্ত হৃদয়মন ঢালিয়া দিতেন- নিরলস হইয়া তাহাকে কৃতকার্য্যতার অভিমুখে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট হইতেন এবং সেই কারণে তাঁহার কর্ম্মকুশলতাও পরিব্যাপ্ত

হইয়া পড়িত: ইহার দৃষ্টান্ত আমরা তাঁহার খদ্দর প্রচারকার্য্যেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত এক মতে বুঝিয়াছেন যে, খদ্দরের বহুল প্রচারই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ও উন্নতি আনয়নের প্রধানতম উপায়, এই কারণে খদ্দর প্রচারকার্য্যে তিনি যে কিরূপ প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই সূত্রে তিনি বেঙ্গল কেমিকেলের ন্যায় খাদি প্রতিষ্ঠানেরও অন্যতম সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে দাঁড়াইয়া আছেন, এই কার্য্যে তিনি অকাতরে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেও পশ্চাদপদ হন নাই।

স্বদেশপ্রেম কিরূপ তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিজড়িত তাহার ইঙ্গিত আমরা উপরে দিয়া আসিয়াছি। তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার দেশবাসিগণ স্বাধীন জীবিকার অভাবে অন্ন সংস্থানের জন্য একমাত্র চাকরীর সন্ধানে ঘুরিতেছে, তখন তাঁহার কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল এবং তিনি উহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কেবল তত্ত্ব হিসাবে নহে, কিন্তু ব্যবহারিক রসায়নবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া শত শত ছাত্রকে দেশের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। সেই সকল ছাত্র স্বাধীন জীবিকার উপযোগী নব নব প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। ইহা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না যে, আজ স্বদেশীয় সাবান প্রভৃতির যে সকল কারখানা স্থাপিত দেখিতেছি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহশীল ছাত্রবর্গের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শই সেই সকলের মূল উৎস।

উপসংহারে আমি ভগবানের নিকট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি এবং তাঁহার নিকট এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি যে, আমার স্বদেশবাসিগণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রসায়ন প্রভৃতি মঙ্গলপ্রসূ বিজ্ঞানসমূহ যেন আয়ত্ত করেন এবং সেগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা স্বাধীন জীবিকার পথসকল উন্মুক্ত করিবার শক্তি লাভ করেন। স্বদেশবাসিগণ পরস্পরকে অকৃত্রিম সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ করুন এবং পরস্পরের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বাধীন জীবিকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন। এইরূপ করিলেই প্রফুল্লচন্দ্রের জয়জয়কার হইবে এবং ভারতমাতা নবতর উজ্জ্বল মুখশ্রী ধারণ করিবেন। তখনই দেশবাসিগণের মস্তকে ভগবানের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হইবে।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্—সমপ্রাণে অগ্রসর হও, সমপ্রাণে কথা বল এবং তোমাদের হৃদয় সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হউক!

Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932

অভিনন্দন

মানকুমারী বসু

দেব!

শুক্তি মাঝে মুক্তা যথা খনি মাঝে মণি,

তেমনি আসিলে তুমি এ আঁধার দেশে।

দেবকী সাধনা সাধি কংস কারাগারে

পাইলা পুরুষোত্তম পুত্র নীলমণি—

তেমতি মা বঙ্গলক্ষ্মী তপো আচরিয়া

লভিলা দেবের বরে প্রফুল্ল রতনে!

জনম সে পল্লিকোলে—বিহগকূজিতা

স্নিগ্ধশ্যামা, ফুলময়ী, আড়ম্বরহীনা;

বিধি দিলা পুণ্য, কর্ম্ম ললাটে লিখিয়া,

উদাসী শঙ্কর শিব—রাজরাজেশ্বর

কুবের ভাণ্ডারী যার তবু সে ভিখারী—

সে শুধু পিশাচ ভূতে দিবে নব প্রাণ!

ষোড়শ মাতৃকা দিলা শুভ আশীর্ব্বাদ

অক্ষয় কবচ দিলা অলক্ষ্যে শিরসে;

অর্পিলা দেবর্ষি দল তপোবল যত,

বিশ্বের নমস্য বীর চির ব্রহ্মচারী;

বিজ্ঞানের সরস্বতী কহিলা হাসিয়া,

"আপনা সঁপিও বাছা! দেশের কল্যাণে।"

সপ্ততি বর্ষের তাই শুভ অনুষ্ঠান;

প্রফুল্লজয়ন্তী আজি বঙ্গমা'র কোলে!

বিশ্বের মঙ্গল কর্ম্মী আত্মত্যাগী যোগী,

দীনে দয়া, সেবাব্রতী, লোকহিতে রত,
ধনী, দীন, জ্ঞানী, মূর্খ সবারি বান্ধব:
কি দিব তোমারে মোরা—পারি কিবা দিতে?
আজি যে ফুটিছে ফুল কানন উজলি
তোমারে পূজিতে দেব! তব গুণ গাহি।
আজি যে গাহিছে পাখী মধুর কাকলী
তোমারি মহিমাগীতি দিগন্তে ছড়ায়ে।
আজিকার রবিশশী যশোরাশি তব,
ঢালিছে বিশুভ্র পূত ভাস্বর কিরণে।
কত দেশে কত পূজা দিলা ভক্তিভরে
কত অনুরক্ত ভক্ত গুণগ্রাহী তব।
আজি তব দীনা মা'র অঞ্চলের নিধি!
লহ মাতৃহস্তে শুভ ধানদূর্ব্বাফুল।
আমরা নগণ্য দীন যদিও জগতে
তথাপি গর্ব্বিত আজি তোমারি গৌরবে।
দিন শুভময় বিধি আমাদেরি তরে
তোমারে আরোগ্য, আয়ু, মহতী শকতি।
আকাশে নিনাদে শঙ্খ অমরনিচয়
প্রফুল্লজয়ন্তী আজি প্রফুল্লের জয়!
অনুরক্ত ভক্ত আমি প্রণমি চরণে,
এ সুদিন স্মরি যেন বাকী যা' জীবনে।

Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932

দুই দিন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বোধ হয় ১৯১৪ সালের কথা।

নতুন কলকাতায় এসেছি, খুব কম লোককেই চিনি। একদিন হঠাৎ খেয়াল গেল ডাক্তার রায়ের সহিত আলাপ কর. চাই। তাঁর কথা আমি স্কুলে থাকবার সময় শুন্‌তুম খগেনদার কাছে— খগেনদা (এখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) আমার বছর তিনেক আগে ম্যাট্রিক পাশ করে কল্‌কাতায় এসেছিলেন, ফিরে গিয়ে এখানকার নানা উল্লেখযোগ্য অবশ্য-দ্রষ্টব্য বস্তুর তালিকার সঙ্গে ডাক্তার রায়ের নামও করেন। বোধ হয় সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে প্রসুপ্ত ছিল।

সন্ধান নিয়ে জান্‌লুম ডাঃ রায় বেঙ্গল কেমিক্যালের বাড়িতে থাকেন—তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিস ছিল আজকাল যেখানে 'মোহাম্মদী'র আপিস ওই বাড়ীটাতে।

গ্রীষ্মাবকাশের ঠিক আগে, কল্‌কাতায় খুব গরম। অত বড় লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্চি, ভয়ে ভয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গেলুম উঠে। ছোট্ট একটা ঘরে একটা ছোট্ট খাটে কে একজন শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন, পায়ের শব্দ শুনে শয্যাশায়ী লোকটি মুখের সাম্‌নের থেকে বইখানা সরিয়ে ফেলে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন— কিরে, তুই আবার কে রে? আয়, আয়—

মনে হোল এ সম্ভাষণ অদ্ভুত। এর মধ্যে যে প্রাণখোলা আন্তরিকতা আছে, তা পাড়াগাঁয়ে স্নেহময় খুড়া জ্যাঠার নিকট থেকে হয়তো লাভ করা সম্ভব ছিল কিন্তু কল্‌কাতা সহরের প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন নামজাদা অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিকের মুখে এ ধরণের আদরের ডাক অদ্ভুত বলেই মনে হোল। তার পর গিয়ে কাছে বস্‌লুম। নিকটতম আত্মীয়ের মত ডাঃ রায় কত কি প্রশ্ন করলেন একটু পরে ডাক দিলেন—বৃন্দাবন—বৃন্দাবন—বৃন্দাবন তাঁর সে আমলের চাকর ছিল। বৃন্দাবন ঘরে ঢুক্‌লে ডাঃ রায় তাকে বল্লেন এই বাবুকে এক গ্লাস সরবৎ করে দাও।

এ কথাটাও আমার কাছে অদ্ভুত ঠেক্‌লো। সবে পাড়া গাঁ থেকে এসেচি আমার নিজের সম্বন্ধে বাবু বলতে কখনও কাউকে শুনিনি, তা আবার স্যার পি সি রায়ের মুখ থেকে এ ভাবে শুন্‌বো কে স্বপ্নেও এ কথা ভেবেছিল? আমাদের দেশের স্কুলের থার্ড পণ্ডিত মশায়ও চাকরের সাম্‌নে আমাকে এতটা সম্মানিত করতেন না যে! আসবার সময় ডাঃ রায় বল্লেন— রবিবারে তোর এখানে নেমন্তন্ন রৈল, দুপুরে খাবি।

করপোরেশন ষ্ট্রীটে কাকার মেসে এসে উঠেছিলুম। সেখানে আমার সমবয়সী দু তিনটি ছেলে থাক্‌তো—কেউ পড়্‌তো, কেউ চাক্‌রী করতো— আর সব কেরাণী বাবুর দল, তাঁদের বয়স বেশী। আমি ছেলেদের দলে কথাটা সগর্ব্বে প্রচার করে বেড়ালুম। কেউ বিশ্বাস কর্ল্লে, কেউ কর্ল্লে না। রবিবারে বেলা এগারোটার সময় ডাঃ রায়ের ওখানে গেলুম। সেদিন গিয়ে দেখি খুব ভিড় ঘরটাতে। এক ভদ্রলোক (নাম মনে নেই) জার্ম্মানি থেকে (তখন যুদ্ধ বাধে নি, সাম্‌নের আগষ্ট মাসে বাধ্‌ল) চাম্‌ড়ার কাজ শিখে এখানকার কোন্ ট্যানারিতে বড় চাক্‌রী পেয়েছিলেন—তিনি তাঁর জার্ম্মানির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন,আমি সসম্ভ্রমে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ তাঁর গল্প শুন্‌লুম।

তিনি বল্‌ছিলেন—অনেক সময় যখন বুঝতে পারিনে চাম্‌ড়াটা ঠিক তৈরী হয়েচে কি না, তখন একটুকরো মুখে ফেলে দেখি—আমার ভারী খারাপ লাগলো কথাটা। মুখে আবার চাম্‌ড়া ফেলে দ্যায় কি কোরে! নতুন তখন দেশ থেকে এসেচি কি না!

অনেক বেলায় খেতে বস্‌লুম। ডাক্তার রায় একটা ছোট মার্ব্বেলের টেবিলে, আমি মেজের ওপর। কিন্তু খাবার থালা দেখে নিরাশ হলুম। একটু আলু ভাতে, তার ওপর বৃন্দাবন সামান্য একটু মাখন দিয়ে গেল। নিরামিষ তরকারী, ডাল ও মাছের ঝোল। এত বড় একজন নামজাদা লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে অনেক উপাদেয় দ্রব্য খেতে পাওয়া যাবে আশা করেছিলুম, বিশেষ করে তখন বয়স অল্প, কিন্তু এ আবার কি নিমন্ত্রণ খাওয়া? আমাদের গ্রামে একজন গরীব লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণেও এর চেয়ে ভাল খাওয়ায়।

ডাক্তার রায় বল্লেন—মাখন আর আলুভাতে, ওঃ, There is nothing like this under the heaven-- বেশ করে মেখে নে, মেখে নে। মনে মনে ভাবলুম আহা ভারী তো, এ আমি অনেক খেয়েচি বাড়ীতে—বাড়ীর সরের টাটকা ঘি ও আলুভাতে এর চেয়েও ভাল লাগে। আচার্যদেবের আহারীয় তালিকা সেদিন যে এক লোভী নির্ব্বোধ পল্লীবালকের রসনা পরিতৃপ্ত করতে পারেনি একথা আজও মনে হলে হাসি পায়।

বিকেলে গড়ের মাঠে বেড়াতে গেলুম ডাঃ রায়ের সঙ্গে। গাড়ীতে আর কেউ ছিল না, শুধু তিনি আর আমি। তিনি বড় বড় বাড়ী দেখিয়ে বল্‌তে লাগলেন—এই দ্যাখ এটা গ্রাণ্ড হোটেল, ওটা হোয়াইটওয়ে, লেডল'র দোকান, ওটা অমুক—আমি তার আগে সে সবই চিনি। মেজ মামার সঙ্গে আরও দু তিন বার কলকাতায় এসেছি ও সব দেখে শুনে গিয়েছি, তবুও চুপ করে শুনে গেলুম। ডাক্তার রায়কে অত্যন্ত আপনার লোক বলে মনে হোল —সেবার মেজ মামাও এত আগ্রহের সঙ্গে কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থান আমায় দেখান নি তো?

ইডেন গার্ডেনে একটা গাছতলায় অয়েলক্লথ পেতে আমরা বসলুম। সন্ধ্যার পরে ডাক্তার রায় আমার মেসের সাম্‌নে আমায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন। গাড়ী থেকে নামবার সময়

এদিক ওদিক চেয়ে দেখলুম আহা. মেসের একটা লোকও বারান্দায় দাঁড়িয়ে নেই. কেউ দেখলে না যে আমি স্যার পি সি রায়ের গাড়ী থেকে নামচি'

ছন্দিত প'ত্রক যশোহর) শ্রাবণ ১৩৩৯

Happy Comradeship

Dr. A.R. Normand

I am glad that the seventieth birthday of Sir P C Ray is being celebrated and I take this opportunity of adding my congratulations and good wishes to the many he is receiving

He was a student of Professor Crum Brown of Edinburgh University as I also was some years later and I felt that this was a link between us even before I had the pleasure of meeting him I met some weeks ago another student of Professor Crum Brown Sir James Walker a fellow student of Sir P C Ray and I enjoyed hearing something of the happy comradeship that existed in that laboratory in what is now the building of the medical school of Edinburgh University a comradeship renewed in later years when Sir P C Ray s book on the chemical achievements of ancient India roused my own interest long ago his simplicity of life his uprightness of character his devotion to the true welfare of his students and to the true welfare of India have been I know an inspiration to my students in Bombay

A R Normand M A B Sc Ph D
Late professor of chemistry Wilson college Bombay
Acharyya Ray Commemoration Volume · 1932

Sir P.C. Ray : A Radical Thinker

Sachin Sen

Sir P.C Ray does not belong to a world that is past; he does not speak in a language of the past; he takes a dynamic view of men and things, he examines and receives ideas after they are found immalleable in the furnace of criticism--- these are the virtues that have made him great. In a country which is governed by slokas and shastras, atrophied by traditions that have no merit save their age, asphyxiated by a false sense of dignity,--- it is really a pleasure to find a hero determined to uproot stale thinking and substitute a newer and more vigorous conception of life We are clogged and hampered with the compulsion of unmeaning rites, our strength is exhausted by our social ceremonials--- " from birth ceremony, through the whole series, to death ceremony--- exerting their way over both this world and the next, that we are bereft of the energy to take any step forward", the accumulated rubbish in the society has made our mind dead, arms weak and intellect uninquisitive; " speculative explanations, metaphors hardened by usage into quasi-factual statements, fantasies arising out of germinating and supressed impulses, false analogies, parables begotten and distorted, dogmatic excesses, the odd compromises of theological diplomatists, the craving for super-natural sanctions"--- all have mingled inextircably in our religious fabric, our pitiable immobility, " shrieking to the dead ghosts of the past to save us and living as a putrid and stinking corpse instead of as a living and self-renewing energetic creature ", is nauseating and suicidal Against all these vices and wastages, Sir P C.Ray has raised his banner of revolt He stands for the mobility and adventurousness of the race, for the freeing of shackles and prohibitions of all kinds about the most insignificant details of our daily career chloroforming our lives insulated in the confinement of our conventional solitary cell, for the establishment of perfect co-operation of life and mind He knows that stagnation is death and movement is life; the weak must perish and the strong would win, truth is not for beggars but for seekers; vindictive self-assertion is an invariable characterestic of the hopelessly damned, whereas harmonious unity which does not nourish a spirit of rejection but furthers glad acceptance is the ideal

of lovers of humanity, the serene light of freedom can only be enjoyed by those daring travellers who have been out to win the world outwardly and inwardly. but not by those householders who pine away their existence under the cartloads of household burdens and who are filled to the brim and loaded to breaking point with life-sucking rubbish in the dust-bins of the society

In our country life does not grow and blossom. the people surround themselves with a hard incrustation of the most narrow and obsolete prejudice They do not live in fulness. they merely pass their days and drag their existence Sir Prafulla is an iconoclast in this respect; he suffers no injustice. brooks no irrationality, respects no tutelage He is out to purge the society of its evils, indoctrinate the country with rational and bold ideas. and champion the cause of righteousness, untinged by timid religiousity He is liberal in ideal and catholic in outlook His mind is fertilised to receive and accommodate new ideas Logic and not magic makes and appeal to him, and necessarily he detests conservatism which hampers growth hammers new thoughts and hinders rational intercourse. As a scientist, he has brought scientific outlook in all his activities He observes he examines. he analyses and then he gets at truth The scientists respect nothing but truths and nothing is truth which cannot be proved That is what is called scientific attitude and this attitude he has preserved not only in his laboratory but also in other activities of life There he is a radical thinker--- a thorough reformer in politics and society He does not believe in accepting old things; he has faith in receiving new things That is what strikes me most in the life of Sir P C Ray

Sir P C Ray is one of those who subscribe to the creed that no political miracle can be built on the quicksands of social slavery Accordingly, he is a firm believer in the reforms of the society He has felt that the world is man-made and civilisation is masculine, the society has been designed and shaped in a way which makes great injustice to women-folk Sir Prafulla has strenuously fought for the emancipation of woman from the trammels of the society and its outworn ideas. He advocates late marriage which gives a new dignity to women, widow-remarriage which blots out inferiority complex in women, free mixing of men and women which brings the whole of mankind on an equal plane without relegating either

section to any subordinate place He is a believer in the democratisation of the society it is merit and not heredity that will count, equal opportunities should be thrown to all and no class should suffer from any disability He is also a believer in the economic interpretation of the society. people who are not economically potent factors have no place in his scheme of the society, the idle rich class who do not contribute stand condemned in his scheme

Sir P C Ray is a fighting thinker--- he fights against injustice and abuses When he sees in the political field that any injustice is being inflicted on the people at large, he fights relentlessly When he sees the abuses of Bengalee genius working in unproductive channels, he raises the alarm fearlessly In his brochure (in Bengalee) "Abuses of Bengalee genius," he pointed out how the Bengalee brains were employed in weaving fetters after fetters on the society on the plea of rites and ceremonials; that was a grim tragedy in the history of the Bengalee race In his view, the present system of university education by giving undue stress on the literary side and totally neglecting the vocational aspect is absolutely unsatisfactory and fouling the reputation of Bengal. He has never stopped to give wide publicity to his view and in fact he said on one occasion- "If I am made the dictator of the university for one day, I would shut down the Law Department for at least three years" He holds that the best of our youngmen are exhausting themselves in bleak obscurity in legal lines in lure of a phantom which comes in the case of a very few In the interest of the babe of a future aeon, he advocates vocational training and is averse to divorce education, from life.

Sir Prafulla Chandra is also a constructive thinker He believes in the industrialisaion of the country A Bengalee, he says, is loath to work, he has false sense of dignity and undue craze for university degree He always rebukes the idle and chastises the depraved. He condemns the fissiparous tendencies of the age.

"Words are slivern, deeds are golden", Sir P.C. Ray believes in deeds, he shines in deeds, he does not exhaust himself in mere words. He thinks and acts and leads others to act. As a scientist, he is quick and precise, practical and accurate. And also as a

scientist, he has boldness in thinking and in exploring new thought-regions. He does not like to live, move and have his being in 'inverted commas'; he wants independent thinking.

Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932

॥ प्रफुल्लप्रशस्तिः ॥

ज्ञानं तद्दुर्लभं लोके श्रेयसे भुवनस्य यत् ।

आचारो दुर्लभस्तत्र प्रचारस्तत्र दुर्लभः ॥ १ ॥

यस्मिन्नेतत्त्रयमपि सम्परिस्फुटमन्वहम् ।

स कस्यासि न वन्द्यस्त्वं तत्त्वां वन्दे समादरात् ॥ २ ॥

नैष्ठिकब्रह्मचर्येण धृतलोकहितव्रतः ।

मूर्तस्त्यागो न कस्य त्वं चित्तमत्राधितिष्ठसि ॥ ३ ॥

आचार्यान् परमाचार्यं शिष्यांस्ते विश्वविश्रुतान् ।

दृष्ट्वा हर्षातिरेकेण कस्य चित्तं न नृत्यति ॥ ४ ॥

स त्वं शुभाय सर्वेषां जीवेह शरदां शतम् ।

जीवतु त्वां समाश्रित्य जन्मभूश्च चिरं तव ॥ ५ ॥

शान्तिनिकेतन-विश्वभारती
आश्विन-कृष्ण तृतीया
शक० १३५४ } विधुशेखरस्य

প্রণতি

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জগত দেখেছে তোমা বৈজ্ঞানিকরূপে
হে আচার্য! দেখিয়াছে তারা তব জ্ঞান
গবেষণা, গৌরব মুকুটে তারা তাই
মণ্ডিয়াছে ভাল তব—জড়ের পূজারী!
দীন আমি পল্লীবাসী; বিজ্ঞান আগার
তব দেখি নাই; বুঝি না ক রসায়নে
আছে কিবা রস। তোমার অসীম জ্ঞান
কোন রেখাপাত মোর করেনি হৃদয়ে
অজ্ঞান তামসভূমি। যেদিন হেরেছি
তোমা মূক মুখে তুলি দিতে ভাষা,
দুর্ভিক্ষ বন্যার মাঝে দেবদূত সম
বরাভয় বিলাইতে, হেরিয়াছি যবে
অঙ্গুলি হেলনে ত্রস্ত অপসারি' দূরে
সরে যায় আর্ত্তি দুঃখ হাহাকার রব
সভয়ে প্রণমি তোমা, জেগে উঠে প্রাণে,
মনে নয়নের কোণে আশার আশ্বাস—
সেইদিন হতে শুধু গুরু বলি দেব
লয়েছি মানিয়া। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
ঢালি দিতে চরণে তোমার প্রাণ মন,
দেহ একান্ত হইয়া গেছে।
হে যাজ্ঞিক,
বিশ্বজিৎ ব্রতে ব্রতী প্রীতিভরে লহ

আজি দীনের প্রণাম। পল্লীর দেবতা,
দেশহিত ব্রত তুমি; পল্লীবাসী তব
দীর্ঘায়ু কামনা করে। ওগো সন্ন্যাসী,
মনুষ্যত্ব ধর্ম্মে পূত ওগো কর্ম্মবীর,
চিরজীবী হয়ে রও মাতৃঅঙ্ক জুড়ি'
দ্বিধা দ্বন্দ্ব মাঝে তব শ্রেষ্ঠ অবদান
জ্বলুক দেশের বুকে চির অনির্ব্বাণ।

'ইঙ্গিত' পত্রিকা (যশোহর) শ্রাবণ ১৩৩৯

" The welfare of India must be our first concern our second concern, our last concern, we are Indians first and Hindus and Muslims and Christian and Sikhs and Parsees afterwards "

" We must not allow our loyality to the motherland to be swamped by the wave of extra--territorial patriotism India must not be a spoke in the khilafat wheel gyrated from Istamboul The Swaraj of India must be our one--Compelling goal, and everything else must be kept in its place "

Convocation address by Sir P C Ray
at Aligarh National Muslim University (1923)

প্রফুল্লচন্দ্র

অবনীনাথ রায়

তখন আমি দৌলতপুর কলেজে পড়ি। যে আদর্শবাদ থাকলে ঐ বয়সে জগৎটা স্বপ্নময় হ'য়ে দেখা দেয় বলা বাহুল্য তা আমার ছিল। বড় আদর্শকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতুম। অতএব আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ যে মনের মধ্যে পূজা পেত এ কথা স্বীকার করা বাহুল্য মাত্র। এমন সময় একদিন শুনলুম প্রফুল্লচন্দ্র আসছেন। তাঁর সর্ব্বস্ব নিংড়ে দানের সম্বন্ধে নানান গল্প শুনে আসছিলুম কিন্তু তাঁকে চোখে দেখতে পাব, একেবারে আমাদের মধ্যে এসে তিনি গল্পগুজব করবেন, এতটা সৌভাগ্য কল্পনা করতে পারি নি। কিন্তু তাই হ'ল।

একদিন বেলা দশটার ট্রেনে তিনি এসে নামলেন। ক্ষীণ অপরিসর চেহারা কিন্তু প্রশান্ত মুখশ্রীর মধ্যে চোখ দুই অপরিসীম ব্যথায় ভরা—জগতের সমস্ত করুণা যেন সেখানে নীড় বেঁধেচে। ষ্টেশন থেকে মিছিল ক'রে তাঁকে কলেজে নিয়ে আসা হ'ল। কিন্তু এসব পৃথক আদর আপ্যায়ন তাঁকে স্পর্শই করলো না। তিনি কারুর কাঁধে চড়লেন, কাউকে আদর করলেন, কাউকে বকুনি দিলেন, আমাদের সঙ্গে স্নান করলেন, নদীর ধারে দৌড়াদৌড়ি করলেন—এক মুহূর্ত্তেই আমরা ভুলে গেলুম যে একজন বিখ্যাত রাসায়নিকের সঙ্গে আমরা কারবার করচি, এ যেন আমাদের পুরাণো কোন বন্ধু, বিদেশে ছিলেন হঠাৎ অনেকদিন পরে আমাদের মধ্যে এসে আমোদে মেতেছেন। কেবল খাওয়া দাওয়ার সময় তিনি আমাদের সঙ্গে তাল রাখতে পারলেন না— সামান্য পেঁপে আর এক আধটুকরো ফল খেলেন।

তারপর তাঁকে দেখলুম মীরাটে—১৫ বৎসর পরে। সেই প্রশান্ত মুখশ্রী, ব্যথায় ভরা দুটি চোখ, পরদুঃখকাতর চিত্ত। এই দীর্ঘকালের ব্যবধান যেন তাঁর দেহে এবং মনে কোন ছাপই দিতে পারে নি। জরা তাঁর কাছে হার মেনেছে। এসেছিলেন প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিত্ব করতে কিন্তু কোন অভিভাষণই লিখে আনেন নি। অভিভাষণ মুখেই বলে গেলেন, আমরা লিখে নিলুম, চিরকাল বিজ্ঞানের সেবা করে আসচেন কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধেও কি প্রগাঢ় অনুরাগ! বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং ক্রমবিবর্ত্তন মুখে মুখেই বলে গেলেন। যে কয়দিন ওখানে ছিলেন মীরাটের প্রবাসী বাঙ্গালীদের আনন্দের সীমা ছিল না।

প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা আমার বার বার মনে হয়েচে—সেটি হচ্চে এই যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মানুষের কোন জাতিবিভাগ বা শ্রেণী বিভাগ নেই। তিনি সর্ব্ববাদীসম্মত রূপে

পূজ্য। কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি বাঙালী, কি মাদ্রাজী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি জৈন সকলেই তাঁকে সমভাবে শ্রদ্ধা করে। এত সহজে এবং এত সমান ভাবে সকলের শ্রদ্ধা যে তিনি আকর্ষণ করতে পেরেছেন এর মূল কোথায়? এর এক মাত্র কারণ হচ্চে তাঁর নিঃস্বার্থ দান এবং নিরহঙ্কার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। চিরটাকাল তিনি পরের জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিয়েই গেলেন, নিজে কিছুই ভোগ করলেন না কিম্বা কারুর কাছে হাত পাতলেন না।

ছাত্রজগৎ তাঁর কাছে ঋণী, তিনি কারুর কাছ ঋণী নন। জাগতিক সুখভোগ বলতে যা বোঝায় তাতে কোনদিনই তাঁর অভিরুচি হল না—এমন এক আদর্শবাদ জীবনের অবলম্বন ব'লে গ্রহণ করেছেন যার কাছে বস্তু জগৎ তার শত সহস্র প্রলোভন নিয়ে তুচ্ছ হ'য়ে গেল। তালি দেওয়া পোষাকের চেয়ে ভদ্র পরিচ্ছদ তাঁর অঙ্গে কোন দিন উঠলো না। আহারের তালিকা যে কত সংক্ষিপ্ত তা পূর্ব্বেই বলেচি। নিজে কিছুই নিলেন না কিন্তু পরকে কি ক'রে দেওয়া যায় এই চিন্তাই হ'ল তাঁর জীবনের ব্রত।

রসায়নশাস্ত্রের জ্ঞান লোকহিতার্থে নিয়োজিত করলেন— বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্ম হ'ল। এক কথায় বলা যায়, তিনি আমাদের দেশমাতৃকার সেবারূপ, কল্যাণরূপ। তিনি লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দেন নি, বড় বড় প্ল্যাটফর্ম্মে বক্তৃতা দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটান নি, রাজনৈতিক নেতা সাজেন নি, এমন কি সমাজ সংস্কারের দুরূহ পণও তাঁর নেই— তিনি দীর্ঘকাল ধরে অত্যন্ত নিভৃতে এবং অত্যন্ত নীরবে মানব জাতির সেবা ক'রে চলেচেন। তিনি সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর —তাঁরই মত নিস্পৃহ, তাঁরই মত আত্মভোলা। ভারতবর্ষের তিনিই আদর্শ।

'ইঙ্গিত' পত্রিকা, (যশোহর) শ্রাবণ : ১৩৩৯

From His Old College

To-day the whole country is ringing in joyful celebration of the Seventieth birthday of our illustrious countryman, Acharyya Prafulla Chandra Ray As a member of the Presidency College, Calcutta, I feel a special pleasure in joining my voice to this chorus of general rejoicings. We have the proud privilege of claiming the distinguished savant as an old boy of our college. It is here in our laboratories that he carried on his teaching and investigation work for 27 years and trained a devoted band of brilliant chemists, whose researches have exicited the admiration of the scientific world

Sir P C Ray's connection with Presidency College can be traced back to the late seventies of the last century He had been for four years a student of the science department of the college before he started for England for the furtherance of his studies.

He came back to the college in June 1889 as Assistant Professor of Chemistry Our Chemical Laboratory was at that time housed in an old one-storeyed building on the north of the compound in which the old Hare School had been located Some of the valuable researches of Dr. Ray were carried on in this earlier, humbler and unpretending laboratory In those days the teaching of Chemistry even for the B A Course was comparatively elementary and no training in practical work was necessary

Gradually through the persistent efforts of Dr Ray, backed by Sir A Pedler a new wing of the building was constructed and the laboratory was fitted up with necessary appliances

Prafulla Chandra became the Professor of Chemistry in 1896 Under his inspiring guidance the Chemical Department of the Presidency College made large strides in the early part of the present century. Attracted by the notable work that was being carried on more pupils joined in and the laboratory of Presidency College became the scene of lively chemical activity

Professor Ray grudged no trouble to help on the work of his pupils, and his valuable guidance enabled a large number of workers to develop ability for original research Thus by training batches of brilliant chemists to supplement and continue his noble work, he

has deservedly earned the title of the Father of the Indian School of Chemistry It was he who bitterly deplored the intellectual torpor and stagnation of the country and it was quite in the fitness of things that to him should devolve the noble task of regenerating Indian Chemistry.

In his monumental work, the History of Hindu Chemistry, he has shown how considerable were the attainments of ancient India in the field of science And it is mainly through his efforts that the land of Nagarjuna has renewed activities which lay dormant for centuries.

Professor Ray retired from Government service shortly after his appointment as Palit Professor of Chemistry Calcutta University in November 1916 Since then his official connection with his old College has ceased, but we sometimes have the honour of welcoming him to his old College on suitable occasions

His other activities will no doubt be recounted by other and more effective writers And I conclude this brief statement of Sir P C Ray's activities in the Presidency College with a humble tribute of respect to the illustrious savant

B.M. Sen
Principal, Presidency College

Achrayya Ray Commemoration Volume : 1932

A representative of what is best in East and West

Dr. Gilbert J. Fowler.

In Sir P C Ray we have a representative of what is best in Eastern and Western civilisation He is a scientific chemist, at home among the most modern conceptions of the science, and by his own labours and those of his students still continuing to advance our knowledge of the fundamental nature of chemical combination

At the same time by his business acumen and energy he has been able from small beginnings to build up the most successful enterprise in manufacturing chemistry in India He may therefore claim to be able to meet the active Western world on its own ground

Having thus won by his own efforts personal freedom and a measure of wealth he has chosen not the path of ostentation or display, but of simplicity and charitable service In this he follows the best traditions of the East

While his scientific and open mind refuses to support harmful or superstitious practices or beliefs, simply because they have the sanction of custom he yet retains his affection for all that is wise and well-founded in the ancient religion of his forbears Thus he retains the respect of European and Indian alike

All who know him will unite on this occasion of his 70th anniversary in wishing him, with heartiest goodwill, every happiness in the years yet to come

Gilbert J. Fowler. D. Sc. F. I. C.
Late Principal H. B. Technological Institute. Cawnpore

Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932.

আচার্যের পায়ে

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

সে আজ বাইশ বছরের কথা—প্রায় দুই যুগ। সবে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি। নিছক পাড়াগেঁয়ে না হ'লেও সহুরে ছেলের মতো Smartness ও বিজ্ঞতার বড়াই রাখতুম না; একটা সশ্রদ্ধ বিস্ময় ও নিষ্ঠার ভাব নিয়ে গিয়ে ছিলুম আচার্যের দর্শনে। একে অত বড়ো লোক তায় আবার অপরিচয়ের আশঙ্কা, রাজ্যের Shyness এসে বুকের ভেতর ঢেঁকির নৃত্য জুড়ে দিলো। কিন্তু সকল সংকোচের মাঝে একটা মধুর অনুভূতির কম্পন অনুভব করেছিলুম-, এ কথা বেশ মনে পড়ে। আচার্য রায়কে Close quarters এ খুব কমই দেখেছি, অনেক সময়ে কাছে যাবার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যথিত হ'য়েছি, দোরগোড়া থেকে দেখাই পেয়েছি, কথা কইবার সুযোগ না পেয়ে ক্ষুণ্ণমনে ফিরে এসেছি—কিন্তু আজ এই বাইশ বছর ধ'রে যতবার তাঁকে স্মরণ করেছি, প্রথম সাক্ষাতের সেই মধুর অনুভূতি জেগে উঠছে।

মনের তলায় ডুব দিয়ে কিন্তু সে অনুভূতির মূলে তাঁর গরিমার চাইতে মমতারই সন্ধান বেশী করে পেয়েছি। প্রফুল্লচন্দ্র রাসায়নিক, পণ্ডিত, গবেষক, হয়ত ব্যবসা-কুশলও, কিন্তু সে কথা মনে হবার আগে মনে পড়ে তাঁর শিশুর সরলতা আর সরস হৃদয়। ঐ শুষ্কশীর্ণ পঞ্জরের নীচে প্রেমের কি গভীর ফল্গুধারাই না বয়ে চলেছে!

আচার্য সম্বন্ধে নিতান্ত দু'টো নিজের কথাই বলবো এই সংকল্প নিয়ে কলম ধরেছিলুম, কিন্তু কথায় কথায় কলমের ওপর একটু বেদখল হ'য়ে পড়েছি। হ্যাঁ, প্রথম দর্শনের কথাই বলি আবার। একানব্বই নম্বর আপার সার্কুলার রোড—যেখানে এখন মোহাম্মদী আফিস আছে এবং কিছুদিন আগে প্রবাসী অফিস ছিল—সেই নাতিক্ষুদ্র বাড়ীটির দোতলায় একটি স্বল্পপরিসর কক্ষে পেলাম তাঁর দেখা। সময়টা ঠিক মনে নেই—বিকেলের দিকেই হবে।

শরীরটা সেদিন ওঁর একটু অসুস্থ ছিলো। কয়েকটি তরুণ ছাত্র তাঁকে ঘিরে বসে আছে, আমারই মতো তাদের অনেকের বয়স। কেউ পা টিপছে, কেউ মাথা টিপছে, চুল টানছে। কি কথাবার্তা হ'য়েছিলো আজ আর সে সব কিছুই মনে নেই, শুধু মনে আছে অপর ছেলেদের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে মনটা আমার অনেকক্ষণ ধরে লুব্ধ ভৃঙ্গের মত আচার্যের পা' দুখানার আশে পাশে ঘুরে ফিরছিলো। শেষটা হাত দু'খানিও যে কখন মনের অনুসরণ করে একেবারে তাঁর পায়ে যেয়ে পৌঁছেচে তা জানতেও পারিনি। পায়ের সেই ছোঁয়াটুকুই আজ মনে ও হাতে লেগে আছে—চন্দন লেপের মতো। আর সব ভুলে গেছি।

মাস দুই আগে 'ইঙ্গিতের' অর্ঘ্য নিয়ে সুদীর্ঘ বাইশ বছর পরে আবার তাঁর নিকটে গিয়েছিলাম। ষোল বছরের সেই ভীরু বিস্মিত বালক আজ আমার জীবনে মৃত. স্মরণ পথের পথিক—মনে যত. চুলেও তত পাক ধরে এসেছে—কিন্তু আচার্যদেবকে দেখলাম তেমনই চিরশিশু ভোলানাথ, মুখে হাঁসি. বুকে অতলস্পর্শ স্নেহ আর অকুতোভয় শক্তি, চোখে প্রতিভার স্থির দ্যুতি! পরিবর্ত্তন যা কিছু দেখলাম আমারই এই স্থবির জরাগ্রস্ত দেহে ও মনে।

আজও দেখি সর্দ্দি-কাশী, মাথার-যন্ত্রণায় কাতর, আলো সইতে পারেন না, তাই চোখে রুমাল বেঁধে বিছানায় শুয়ে আছেন, আশে পাশে ছাত্রদল ঘিরে বসে। লোভ হ'ল তেমনি করে আবার পা টিপে দিয়ে আসি—কিন্তু পারলুম না! প্রথম সাক্ষাতের দিনেও এমনি সংকোচ হয়েছিলো, তফাৎ এই যে সেদিনকার সংকোচ জয় কর্ত্তে পেরেছিলুম। আজ কেন পারলুম না—ক'দিন ধরে শুধু তাই ভেবেছি।

আর এক দিন তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম—আমার গ্রামে, সাগরদাঁড়ীতে; কপোতাক্ষীর তীরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ আচার্য স্বর্গীয় সমাজপতি মহাশয়কে পরিহাস ছলে বললেন "সেই নদী তেমনই বইছে, কিন্তু মধুসূদন যে কলধ্বনি শুনেছিলেন আমরা তা শুনি কই?"

গ্রামের একটি বলিষ্ঠ যুবককে দেখে আচার্যের সে কী উল্লাস! যুবকটির পিঠে গোটাকয়েক ঘুষি মেরে চিমটি কেটে তবে সে উল্লাসের উপশম হয়। আপন দেহের শীর্ণতার দৈন্য তাঁকে অহরহ দেশের ও জাতির কায়িক, মানসিক, আর্থিক সকল অসম্পূর্ণতার বিষয়ে সদাজাগ্রত ক'রে রেখেছে। তাই বুঝি বাংলার শ্মশানে তাঁর এ অক্লান্ত শবসাধনা। এ সাধনা বিফল হবার নয়। জীর্ণ পঞ্জরের নীচে দধীচির অমিত তেজ নিয়ে তিনি শতায়ু সহস্রায়ু হোন, তাঁকে শত প্রণাম।

সম্পাদক, 'ইঙ্গিত', (যশোহর) শ্রাবণ : ১৩৩৯

The great Scientific Renaissance

Dr. J.L. Simonsen

It has been my privilege to be associated with Sir Prafulla Chandra Ray as a member of the Indian Chemical Services Committee and also as Secretary of the Indian Science Congress during the year in which he was the President. It therefore affords me much pleasure to learn that his great services to science are to be recognised on the occasion of his 70th birthday.

The departments of chemistry in the various universities and university colleges in India are now so actively engaged in chemical research that it is difficult to realised the conditions existing when Sir Prafulla first commenced his work at the Presidency College Calcutta. Fresh from the Edinburgh laboratories and inspired by Crum Brown, he set himself the task not only to advance chemical knowledge with his own researches but also to train his students to do the same. The number of his students now holding high positions is sufficient testimony to his success. In the early days he received little encouragement from outside and only his indomitable courage enabled him to continue his work in an atmosphere, which even 20 years ago, was unfavourable.

I think that when the history of the scientific development of India during the last 40 years comes to be written, it will not be Sir Prafulla's own contributions to science, valuable as they are, which will fill its pages, but rather the great scientific renaissance which his example inspired and which has resulted in the recognition in India, as elsewhere, of the fact that the advancement of knowledge is one of the primary functions of a university. He would desire no higher tribute.

J.L. Simonsen. D. Sc. F.I.C.
University College of North Wales, Bangor. U.K.

Achayyra Ray Commemoration Volume : 1932.

Dr. P.C.Ray : The Dedicated Life

S.K. Maitra (Benares)

On the occasion of his seventieth birthday, I offer my humble felicitations to that living incarnation of Sacrifice, Dr P C Ray. His has been a dedicated life in the truest sense of the word The motto of his life is Service Whether in the cause of science or in the cause of his country, he has shown a devotion which is absolutely without a parallel And the great feature of his service has been its total selflessness If there is any man who has made selfless service his religion, it is Dr P.C Ray To glaring simplicity and sacrifice, Dr P C Ray has joined wonderful practical insight and business acumen The combination is probably unique in the history of our country The Bengal Chemical and Pharmaceutical Works are a lasting monument of his business enterprise and practical knowledge

Dr P C Ray is an ideal teacher. His relations with his pupils remind one of the best traditions of "Guru-Sishya" -relationship in ancient India It would not be an exaggeration to say that he lives for his pupils No teacher in recent times has trained so many worthy young men and no teacher is so proud of the achievements of his pupils One incident I shall never forget It occurred at the Bengali Literary Conference at Meerut in 1929 At the close of his address, he said, pointing to one of the most brilliant of his pupils--- Dr N R.Dhar--- and with tears rolling down his cheeks, "I can say of them what the mother of the Gracchus brothers said of her sons,--- These are all that I possess, I have no other assets." How can we pay homage to such a man? Our best homage to him is to accept his religion, the religion of selfless service All who have come in intimate contact with him have imbibed his cult of selfless sacrifice. If we want to show respect to him, we should join his band of selfless workers

Our country is particularly fortunate at this moment, for she possesses an incomparable leader, a great prophet and a wonderful worker In Gandhi, Tagore and P.C. Ray, she possesses all the three elements essential to success in her great struggle for freedom and self-determination--- great leadership, a noble vision and selfless devotion May she long enjoy the services of these three great sons of hers!

Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932

A HUMAN PERSONALITY

Dr. M. O. Forster

As an old friend and admirer of Acharyya Ray, my feelings in contributing to a commemoration volume on his completion of seventy years are not entirely joyous, because they carry me back to a date more than twenty-five years ago when, on the occasion of a perodical visit to England, his physical presence first precipitated itself in my laboratory. and sexagenarians, in common I suspect with septuagenarians, cannot contemplate without a pang the dissolution of so long a cycle.

Naturally his name was already well known to me, and was indeed easily the foremost among his chemical compatriots of which I was aware The fact that he now stands at the head of an abundant national concourse, preponderatingly his own chemical progeny, is largely due to his genius and enthusiasm : it is one of the principal reasons for this pleasant conspiracy among his friends to unite in doing him honour to-day

At the time I now recall, his noteworthy researches in the field of nitrogen chemistry were the material introduction; but a more personal bond was our mutual association with Dr Edward Divers, an eminently delightful character among the major planets in the chemical galaxy of that period

Dr Divers had retired in 1899 from twenty-six years distinguished service to the University of Tokyo and, from this oriental affiliation conjoined with his own skill in the chemistry of inorganic nitrogen derivatives, had assisted Acharyya Ray in arranging some of his earlier contributions to the Chemical Society's Transactions

Outstanding among these in its quality of picturesque surprise was the announcement that ammonium nitrite could be sublimed, and that the preliminary vaporisation occurs without dissociation similarly the benzylammonium and dibenzylammonium nitrites were also produced in the form of sublimate.

Thereafter, until my coming to this country in 1922, meetings with Acharyya Ray were rare but happily since then we have been thrown into close association by a joint interest in the Indian Insitute of Science, Bangalore, which he has faithfully visited three times a year since 1926, when first elected to the Council as a

representative of the Court It has thus become my good fortune to recognise and esteem the sterling merits for which he is justly venerated among his countrymen and to perceive the qualities of mind and character by which he has endeared himself to all those in whom the pursuit of chemistry has been their dominating life-interest

Other admirers with more intimate knowledge of the circumstances will pay well deserved tribute to Acharyya Ray as a practical benefactor whose activities in this region have been fulfilled by an austerity of self-denial that few can imitate Others will dwell on his auspicious achievements in chemical manufacture and in literature

For my part I commemorate him as an ardent investigator an alert-minded spectator of life to whom every branch of mankinds activity presents interesting features a disputant and thinker of sturdy independence and sub-acid humour but above all as a very lovable and sympathetic human personality

M O Forster D Sc, Ph D F R S F I C

Director of Indian Institute of Science (Bengalore)

Acharyya Ray Commemoration Volume 1932

Extract from Diary

April,8,1925

I now discovered that I had many points in common with Carlyle Habit of thrift -- Supreme contempt for fashionable life cant and hypocrisy

P.C Ray

ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর স্থান

হরিহর শেঠ

ব্যবসায়ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর স্থান কোথায় ইহা আর বিতর্কের বিষয় নাই। অন্যান্য ব্যক্তিদের তুলনায় বাঙ্গালী যে এ ক্ষেত্রে অনেক পশ্চাতে আসিয়া পড়িয়াছে এবং নিত্যই অতি দ্রুতবেগে পিছাইয়া যাইতেছে ইহা এক্ষণে সর্ব্ববাদিসম্মত। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন। বাঙ্গালীর যে অর্থে আসক্তি নাই একথা বলা না যাইলেও, ব্যবসায়ই লক্ষ্মীলাভের প্রথম উপায় ইহা বঙ্গবাসীর কাছে অবিদিত না থাকিলেও, বাঙ্গালী দিনের দিন ব্যবসায়ের পথ হইতে সরিয়া আসিতেছে, আসিতে বাধ্য হইতেছে ইহাও বলিতে পারা যায়। তাহার অর্থে আসক্তি থাকিলেও উপার্জ্জনে আসক্তি নাই। ইহার প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা কি আজিও এই দারুণ অন্নসমস্যার দিনে উপলব্ধি হইতেছে না? যদি হইয়া থাকে তবে উপায় কি?

উপায়ের কথা চিন্তা করিতে হইলে প্রথমেই মনে করা আবশ্যক যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী বাঙ্গালী বিদ্যাবুদ্ধিতে ভারতের সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। মনীষিপ্রবর লালা লাজপত রায় যে বাঙ্গালাকে রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের অন্য সকল প্রদেশের অগ্রণী বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন সেই বাঙ্গালার অধিবাসী বাঙ্গালী ব্যবসায়ে এত পশ্চাৎপদ কেন? পাশ্চাত্য জাতিগণ বণিকের বেশে এদেশে যখন প্রথম আগমন করেন, তখন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে বাঙ্গালা অতীব সমৃদ্ধ ছিল। তখন সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের এ দেশীয় ব্যবসায়ী বণিক ও শিল্পীদের সংস্পর্শেই আসিতে হইয়াছিল, সামান্য শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হইয়াই তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাদের স্থান করিয়া লইয়াছেন।

তখনও বাঙ্গালা সত্যই ধনধান্যপুষ্পেভরা সোনার বাংলা ছিল। মহাপ্রতাপশালী মোগল সম্রাটগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই বাঙ্গালাকে সাম্রাজ্যের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান দিয়া গিয়াছেন। আর তারপর আজ দুই শতাব্দী অতিবাহিত না হইতেই এ কি পরিবর্ত্তন

যে বাঙ্গালার পণ্য দেশবিদেশের আদরের বস্তু ছিল, যে বাঙ্গালার সূক্ষ্ম বস্ত্র সমগ্র জগতের বিস্ময়ের সামগ্রী ছিল, সেই বাঙ্গলার সন্তানদের আজ পরণের বস্ত্র নাই আহারের অন্ন নাই। বাঙ্গালী আজিও বর্ণ বিভাগ লইয়া বিব্রত, তাহাদের কর্ম্মবিভাগ আর বড় দেখা যায় না। বাঙ্গালার কামার, কুমোর তন্তুবায়, কংসবণিক প্রভৃতি ক্রমেই তাহাদের স্ব স্ব

বৃত্তি ভুলিতে চলিয়াছে; তাহাদের সে শব্দমুখরিত কর্ম্মশালা এখন নিস্তব্ধপ্রায়। বাঙ্গালীর দেশান্তরে যাইয়া বাণিজ্যের কথা ছাড়িয়া দি, বড় বড় ব্যবসায় সকল অনেকদিন হইতেই প্রায় তাহাদের হস্তান্তরিত হইয়াছে; এখন সামান্য কাজগুলিও ক্রমে অতি দ্রুতভাবে তাহাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

ভারতের দ্বিতীয় নগরী সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র কলিকাতার হাটখোলা, লোহাপটি, বেলেঘাটা প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাজার বা ব্যবসায়ক্ষেত্রগুলি যাহা পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর একচেটিয়া ছিল, আজ সে সকল বাজারের আধিপত্য অবাঙ্গালীর হস্তে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা তখন তাহাদের ব্যাপারি ছিল, যাহাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের আপন আপন মোকামে মালপত্র সরবরাহ করিতে হইত, আজ বহুক্ষেত্রে তাহারাই মহাজন। বাস্তবিক ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহাদের দ্বারেই আজ বাঙ্গালীকে প্রার্থী বা প্রত্যাশীরূপে দেখা যাইতেছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের এমন কি ফেরিওয়ালাদের স্থানও বহুল পরিমাণে ভিন্ন দেশীয়দের দ্বারা ক্রমশঃই অধিকৃত হইয়া যাইতেছে। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এজন্য ঠিক যাহাদের বেশী চিন্তা হওয়া উচিত, যাহাদের মুখের গ্রাস চলিয়া যাইতেছে, তাহারা অন্নের জন্য লালায়িত হইলেও এদিকে একেবারে দৃষ্টি নাই। যত চিন্তা যত মাথাব্যথা দেখা যায় একটীমাত্র সম্প্রদায়ের, যে সম্প্রদায়ের সম্পদ কালিকলম, কার্য্য লেখনীসঞ্চালন দ্বারা উপদেশ দেওয়া। তাঁহারা অন্য কেহ নহেন, বাঙ্গালার লেখকসম্প্রদায়।

বাঙ্গালী অর্থ চায়, সম্পদ চায়, ব্যবসায় বাণিজ্যই অর্থাগমের প্রকৃষ্ট পথ ইহা জানে এবং পরদাসত্বের দ্বারা অর্থসম্পদে সম্পদশালী হওয়া যায় না ইহা বিশেষরূপেই অবগত আছে, তথাপি ব্যবসায়ক্ষেত্রে এত পশ্চাৎপদ, তথা হইতে দূরে থাকিতে চায় কেন? ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর এ বিমুখতা কোথা হইতে আসিল? বাঙ্গালীর এদিকে অবনতির কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, বাঙ্গালী ব্যবসায় করিতে চায় না, ব্যবসায়ের বিষয় শিক্ষা করে না। পূর্ত্ত, রসায়নবিদ্যা, কমার্স প্রভৃতি বিষয় যাঁহারা শিক্ষা করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যবসায় করা নহে, অন্যরূপ। বাঙ্গালীর এহেন মনোবৃত্তির মূলে দেখা যায় তাহাদের পরিশ্রমবিমুখতা ও বিলাসিতা।

বাঙ্গালী এমন আয়েসপ্রিয় ছিল না; এমন বাবু, এমন বিলাসে মগ্ন কোন দিন ছিল এ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোথা হইতে কি সূত্রে তাহাদের স্বভাবের মধ্যে এ পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে বুঝা যায়, তাহাদের এ পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে

সেই দিন যে দিন শিল্পব্যবসায়াদি দ্বারা আয়াসলব্ধ অর্থের পরিবর্তে অন্নসংস্থানের জন্য কেরাণীজীবনের নূতন পথ তাহারা দেখিতে পাইল। উহা বৈদেশিক শাসনের প্রথম যুগ। উহাকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটা যুগসন্ধিকাল বলা যাইতে পারে।

সে সময় শাসকসম্প্রদায় চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের রাজত্ব পরিচালনার সহায়তা ও প্রজাদের রাজভক্ত করিবার জন্য একদল ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী। তাঁহাদের নবলব্ধ রাজ্যরক্ষা ও বিস্তারের সহায়তার জন্য এক সম্প্রদায় ভারতবাসী। তাঁহাদের স্বদেশীয় পণ্য ভারতের বাজারে চালাইয়া বিলাতি বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধির জন্য ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজী হাবভাবের প্রবর্ত্তন। দীর্ঘ পরাধীনতার পর নূতনের মোহে পড়িয়া বাঙ্গালী সে সময় রাজ ইচ্ছায় সানন্দেই সাড়া দিয়াছিল। তাহারা তখন সামান্য পরিশ্রমে মোটা মোটা চাকুরীর লোভে অর্থোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পথ ছাড়িয়া রাজভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইয়াছিল। পরন্তু একদিকে রাজবিধিজনিত দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের বহু বাধা ও শিল্পসাধনার অন্তরায়, অন্য দিকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি উর্ব্বর মস্তিষ্ক বাঙ্গালীর কেরাণীগিরিতে উৎকর্ষতা লাভদ্বারা আত্মপ্রসাদ অনুভব, – এই বিবিধ কারণ সে সময় বাঙ্গালীকে অধিকতর ইংরাজী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। শাসকসম্প্রদায়ের এই শিক্ষাদান ও বাঙ্গালীর মস্তক পাতিয়া তাহা গ্রহণ –ইহাই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পতনের মূল কারণ।

এই শিক্ষার জন্য তখন মিশনারীদের চেষ্টাও যথেষ্ট ছিল। তাহাদের উদ্দেশ্যের মধ্যেও এমন কিছু ছিল না, যাহাতে আমাদের জাতিগত উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন এই শিক্ষার সহায়তায় এদেশে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার। তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাও সে সময় অনেকাংশে সফল হইয়াছিল। সুতরাং বেশ দেখা যাইতেছে যিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তিনি তাহাই পাইয়াছিলেন এবং প্রকারান্তরে তাঁহাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলেও বাঙ্গালী অল্পায়াসে অন্নসংস্থান করিবার যে উপায় খুঁজিতেছিল তাহাতে তাঁহারা আরও অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাহাতে তখন জাতীয় অর্থসমস্যা সমাধানের পথরোধ হইলেও ব্যক্তিগতভাবে কতক লোকের অন্নসংস্থানের পথ সুগম হইয়াছিল একথা স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু আজ আর সেদিন নাই, অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে, আজ বাঙ্গালী অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল। তাহার দৃষ্টিতে সকল পথ রুদ্ধ, সকল দিক তমসাবৃত । তাহার জাতীয় অসচ্ছলতার কথা চিন্তা করা দূরে থাক, নিজের ও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন– দিনগত অভাব পূরণেও আজ অসমর্থ।

দেড় শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন, যে শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতি দেশে

প্রচলিত আছে তাহাতে বাঙ্গালীকে জ্ঞানগরিমা ও সম্মানে অপরের তুলনায় সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা তাহাদের জাতীয় ধনসমৃদ্ধি বৃদ্ধির পক্ষে আদৌ সহায়ক নহে; তাহার দ্বারা দেশের অর্থসমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট পথ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যুবকদের ধনলিপ্সা জাগরূক করিবার পক্ষে মোটেই তাহা উপযোগী নহে। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, এ শিক্ষা সেদিকে সফলতা আনিতে পারে নাই। মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, কেঁইয়া প্রভৃতি জাতি যাহারা ইংরাজী শিক্ষায় এখনও অপেক্ষাকৃত হীন তাহাদের, এমন কি বাঙ্গালার মধ্যেও অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত জাতিদের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের তুলনায় স্বাধীন ব্যবসায়ে কৃতিত্বের কথা চিন্তা করিলে ইহার যথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এক্ষণে ইহাও সকলেই বুঝিয়াছেন দাসত্বের দ্বারা কখন কোন জাতি বড় হইতে পারে না। ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানবিজ্ঞানে আমরা যথার্থ উন্নত হইলেও বর্ত্তমান শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রসার ও কল্যাণের সহায়ক নহে, বরং পরিপন্থী।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অধঃপতনের কারণ তাহাদের মনোবৃত্তি, তাহাদের বিলাসিতা, পরিশ্রমবিমুখতা ও পরমুখাপেক্ষিতা এবং তাহাদের আধুনিক শিক্ষা। স্ব-বৃত্তি হইতে তাহারা অপসারিত হওয়াতেই আজ তাহাদের এই দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল মহাত্মা বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর এই প্রধান সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টিত তাঁহারই জাতির প্রকৃত বন্ধু।

দেশের এই দুর্দ্দিনে যাহাতে বাঙ্গালী যুবকগণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয় সেজন্য যে সকল মনীষী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মহাত্মা প্রফুল্লচন্দ্র প্রধান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সচরাচর বাঙ্গালী যে বয়সে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া শান্তিলাভার্থ বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, প্রফুল্লচন্দ্র সেই বয়সে সর্ব্বত্যাগ করিয়া দেশের বেকার সমস্যা সমাধান দ্বারা জাতীয় কল্যাণের জন্য জীবনপণ করিয়াছেন। পরার্থে এত বড় ত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল। আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নূতন কথা কিছুই নাই, আজ সেই ত্যাগী মহাপুরুষের জন্মোৎসবে শুধু তাঁহারই কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য কিছু আলোচনা করিলাম মাত্র।

Acharyya Ray Commemoration Volume . 1932

Appreciation

D.P.Khaitan

It is matter of intense pleasure to all Indians that their revered Acharyya Sir Prafulla Chandra Ray has, by the grace of God, been gifted with long life and has just completed his seventieth year Ever since(thirty years ago) I have had the good fortune of being his pupil, I have felt the greatest admiration and reverence for Acharyya Ray He has always been an embodiment of simplicity and a friend of the poor students When I was at college we used to feel the greatest affection for him, not only because of his sound learning, original research work, his lucid and humorous way of teaching, and his love for work and students but also for his tattered clothes and charity to the poor He felt so strongly for those who were not blest with riches that whenever he got his salary, he kept only Rs 100 per month for his bare maintenance and distributed the rest among those who were in need

Such an ideal soul could not rest content with Professorial work how noble soever it may be He burnt with zeal to find out how he could relieve the distress of the masses And when Mahatma Gandhi came forward with his programme of Khadi, it could not take Acharyya Ray long, with his clear vision and sympathetic heart, to find out that in cottage and small industries--- of which Khadi is a symbol and an important example--- lay the salvation of the masses and the unemployed middle classes He threw himself with all his weight--- for in his frail body lies a mighty soul--- into the Khadi movement and laid the foundation in Bengal, well and truly. of the desire and action of the uplift of the massess

There is hardly any occasion of distress--- be it famine or flood or earthquake---when Acharyya Ray does not sacrifice himself to administer relief He is the beacon light to whom the young, the enthusiastic, the patriotic look to keep themselves along the correct path He is the servant of the poor He is the prophet of the down-trodden' Through him God manifests Himself in a hundred ways. Glory unto God who in His infinite mercy has created such a noble soul to be the ideal of mankind'

Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

অরবিন্দ দত্ত

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

রসায়ন বিজ্ঞানে উচ্চস্তরের মৌলিক গবেষণায় বিজ্ঞান জগতে যে ইঁহার নাম কতটা সুপ্রতিষ্ঠিত সেকথা বলা অনাবশ্যক। শিক্ষিত সুধীজনমাত্রেই অবগত আছেন। আমি এঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথাই কিছু বলব।

ব্যক্তিগত জীবনের দুই একটি সত্য যখন নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে তখনই সে লোকসমাজে সমাদৃত হয়। কিন্তু এ দেশের লোকে খাঁটি চোখ হারিয়ে যেন কাঁচের চোখ পরেছে। বাইরে থেকে দেখা যায় বেশ জ্বলন্ত—নিজে কিন্তু কিছুই সে দেখতে পায় না। অথচ কাণা চোখে দেখার অত্যাচার পূর্ণমাত্রায় সে করে। যে বরেণ্য নয়—তাকে করে তুলতে চায় চিরস্মরণীয়! যে চিরস্মরণীয় তাকে বলে, —হট্ যাও। এই রকমে বাড়িয়ে কমিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে। ফলে আসল সত্যকে মাটি করে দেয়।

মহাত্মা গান্ধীর আদি ও মধ্যজীবনে অনেকে তাঁকে এই রকমই ঘুরপাক খাইয়ে ছেড়ে দিলে। শুধু মহাত্মাজী নয়—বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষদের অনেকের জীবনকে লোকে এই রকম বিড়ম্বিত করে তুলে বোকামী করে। শক্তিবেগমত্ত পুরুষ নিজের বেগে সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যখন শেষ সীমায় এসে দাঁড়ায় তখন সকল দিককার সকল কলরব থেমে শান্তি আসে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনেও এরূপ অত্যাচার কম হয় নাই।

প্রফুল্লচন্দ্র যখন বিলেত থেকে দেশে ফিরলেন—তখন দেশবাসী বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের লোক অনেকটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। একদল লোক ক্ষেপে উঠল,—যায় যায়—জাতিধর্ম্ম যায়। আচার্য হাসলেন। ধমকের মধ্যে পূর্ণতা নেই—প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। তিনি ধমক দিলেন না। মিষ্টস্বরে ডেকে বললেন—তোমরা ভাল থাকো—আমি তোমাদের ছোঁব না—ভয় কেন?—তিনি দেশ থেকে সরে এলেন। সত্যই কি সরে এলেন? সমাজের কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে ধরা পড়ল না—কতটা তিনি থেকে গেলেন।

দেশ ও সমাজ যাঁর কাছে গভীরতর প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্তরের বিপুল বেদনা তাঁকে গলার হার করতে হয়। সকল ভাবের শ্রেষ্ঠ ভাব যেমন ঈশ্বরের সহিত প্রণয়ীর মধুর ব্যাকুল সম্বন্ধ—দেশের সহিত দেশপ্রেমিকেরও ঠিক সেইরূপ মধুর সম্বন্ধ। কত আঘাত

কত মান অভিমান অপমান আসে যায় এই সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে–তবু সে ভাঙ্গে না। আচার্যদেবেরও দেশের প্রতি সে সম্বন্ধের টান ছিঁড়ল না। তিনি প্রতিবৎসর একবার করে এসে দেশের দুয়ারে হাজির হতে লাগলেন। ঠিক যেন–

"প্যারে দরশন দীজ্যো আয়

তুম বিনা রহে না জায়।

জল বিনা কঁবল চন্দ বিন রজনী।

ঐ সে তুম দেখা বিন সজনী।।

ব্যাকুল ব্যাকুল ফিরু রৈন দিন

বিরহ কলেজা খায়।।

প্রিয় হে, দেখা দাও। তোমা বিনা যে থাকিতে পারি না। জল বিনা কমল, চাঁদ বিনা রজনী, সেইরূপ তোমা বিনা আমি আকুল ব্যাকুল হইয়া দিন রাত ফিরিয়া বেড়াই। বিরহ আমার কলিজা খাইয়া ফেলিল।

ঠিক এইরূপ টানেই দেশের দ্বারে এসে হাজির হতেন। দ্বারে দ্বারে শুনাতেন,–আমি এসেছি- -কেমন আছ দেখতে এসেছি–হাসিমুখখানা দেখতে এসেছি। হাসিমুখ বড় দেখতে পেতেন না–হাসিমুখ করিয়ে দিয়ে যাওয়াই আসার উদ্দেশ্য হত। ফলে দীন দুঃখী, কন্যাদায়গ্রস্ত অন্ধ আতুর–আর রাস্তা ঘাট, স্কুল পাঠশালা, টোল মক্তবে ঘুরে ঘুরে খোঁজ খবর নেওয়া তাঁর কর্ম্মপন্থার একটা অবজ্জনীয় অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে সকল কাজ ত্যাগ করে' দেশে এসে দেশবাসীর সুখ দুঃখের রঙে রঙিয়ে যাওয়া চাই।

মৈ বিরহিন বৈঠি জাগু

জগত সব সৌবে রে আলী।

সখিরে আমি বিরহিনী–বসিয়া বসিয়া জাগিতেছি; আর জগতের সকলেই ঘুমাইতেছে। সে তারিখটি এমনই সুনির্দ্দিষ্ট–যাত্রাটি এমন আবেগাকুল যেন এই জ্যৈষ্ঠমাসের অপেক্ষায় গত এগারটি মাস তাঁর চোখে ঘুম ছিল না।

স্বভাবটি আবার যেমন সুস্থ সবল মানুষের স্বভাব– তেমনি বালকেরও। আশ্বিনমাসের শিশুরা যেমন মা আনন্দময়ীর অপেক্ষায় বসে থাকে। দেশের শিশু ও যুবকেরাও তেমনি জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতীক্ষায় দিন গণে। এই একটি মাস তাদের সঙ্গে শিশু মন লয়ে খেলা করে চলে যান। ছেলেদের সঙ্গে জাম খেতে গিয়ে নিজেই নীচের ডালে চড়ে বসেন। তারা বলে,–"আপনি

কেন গাছে চড়লেন?" তিনি হেসে বললেন, "আমি বোকা নইরে। থোবার রসাল জামটা তোরা কখনই আমাকে দিবিনে— গালে পুরবি।"

খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে কপোতাক্ষী নদীর তীরে ইঁহার পৈত্রিক বাসভবন। গৃহের সন্নিকটেই নদী। অনেক জেলের বাসও এই নদীর ধারে। প্রতিদিন বিকালে এই সময় ছেলেদের লয়ে বাইচ খেলার প্রতিযোগিতা হয়। তা' ছাড়া কুস্তী খেলা-পাঠশালার ছেলেদের মিষ্টান্ন বিতরণ প্রভৃতি নানারূপ আনন্দ দিয়ে তাদের মাতিয়ে রেখে আসেন।

ইনি শুধু নীরস শুষ্ক বিজ্ঞানাচার্য্য নহেন। রসজ্ঞও বটেন। সঙ্গীতে ইহার প্রবল অনুরাগ দেখা যায়। সুগায়ক শ্রীমান্ অনাথনাথ বসুর বাড়ীও এই কপোতাক্ষী তীরে নদীর অপর পারে। সে সময় ইনি দেশে থাকলে সর্ব্বদা তাঁকে নিজের কাছে এনে রাখেন। বিকালে কপোতাক্ষীর কালো জলে উপর দিয়ে এঁদের নৌকা নেচে যায়। শ্রীমান্ অনাথ যন্ত্রসহযোগে গান করেন। সে সুর বাতাসে ধ্বনিত হয়ে দুই তীরের গ্রামবাসীর কর্ণে মধু ঢালে ও আচার্য্যদেবের শুভাগমন ঘোষণা করে।

একদিন সকালে আচার্য নিজের হাতে কোদাল ধরে জমী কোপাচ্ছিলেন। কিছু দূরে একটি বালক বার খেলছিল। সে খেলা ছেড়ে এসে বললে, "আপনি কোপাচ্ছেন?" আচার্য হেসে বললেন "তুই কি করছিলি?" "বার খেলছিলাম।" "তবে তুই আমার বন্ধু। আমিও শরীর চর্চ্চা করছি। কিন্তু তুই ঠকে গেলি।" "কেন?" "আমার একসঙ্গে দুটো কাজ হল—তোর একটা।" "কি রকম?"

আচার্য হেসে বললেন, "শরীর-চর্চ্চাও হল-জমিটারও চাষ হল। এখন এতে পেঁপে, শশা, তরমুজ, ফুটি এই সকল লাগাব। জমি কুপিয়ে বাড়ী যেয়ে সেই সকল ফল কেটে কেটে খাব—কারও মুখ তাকাব না—আর তুই বার খেলে বাড়ী যেয়ে বলবি,— মা ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও।"

আজকাল স্বদেশীর হুজুগে দেশের জন্য গলাবাজী করে অনেকে—রঙ ধরে না। নিজের জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়ে অপরের জীবন উদ্ঘাটিত করা সহজ হয়।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই।"

নিমাই— এর হরিনাম বিলানর মত তিনখানা হাড় লয়ে ভেল্‌কি খেলে দেশে দেশে এমনটি আর ক'জনা বিলিয়ে বেড়াতে পেরেছেন? 'চরকা-বায়ুগ্রস্ত' এ খেতাব বাবা মহাত্মাজী ছাড়া আর ক'জন অর্জ্জন করতে পেরেছেন?

"তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।"

পথে ঘাটে পার্কে ময়দানে এই সঙ্গীত শুনি। কিন্তু তাঁতির ঘরে কামারের কর্ম্মশালায় এঁকেই যেতে দেখি।

সূতা জাঁতা ধরে পাঠশালার গুরুমশায়ের মত হাতে ধরে 'ক' 'খ' শেখাতে এঁকেই দেখি।

নদনদী ত আজকাল মাতাল— কাকেও বড় একটা আমলের মধ্যে আনে না। বছর বছর বাণ ডেকে কত শত শত লোককে উদরের মধ্যে পুরলে –ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই জীর্ণ শীর্ণ অস্ত দিগন্তের দিকে হেলে-পড়া সত্তর বছরের বৃদ্ধ-যুবকটিকে দেখলেই ভয়ে তারা আঁতকে ওঠে। তালপাতার সেপাইটিকে তারা ডরায়।

দেশের ছেলেরা সিদ্ধির নেশায় আলস্য ও তন্দ্রার ঘোরে সময়ের অপব্যয় করছিল–তাদের শক্তি, শৌর্য্য ও কৌশলের খবর হয়ত অনেকে দিয়েছেন। কিন্তু–

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর দাস-খতে সমুদয় দিলে।"

দৈববাণীর মত এ বাণী তাঁর মুখে যেমন ছেলেরা শুনলে, আর কার মুখে এমনটি শুনেছে? লোভ বিসর্জ্জন দিয়ে বীণাপাণির পাদমূলে তাদের কল্যাণে অর্ঘ্য ঢেলে দিতে পেরেছিলেন বলেই না এই লাভ আজ তাঁর হল।

আচার্য্যদেব কোন দলে ভিড়েন নি। নিজের বিবেক বুদ্ধিকে সহায় করে দেশের মুক্তির পথ পরিষ্কার করতে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। কিন্তু এঁর সমস্ত চরিত্রটা বিশ্লেষণ করলে ইনি কতটা যে মহাত্মাজীর অনুরাগী ও অনুগামী– তা বেশ বোঝা যায়।

'ইঙ্গিত' (যশোহর) পত্রিকা, শ্রাবণ সংখ্যা ১৩৩৯

Dr. Sir P. C. Ray -- The Real Man

By Rai Bahadur Hiralal (Katni)

Somebody has pointed out that it is the trifling acts of a person which exhibit his real character, and I fully realized the truth of this assertion in the case of Sir P C Ray, whom I had the good fortune to meet though only casually on three occasions, the first two of which were quite accidental But every time I found something in his behaviour which spoke volumes of his goodness and purity of heart

On the first occasion he unwittingly demonstrated *udara charitanantu vasudhaiva kutumbakam* on the second his simplicity of living, and on the third his mature experience and profound love of his pupils Indeed on every occasion his love for his pupils was a predominating feature

It was in the year 1921 that I happened to come in contact with him for the first time, quite accidentally I went to Calcutta for attending the 8th session of the Indian Science Congress, whose Reception Committee was headed by the late Sir Asutosh Mookerjee as President and Dr Suhrawardy as Secretary On arrival the delegates from the Bombay side, including myself, were somewhat surprised to find nobody present at the railway station to guide us to the lodgings fixed for us at the Science College, of which we had been previously informed As nobody on the spot could tell us where this College was situated, we drove straight to the University Buildings, where we got the necessary information to reach the destination

On entering this building we encountered a gentleman, whom we requested to tell us the rooms we were expected to occupy This gentleman was no other than Dr P C. Ray and he questioned us whether we had not been informed of the changes subsequently made shifting the lodgings to the Law College Buildings On receiving a reply in the negative he remarked, "This is the business

of big men and hence all this confusion. That is why I did not go to big men who invited me to stay with them at Bombay when I returned from England I went to my pupils and was very comfortably lodged with them." Meantime one of his pupils the head of an important institution in Calcutta, arrived and asked for my name, which he at once associated with Nagpur, where, he said, he had no such wandering about as we had had, when he visited that place the previous year for the same purpose for which we came to Calcutta He spoke of the reception arrangements at the Nagpur railway station very approvingly and felt a bit hurt at the idea of our possibly carrying away an unfavourable impression of the Calcutta arrangements Dr Ray at once gave us a peon to take us to the Law College Buildings, but his pupil would not be satisfied with that He took us into his motor car and conducted us personally to that place

We were mere strangers, but the anxiety of the saint-like Acharyya of Calcutta to put us in comfort made a deep impression on our minds The incident exhibited also the great regard he had for his pupils, who reciprocated it with great respect

The second time I met him was on a railway train when he was travelling to Bombay I entered his compartment at Gondia about mid-day and travelled along with him up to Nagpur It was meal-time and the Knight intimated to me that his kitchen was on the train with a cook to supervise its affairs Without moving from his seat he then pointed to a stove, which formed his whole kitchen, introducing at the same time the Superintendent of the Chemical Works as his cook, an honour which his chemist pupil seemed to be proud of This exalted cook took no time to prepare the full menu for his master, which consisted of a very small quantity of rice, supplemented later on with a single plantain fruit.

I wondered whether that was some sort of chemical food, capable of maintaining a person on so small a quantity. After showing me this magic he related how he washed his own clothes and managed to do it even at Sir Bipin Krishna Bose's, where he was surrounded

by servants, who would not give him an opportunity to have his own way I asked him whether he had informed Sir Bipin about his journey to Bombay. he replied that he did not do it as he was afraid he might be asked to do justice to food bond to be brought for him, knowing that he would not be able to take it on account of its richness On this occasion I had before me an example of plain living and high thinking.

The third time we met at Nagpur in a meeting recently called for determining how the bequest of 35 lakhs made by a philanthropist of my province may best be utilized. There he expounded the practical view, which his mature experience dictated, as against theoretical suggestions made mostly by his own pupils, one of whom, the most eminent, who had been honoured by his admission to the Fellowship of the Royal Society, received a wrap on his venturing to interrupt him while he was speaking---a wrap which elicited a rapturous smile from the recepient, as it did from the rest of the Committee It showed the profound respect, which not only his pupils but others outside that circle held him in

For a person so benevolent, so kind so learned, so unselfish, so devoted to duty, so universally loved and so profoundly respected I fail to find a suitable epithet but that of MAN May he live long to furnish a model of humanity to the coming generations

Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932

একটি স্বদেশী কারখানা

('প্রবাসী'র প্রতিবেদন)

সে আজ বিশ বৎসরের কথা। কলিকাতার ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডে একটি একতলা বাড়ীর এক কোণে একটি ক্ষুদ্র ঘরে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আবাস। বাড়ীর সামনে ও পিছনে খোলা জমি। ইতস্ততঃ খোলা, ভাঁড়, হাঁড়ি, কলসী, কাঠের পিপা বিক্ষিপ্ত। কোথাও গন্ধক দ্রাবক (sulphuric acid) ও লোহার ছাট (scrap iron) সংযোগে হীরাকষ প্রস্তুত হইতেছে, কোথাও লেবুর রস হইতে সিট্রিক অম্ল (citric acid) বানাইবার চেষ্টা হইতেছে, কোথাও সোরা ও গন্ধক দ্রাবক যোগে তেজআব (nitric acid) চোলাই (distillation) হইতেছে। আবার ছাদের উপর মাংস বিক্রেতার দোকান হইতে সংগৃহীত কাঁচা হাড় শুকাইতেছে,– পাড়ার লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া আপত্তি করিতেছে এবং মিউনিসিপালিটিতে দরখাস্ত দিবার উপক্রম করিতেছে। এই হাড় ভস্মীভূত হইয়া তাহার উপাদান হইতে ফসফোরস (Phosphorus) ঘটিত ঔষধ প্রস্তুত হইবার উপায় উদভাবিত হইতেছে। এই প্রকার নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে। যে কারখানার বৃত্তান্ত আমরা প্রকাশ করিতেছি, ভগবানের বিধান অনুসারে ঐ প্রকারে তাহার সূচনা হইতেছে।

অনেক যুবকই বলিয়া থাকেন মূলধন নাই বলিয়া আমাদের দেশে ব্যবসা ও কারবার চলে না। কিন্তু ইহা সর্ব্বাংশে সত্য নয়, আসল কথাও ইহা নয়। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে "নাছোড়বান্দা" হইয়া লাগা চাই, এবং লাগিয়া সামান্য আরম্ভ হইতে শিক্ষানবিশী করা চাই। একেবারে মস্ত একটা কিছু করিয়া বসিব, ভাবিলেই, কার্য্যহানি হয়। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে ও পরে অনেকগুলি যৌথ কারবার খোলা হয়। তাহার মধ্যে কয়েকটি মৃত, কোনটি বা মুমূর্ষু: কত উঠিল, কত ডুবিল, ইহার কারণ কি?

মাড়োয়ারীরা লোটা ও রসসী সম্বল লইয়া রাজপুতানার মরুভূমি হইতে আসিয়া বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য প্রায় এক চেটিয়া করিল কি প্রকারে? বাঙ্গালী কেবল কেরানীগিরিতে পটুতা এবং ওকালতী বুদ্ধি লাভ করিতে শিখিয়াছে।

ডাক্তার রায় যখন "বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসের" সূত্রপাত করিতেছিলেন, তখন তাঁহার আয় ছিল, আয়কর ৬।।৵ বাদে, মাসিক ২৪৩।।৵। তখন পৈত্রিক ঋণও ছিল, এবং তাঁহার দানের পরিমাণটা বরাবরই খুব বেশী। এই বেতনে তিনি ৭/৮ বৎসর চাকরী করিয়াছেন। অথচ তাঁহার দ্বারা এত বড় একটা কারবারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

কারখানার এই প্রারম্ভাবস্থায় আর একজন উদ্যমশীল, অসাধারণ অধ্যবসায়ী ও স্বার্থত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি বিখ্যাত ডাক্তার স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বসু। ইনি ডাক্তার রায়ের বাল্যসুহৃদ। উভয়ের সহযোগ মণিকাঞ্চন যোগের মত হইল। অমূল্য বাবু আসিয়া না জুটিলে কারখানাকে লাভের ব্যাপার করা আরও সময়সাপেক্ষ এবং কঠিনতর হইত। প্রথম অবস্থায় ইঁহারা ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের দিকে তাকান নাই; স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া, কাজটিকে কেমন করিয়া সফল করা যায়, একমাত্র তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। অমূল্য বাবুর ভগিনীপতি স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সিংহও রসায়নে এম্ এ পাশ করিয়াই এই কাজে যোগ দেন। পরিতাপের বিষয় এই যে অল্পকাল পরেই এই উৎসাহী পুরুষের, ভ্রমক্রমে স্বহস্তে প্রুসিক এসিড বিষপ্রয়োগে, প্রাণ বিয়োগ হয়। শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, প্রভৃতি আরো অনেকে এই কারখানার জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নাম করা সুসাধ্য নয়।

ব্যবসা দ্বারা শুধু জীবিকার্জ্জন নয়, সম্মান ও শক্তি লাভ করিতে পারি, এই কথাটি স্বদেশী আন্দোলনের দিনে সহজ ও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উৎসাহের প্রথম আবেগে একে একে অনেকগুলি কারবার জন্মলাভ করে। কাপড়, মোজা, গেঞ্জি, সাবান, চিনি, চামড়া, কলম, পেনসিল, দেশলাই, ইত্যাদি কত রকমের কারখানার অনুষ্ঠান হইয়াছে। আজ সাময়িক উত্তেজনার অবসাদ কালে দেখিতে পাইতেছি যে কারবার আরম্ভ করা যত সহজ, স্থায়ী ও লাভবান করা তত সহজ নহে। অনেক সদ্যোজাত কারবারের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। আজকাল বাঙ্গালীর যৌথ কারবারের মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল ভরসার ও গৌরবের স্থল। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে অতি ক্ষুদ্র আয়তনে ইহার সূচনা হয়। পরলোকগত ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সন্তানোপম যত্নে এই কারবারটিকে বর্দ্ধিত করিতে থাকেন। পরীক্ষা কাল উত্তীর্ণ হইলে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে কারবারটি দাঁড়াইয়াছে তখন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইঁহারা কারবারটিকে লিমিটেড করিয়া লয়েন। কিন্তু এই অবস্থায় আসিতে অনুষ্ঠাতৃগণকে যথেষ্ট বাধা ও বিপদ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এলোপ্যাথি চিকিৎসায় দেশীয় ঔষধের উপর এখন লোকের যে আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বেঙ্গল কেমিক্যালের দরুনই হইয়াছে। এই কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় দেশীয় ঔষধ কোন ডাক্তারই বিশ্বাস করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। যদিও এই প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করা তৎকালে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, — তথাপি শুধু এই লইয়া থাকিলে কারবার চালান যায় না বলিয়া এই কারখানা পেটেন্ট ধরনের বিলাতী ঔষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এটকিনের টনিক, প্যারিসের কেমিক্যাল ফুড ইত্যাদির তৎকালে কাটতি ছিল। এই সকল বাধা ধরনের ঔষধ বিক্রয় করিয়া ইঁহারা দেশীয় ঔষধ প্রস্তুত করিবার ও কিছু দিন জীবিত থাকিবার উপযুক্ত সম্পদ সংগ্রহ করিতেন। "যমানি ভুলসার" আজকাল অনেক স্থানেই

প্রস্তুত হইতেছে। বেঙ্গল কেমিক্যালে এই ঔষধ প্রথম প্রস্তুত হয় এবং ইঁহারাই যমানি জলের উপকারিতা সাধারণ্যে প্রচারিত করেন। কোম্পানীর তৎকালীন হিসাব পত্রে পাঁচ আনার যোয়ান কিনিবার রসিদ পাওয়া যায়: আজ ইঁহারা এককালে সহস্রাধিক টাকার যোয়ান কিনিতেছেন।

২৫০০্ টাকা মূলধন লইয়া লিমিটেড কোম্পানী হইবার পরেও ৩/৪ বৎসর কাল ৯১ নং আপার সারকুলার রোডে ইঁহাদের অফিস ও কারখানা উভয়ই ছিল। কারবার প্রসারিত হইলে সারকুলার রোডের বাড়ীতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া কুলান কঠিন হইয়া পড়ে। তখন ইঁহারা ৯০ নং মাণিকতলা মেন রোডে কারখানা স্থাপিত করেন। এই সময়ে ইঁহাদের মনে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত দ্বারা লাভবান হইবার ইচ্ছা হয়। অদম্য সাহস ও বিচক্ষণ ব্যবসায় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া ইঁহারা গন্ধক দ্রাবক প্রস্তুত আরম্ভ করেন। ইঁহাদের দ্রাবক বাহির হইয়াছে বলিয়া বাজারে দ্রাবকের মূল্য শতকরা ২৫্ হইতে ৩০্ টাকা সুলভ হইয়াছে। আজকার আপার সারকুলার রোডে কেবল আফিস আছে। সর্ব্বপ্রকার প্রস্তুত কার্য্য মাণিকতলার কারখানায় হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার এই কারখানা দেখিয়াছিলাম। আবার গত ১২ই চৈত্র তারিখে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহাদের মাণিকতলার কারখানা দেখিতে গিয়া আনন্দিত হইয়াছি। ডাক্তার রায় এবং কারখানার সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় বিশেষ যত্ন করিয়া সমুদয় ব্যাপার বুঝাইয়া দেন। বিস্তৃত জমির উপর কলঘর, ফার্ম্মেসী, এসিড ঘর, ছুতোরের ঘর, ল্যাবোরেটরী, প্যাকিং ঘর, ঢালাই ঘর, গুদাম, কর্ম্মচারিগণের মেস্ সুশৃঙ্খল ভাবে চত্বরাকারে সাজান। নানা প্রকার শব্দে মুখরিত এই কারখানাটি জীবন্ত চিত্রের ন্যায় মনে হয়। ইঁহাদের সকল কার্য্য এবং ব্যবস্থার ভিতরে একটা প্রাণ আছে, একটা সামঞ্জস্য আছে। ইঁহারা ঠেকিয়া শিখিয়াছেন যে কার্য্য পরিচালনার জন্য যথাসম্ভব নিজেদের কারখানার উপর নির্ভর না করিলে অসুবিধায় পড়িতে হয়। সেই জন্য এই একটি কারখানায় দশ রকমের ব্যবসায় সংঘ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রথমেই দেখি ছাপাখানা। ঔষধের কারবার আছে, আচ্ছা বেশ: কিন্তু তার ভিতর আবার ছাপাখানা কেন? ইঁহাদের করাত কল, ঢালাইখানা সম্বন্ধে ও এই প্রশ্ন করা চলে। কিন্তু একবার ঘুরিয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের সহজ উত্তর পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায় যে কারখানার সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতার জন্য এই সব আবশ্যক। আমরা দেখিলাম যে দুইটি বড় মেশিন প্রেস ও দুইটি ছোট প্রেসে কেবল নিজেদের বিজ্ঞাপন, লেবেল, ক্যাটালগ ছাপা হইতেছে। প্রিন্টার, কম্পোজিটার, মেশিনম্যান লইয়া এই ছাপাখানাকেই একটি স্বতন্ত্র কারবার মনে হয়। এত কাজ যদি বাহিরে করিতে হইত তবে ব্যয় ত বহুল পরিমাণে অতিরিক্ত হইতই, অসুবিধারও অন্ত থাকিত না। একই প্রকার ছাপার কার্য্য বার বার করিতে হয় বলিয়া

ইঁহাদের ষ্টিরিওটাইপ করিবার বেশ বন্দোবস্ত আছে। ইঁহারা নিজেরাই উড্ ব্লক, ইলেকট্রো প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

ওয়ার্কশপে গিয়া দেখি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে, জানিলাম প্রথমে গুটিকতক মাত্র কল বসাইয়া অল্প স্বল্প বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও বেশীর ভাগ ইঁহাদের ফার্ম্মেসীর ফিটিং এর কাজ করিতে হইত। নিজেদের কল ও ইমারতের কার্য্য এই ওয়ার্কশপটি থাকার দরুন সহজে ও অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইয়াছে।

নিজেরা না করিয়া বাড়ী তৈরী প্রভৃতি কোনও কোনও কাজ হয়ত বাহিরের কন্ট্রাক্টর দ্বারা করাইলে তুল্য ব্যয়ে সম্পন্ন হইত অথচ নিজেদের ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু অপরের নিকট যাহা ঝঞ্ঝাট ইঁহারা তাহাই অভিজ্ঞতা মূল্য স্বরূপে গ্রহণ করেন। নক্সা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত এত রকমের, এত বিভিন্ন কার্য্যোপযোগী কল বসাইয়া ও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ইঁহাদের পাকা শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আজ ইঁহারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ল্যাবোরেটরী ফিটার্স বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ল্যাবোরেটরীতে ব্যবহার্য্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ওয়ার্কশপে প্রস্তুত হইতেছে। তদ্ব্যতীত কলেজ সমূহের ল্যাবোরেটরীর পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার আবশ্যকীয় কাজ করিতে ইঁহারা পারদর্শী হইয়াছেন। কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল হইতে বিশেষ উপায়ে গ্যাস প্রস্তুতের ব্যবস্থা ইঁহারা অনেক স্থানে করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, গৌহাটী, কটক, বাঁকীপুর, মান্দ্রাজ, লাহোর, যেখানে ল্যাবোরেটরী প্রস্তুত হইতেছে, সেইখানেই ইঁহারা আহূত হইয়া প্রশংসার সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। ল্যাবোরেটরী প্রস্তুত করিতে হইলে খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ ও ইঁহাদের পরামর্শ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বেশ বড় রকমের একটি ওয়ার্কশপ আছে বলিয়াই এই সকল কাজ সুচারু রূপে করিতে পারিতেছেন। ওয়ার্কশপে অনেক লোক একত্র কাজ করিতেছে। এতগুলি লোকের প্রাত্যহিক কাজের হিসাব রাখা একটা গোলমেলে ব্যাপার। ইঁহারা এমন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহাতে কাজের সঙ্গে সঙ্গে হিসাব হইতে থাকে। যখনই কোনও কাজ আরম্ভ হয় তখনই ক্রমিক সংখ্যা ও কাজের নাম দিয়া একটি খাম রাখা হয় সকালে আসিয়া ফোরম্যান কাজ বিলাইয়া দেয়, সন্ধ্যাবেলায় কারিগরেরা নিজেদের কাজ তাহাদের নামে উঠাইয়া দেয়। ছোট ছোট ছাপান ফরমে তাহাদের কাজ লেখা হয় এবং অর্ডারের নাম ও ক্রমিক নম্বর যাহাতে ফেলা হয়। এ ফরমে কারিগরের মজুরী ও ঘন্টা হিসাব করিয়া ফেলা হয়। তারপর এই ফরমগুলি যে যে কাজের জন্য সেই সেই খামের ভিতর রাখা হয়। গুদাম হইতে মাল বাহির করিবার জন্য "ম" চিহ্নিত নির্দ্দিষ্ট ফরম আছে তাহাতে যে কাজের জন্য মাল লওয়া হইতেছে সেই কাজের নাম ও নম্বর দেওয়া থাকে। সমস্ত দিনে যত মাল বাহির হয় তাহা নিজের খাতায় উঠাইয়া ও চেক্ করিয়া জিনিষের মূল্য

ফেলিয়া গুদামসরকার এই ফরমগুলি ওয়ার্কশপে ফেরৎ দেয়। যে যে কাজের জন্য জিনিষ বাহির হইল, পুনরায় সেই সেই খামের ভিতর এই ফরমগুলি রাখা হয়। কোনও কাজ যেমন অগ্রসর হইতে থাকে তাহার খামের ভিতর মজুরী ও জিনিষের মূল্য হিসাবী ফরমও তেমনি ভর্ত্তি হইতে থাকে। খামের পৃষ্ঠে অভ্যন্তরস্থ ফরমের মূল্যের অঙ্কগুলি তোলা হয়। কাজ শেষ হইলে মজুরী ও জিনিষের মূল্যে একুনে যে টাকা হয় তাহার উপর শপ চালাইবার ব্যয় শতকরা হিসাবে ফেলিয়া মোট খরচা বাহির করা হয়।

ওয়ার্কশপে দেখিলাম সুন্দর সুন্দর পাখা প্রস্তুত হইতেছে। নীচে কেরোসিনের বাতি জ্বালাইয়া দিলেই পাখা ঘুরিতে থাকে অনেক ছোট বড় যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে যাহার নির্ম্মাণ কৌশল ও সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

এসিড ঘরে দুইটি সীসার চেম্বার আছে। চেম্বারগুলি আগাগোড়া সীসার তৈরী। সীসা ঝালিবার জন্য হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করিতে হয়। দক্ষ লেড্‌ম্যান ব্যতীত এই কাজ অপরের দ্বারা হইবার নহে। ইঁহারা হাতে ধরিয়া লেডম্যান তৈরী করিয়া লইয়াছেন। এমন নিপুণতার সহিত চেম্বার তৈরী যে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে বিলাত হইতে দক্ষ কারিগর আনিয়া করিলেও ইহা অপেক্ষা সুন্দর হইত না। চেম্বারের কাজ দিবারাত্র সমান চলে এবং প্রত্যহ ৪ হাজার পাউন্ড এসিড্ প্রস্তুত হয়। গিল্টির কাজে সোডাওয়াটারের কলে প্রচুর এসিড্ বিক্রয় হয়। গভর্ণমেন্টের টাঁকশাল, টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ, গোলাবারুদের কারখানা প্রভৃতিতে ইঁহাদের অ্যাসিড সরবরাহ হয়। এ দেশে সহযোগী রাসায়নিক দ্রব্যের কারবার না থাকায় এসিডের কাটতি অনেকটা সীমাবদ্ধ। ফট্‌কিরি সোডা, ব্লীচিং পাউডার, গ্যালভানাইজিং প্রভৃতি কারখানায় এত এসিড্ লাগে যে ইহাদের এক একটি কারখানার জন্য একটি করিয়া এসিডের ব্যবসা চলিতে পারে। নানা কারণে এদেশে ঐ সব কারবার হইতে পারে নাই— শীঘ্র যে হইবে এমন আশাও নাই। অপরিমিত রেলভাড়াই ফটকিরী সোডা প্রভৃতি কারবার চালাইবার প্রধান অন্তরায়। মধ্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় মাল আনাইতে যে ভাড়া পড়ে বিলাত হইতে আনিতে হইলে তদপেক্ষা কমে হয়। ইউরোপে সর্ব্বত্র পাইরাইট হইতে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত হয়। গন্ধক হইতে এসিড প্রস্তুত এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। পাইরাইটের মূল্য অনেক কম কিন্তু এদেশে এপর্য্যন্ত ভাল পাইরাইট পাওয়া যায় নাই। স্পেন হইতে পাইরাইট্ আনিতে পারিলে সুবিধা হইত কিন্তু ষ্টীমার ভাড়া দিয়া আর বিশেষ লাভ থাকে না। আমরা জানিতে পারিলাম যে বোম্বেতে এখনো বিলাত হইতে সালফিউরিক এসিড আমদানী হয়। রেল ভাড়ার আধিক্য হেতু কলিকাতা হইতে বোম্বেতে এসিড পাঠান অসম্ভব। বোম্বে গিয়া ইঁহারা একটি এসিডের কারখানা খুলিলে হয়ত সুবিধা হইত।

ফার্ম্মেসীতে প্রবেশ করিলেই পাইপের অরণ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষ্টীম পাইপ, হাওয়ার

পাইপ, নিষ্কাশিত হাওয়ার পাইপ, অপরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ জলের পাইপ ইত্যাদি। যন্ত্রাদিরও অন্ত নাই। পারকোলেটার, একষ্ট্রাকটার, ইভাপোরেটার, টিংচার প্রেস, ফিলটার প্রেস, রকমারী ষ্টীল ইত্যাদি, সবগুলির নাম মনে রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা। আমাদেরি বাসক, গুড়চী, কূটজ, নিম, এইসকল লোকের ভিতর দিয়া বিভিন্ন বর্ণ গন্ধ গুণ ও নাম লইয়া বাহির হইতেছে। এই করিয়াই বেঙ্গল কেমিক্যাল ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের এমন একদিন ছিল যখন আরব, পারস্য, তিব্বত, চীন ও সিংহল হইতে চিকিৎসাব্যবসায়িগণ শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে সমাগত হইতেন। ডাইয়স কর্ডেস দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস হইতে এদেশে আসিয়া আমাদের চিকিৎসাশস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। চরক ও সুশ্রুত কোন সুদূর অতীত কালের অমরত্বে মন্ডিত তাহা স্থির নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। তবে তাহা যে ২৫০০ বৎসরের পূর্ব্বের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চরক সুশ্রুতের পরেই বাগ্‌ভটের "অষ্টাঙ্গহৃদয়"; তাহাও একুশশত বৎসরের পুরাণো। বোগ্দাদের খালিফার রাজসভায় হিন্দু কবিরাজগণ রাজবৈদ্য ছিলেন; সেও আজ হাজার বছরের কথা। এই সময় হইতে কয়েক শত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। এই সময়েই ধাতুঘটিত ঔষধ, ক্ষারাদি, পারদঘটিত ঔষধাদি কবিরাজী শাস্ত্রে স্থান পায়। যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা কবিরাজী শাস্ত্রকে আদরণীয় করিয়াছিল পরবর্ত্তী কালে তাহা লোপ পাইতে থাকে। কবিরাজগণ বংশানুক্রমে প্রচলিত ধরণে চিকিৎসা করায় কবিরাজী চিকিৎসা আজকালকার অবস্থায় আসিয়া পঁহুছিয়াছে। গত শতাব্দীতেও কবিরাজী চিকিৎসা এতদপেক্ষা উন্নত ছিল। ডাক্তারী চিকিৎসা প্রচলিত হওয়ায় দেশীয় ঔষধের লুপ্তপ্রায় গৌরবটুকুও বুঝি বা অন্তর্হিত হয়। ডাক্তার কানাইলাল দে, উদয় দত্ত, এবং এইন্‌লি (Ainslie), ওয়ারিং (Waring), ওয়াইজ (Wise), প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত তাঁহাদের জীবিত কালে দেশীয় ঔষধের গুণাবলী পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসন্ধান ফলে অনেক স্থলেই দেশীয় ভেষজাদির আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত না হওয়ার দরুণ ঔষধ সাধারণ্যে তেমন করিয়া প্রচলিত হইতে পারে নাই। বেঙ্গল কেমিক্যাল এই কার্য্য গ্রহণ করিয়া দেশের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আজকাল ইঁহাদের ঔষধ প্রস্তুত-বিভাগে দেশীয় ঔষধই বেশী প্রস্তুত হইতেছে। বিলাতী স্পিরিট বা সুরাসার কিনিয়া টীংচার ইত্যাদি কিছুকাল ইঁহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গত দুই বৎসর হইল আবগারী বিভাগের এক নূতন আইন হইয়াছে তাহাতে বিলাতী স্পিরিটের উপর এত শুল্ক বসিয়াছে যে ফলে বিলাতী স্পিরিট অপেক্ষা বিলাতে প্রস্তুত টীংচার ইত্যাদির মূল্য কম দাঁড়াইয়াছে। দেশে যে স্পিরিট হয় তাহার শুল্ক বাড়ে নাই কিন্তু

তাহা এত দুর্গন্ধ যে টীংচারে ব্যবহৃত হইতে পারে না। স্পিরিটের এই অসুবিধা হওয়াতে ফার্মাকোপিয়ার টীংচার ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার আশা ইঁহারা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দেশীয় স্পিরিটের উপর শুল্ক কম আছে বলিয়া ইঁহারা সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে চোলাই কারখানা খুলিয়া স্পিরিট প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে শুধু ঔষধের উপযোগী বিশুদ্ধ স্পিরিট নয়, মিথিলেটেড স্পিরিটও প্রস্তুত করিবেন। প্রস্তাবটি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে দুই লক্ষ টাকা মূলধন বাড়াইয়া লইয়াছেন। এক্ষণে মূলধন পাঁচলক্ষ টাকা হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ইঁহারা তিন লক্ষ টাকার উপর শতকরা ৬।।০ হিসাবে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ দিতেছেন।

আজকাল প্রতিবৎসর বহু লক্ষ টাকার মহুয়া বিদেশে যায়। জর্মনীতে গোরু, ভেড়া, শূকরের খাদ্য বলিয়া মহুয়া এত রপ্তানী হয়। ইঁহারা স্পিরিটের ব্যবসা খুলিলে প্রতিবৎসর ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকার মহুয়া কিনিবেন। ভারতে স্পিরিটের বাজার কাহার হইবে এ লইয়া আজকাল জর্মনীতে ও জাভাতে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দিনেমারেরা স্পিরিটের দর খুব কমাইয়া দিয়াছে। ইঁহারা সাহস করেন যে জাভা স্পিরিট অপেক্ষা কম মূল্যে স্পিরিট বিক্রয় করিয়াও ইঁহারা লাভ করিবেন। ইঁহারা যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহাই লাভজনক করিয়াছেন। স্পিরিটের ব্যবসাও যে সফল হইবে তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। সুলভ স্পিরিটের কারবার এদেশে এ পর্যান্ত হয় নাই। ইঁহারা করিলে একটা নূতন জিনিষ হইবে।

সুগন্ধ প্রস্তুত বিভাগে ইঁহারা দেশের ফুল হইতে সুগন্ধী এসেন্স ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন। ফুল ফুটিবার সময় হইলে গাজিপুর, কনৌজ, কটক প্রভৃতি স্থানে যন্ত্রাদি সহ লোকজন পাঠাইয়া বিশেষ উপায়ে একস্‌ট্রাক্ট্ প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসেন। একস্‌ট্রাক্ট্ হইতে এসেন্সে প্রস্তুত এখানকার ল্যাবোরেটরীতে ছোট ছোট মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এই একস্‌ট্রাক্ট্ ভিন্ন অন্য উপাদান ও এই এসেন্সে কিছু কিছু আসে।

কারখানাটী খালের উপর হওয়ায় জাহাজ হইতে মাল আনাগোনার বেশ সুবিধা। ফার্ম্মেসী ও এসিডঘরের ভিতর দিয়া ও বাহিরে সর্ব্বত্র ট্রলি লাইন আছে। তাহাতে মাল চলাচল সহজ হইয়াছে। খাল হইতে জল লইবার লাইসেন্স করিয়া পাইপ বসান আছে। দরকার হইলে দমকল দ্বারা খাল হইতে জল তুলিয়া পুকুরে ফেলা হয়। আফিস কারখানায় মাল যাতায়াতের জন্য ঘরেই কতকগুলি গোরুর গাড়ী আছে। কারখানা ও আফিস প্রাইভেট্ টেলিফোন দ্বারা সংবদ্ধ। সরঞ্জামের কোন ত্রুটীই নাই। কুড়িজন লোক লইয়া ইঁহাদের একটী ফায়ার ব্রিগেড্ বা আগুন নিবাইবার দল আছে। লোকগুলি নিজেদের কর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। বিপদসূচক ঘন্টা দিয়া সপ্তাহে দুই তিন বার ড্রিল করান হয়। যে কোন সময়ে বিপদসূচক ঘন্টাধ্বনি করিলে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে জল ফেলিতে তিন মিনিটের বেশী সময় লাগে না। সময় সময় গভীর রাত্রে অতর্কিতে ঘন্টাধ্বনি করিয়া মশাল জ্বালিয়া

ছিল দেওয়া হয়। এই সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কারবারটার প্রত্যেক অঙ্গটাই পূর্ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টার পরিচয় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। যাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিয়া খাটিতেছেন তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। ইহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত দেখিলে বাঙ্গালীর কর্ম্মকুশলতার উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়।

'প্রবাসী', বৈশাখ : ১৩১৯.

New year's day, 1912

A most eventful year in my career has just closed. Half year absent this time and later on the repeated relapse of malarial fever filled me with grave anxiety not on my personal account but because of the investigations on the amine nitrites, which I feared might be

Prafulla Chandra Ray

১১ই মাঘ — ৬৬তম [illegible] Jan. 24. 96

[illegible]

Appreciation on behalf of the Education Department, Bengal

communicated by the Director of Public Instruction

Sir Prafulla Chandra Ray joined the Presidency College Calcutta as a Professor of Chemistry in the year 1889 and when he published his first paper on the Nitrites of Mercury in the Journal of the London Chemical Society in the year 1896 the scientific world suddenly and with a pleasant surprise became conscious of the fact that the long and gloomy night of India's inactivity and inertness in the domain of Science was fast drawing to an end and that India had also something to contribute to the glorious achievements of Modern Science which was being pursued with unique energy perseverance and devotion by the western nations

It not only marked the end of India's dark age of ignorance and stagnation but also clearly indicated the happy re-awakening of the genius of originality as well as of creative energy in a people whose natural growth and development had unfortunately become arrested in course of time

His 'History of Hindu Chemistry' which is a masterly production of his profound scholarship, untiring energy and indefatigable labours and his valuable contributions to Chemical Science then followed in quick succession and in kaleidoscopic colour and his originality great personality saintly character and unique devotion to Science soon created in the Chemistry Department of the Presidency College an atmosphere of scientific research and unceasing quest for scientific truth, which fostered the rapid growth and development of an Indian School of young investigators in the field of Chemistry who have now succeeded in securing due recognition in the scientific world

Prafulla Chandra worked in the Chemical Laboratory of the Presidency College for over twenty seven years turning out every year two or three young and enthusiastic workers in the field of Science well-equipped and well-trained for original investigation imbued with the spirit of research by his master mind and keen

on devoting themselves to the pursuit of Science

His many-sided activities and researches in the domain of Chemistry contributed not a little to raise both the Presidency College and the University of Calcutta in the estimation of the world outside as important centres of advanced learning and research His name will also go down to posterity as the founder of important chemical industries in Bengal which are indebted so largely to him for their development

He will always be remembered as an ideal of plain living and high thinking a great savant in the sphere of Science an inspiring teacher in the educational circle a kindly benefactor of students a constant friend of suffering humanity and above all as a devoted son of Mother India possessing such weath of culture and strength of character as alone will go far towards ensuring India's rightful place in the hierarchy of nations

May God grant him many more years of health and activity to continue to teach and guide the youths in the path of intellectual greatness scientific research true assimilation of the East and the West and disinterested service to humanity'

R.N.Sen
Principal. Krishnagar College

Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932

ACHARYA RAY— MAN OF BOUNDLESS CHARITIES

Gift To The Cause of Education And Suffering Humanity

The charities of Acharya Ray were really unbounded It is no easy task to locate or to measure them for most of them were secret and made for no other purposes but for giving away for the sake of giving Hundreds of students were able to build up their career through his beneficence Such gifts were too personal to be mentioned Scores of institutions owed their continue existance to the loosening of his purse strings Below we give a list of some of the institutions which have benefited through the munificence of the departed savant

1 Calcutta University
2 Indian Chemical Society
3 Bagerhat P C College
4 Chittaranjan Hospital
5 Carmichael Medical College
6 Nari Kalyan Asram
7 National Council of Education
8 Khadi Pratisthan
9 Bangiya Sahitya Parisad
10 Brahmo Balika Shikshalaya
11 Sadharan Brahmo Samaj
12 Daulatpur Hindu Academy
13 Nalhati H E School Khulna
14 Birdhata H E School Khulna
15 Saihati P C Institute Khulna
16 Calcutta Medical School
17 Raruli Education Society
18 Rammohun Library and Free Reading Room
19 Dacca University
Nagpur University
21 Hindu University Benares
Women's University Bombay
23 Calcutta Orphanage
Calcutta Deaf & Dumb School
25 Indian Inst for Medical Research
Calcutta Nurses Institute
27 Gana Siksha Parisad Dacca
28 Sunday Moral School
29 Sarbojonin Sishu Bidyalaya Khulna
30 Ananda Asram Dacca
31 Bishnupur H E School Khulna
32 Sahebkhali H E School Khulna
33 Debhata H E School Khulna
34 Town Sripur H E School Khulna
35 Raruli Girls' M E School Khulna
36 Ajugarah H E School Khulna
37 Indian Science News Association
38 Sahebnagar Agricultural Farm Nadia
39 Indian Research Institute
40 Greater India Society
41 Women's Protection League
42 Bengal Social Service League
43 Aswini Kumar Institute
44 Nari Sikha Samiti
45 Jadavpur T B Hospital

Hindusthan Standard : 17June, 1944

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের
মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের এবং
সংবর্দ্ধনাদির কার্য্যবিবরণ

প্রফুল্ল-জয়ন্তী

আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করায় বঙ্গদেশের জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কলিকাতা টাউন হলে আলোচ্য বর্ষের ২৫ এ অগ্রাহায়ণ রবিবারে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বিরাট সভায় সমবেত হয়। আচার্য্যদেব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। পরিষদের কার্য্যনির্বাহক সমিতি এই শুভ সুযোগে পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই জয়ন্তী সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতাদির পর প্রফুল্ল-জয়ন্তী-সমিতির পক্ষে স্যার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলে পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের নিম্নোক্ত মানপত্র পাঠ করেন—

।। শ্রীঃ।।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়
মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহাত্মন!

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে দিন বাঙ্গালার মুমূর্ষু জাতীয় জীবন নব অভ্যুদয়ের চঞ্চল তরঙ্গাঘাতে নূতন করিয়া আলোড়িত হইল; সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে নব নব বিচিত্রতায় যে দিন বাঙ্গালীর পুনর্জ্জন্মের স্পন্দন সূচিত হইল; যুগযুগান্তসঞ্চিত পঙ্কপুঞ্জ ভেদ করিয়া যে দিন স্বচ্ছ সরসীতে বাগ্দেবীর চরণপদ্ম শতদল মেলিয়া বিকশিত হইল, সেই দিন-- নূতন ও পুরাতনের সেই শুভ সন্ধিক্ষণে ভারতের বিজ্ঞান-লক্ষ্মী নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রসন্ন হাস্যে নব জাগ্রত বাঙ্গালীকে নন্দিত করিলেন। সেই সফল লগ্নে বঙ্গমাতার যে দুই জন কৃতী সন্তান তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদের অন্যতর। বিজ্ঞানের সাধনায় শিষ্য-প্রশিষ্য সমভিব্যাহারে তুমি সেদিন জয়যাত্রা করিয়াছিলে। তোমার সেই বিজ্ঞান-গোষ্ঠী আজ দেশে-বিদেশে যশস্বী হইয়া তোমার সাধনা ও সঙ্কল্পকে সার্থক করিয়া

দেশজননীকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বিজ্ঞানচর্চায় তুমি দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছ। নিজের অক্লান্ত তপস্যায় বিশ্বের জ্ঞানসম্পদে তুমি প্রচুর অর্ঘ্য দিয়াছ। হে আচার্য! আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে বিজ্ঞান-সাধক! বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রেও তোমার দান সামান্য নয়; বহু বৎসর যাবৎ বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষদের সহিত আপনাকে যুক্ত রাখিয়া পরিষদের সভাপতিত্বের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পৌরোহিত্য করিয়া তুমি আপনি ধন্য হইয়াছ, আমাদিগকে ও ধন্য করিয়াছ। তোমার সপ্ততিতম জন্মদিনের সুযোগে বঙ্গদেশের সুধী ও সাহিত্যিকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে আচার্য! বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সাধনা করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হও নাই। দৈন্য- দুঃখ, অভাব-অনটনে মৃতকল্প স্বজাতির দুর্দশা মোচনের জন্য, স্বদেশের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তুমি কারুশিল্প ও চরকা-খদ্দর প্রচারে ব্রতী হইয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছ; হে মাতৃভক্ত! আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে ত্যাগী! তুমি জীবনে কোন দিন সঞ্চয় কর নাই- যাহা উপার্জন করিয়াছ, রাজাধিরাজের ন্যায় অকুণ্ঠিত চিত্তে দেশের জন্য তাহা বিতরণ করিয়া, নিজের রিক্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছ। হে দানবীর! তোমার মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি!

হে মহাত্মন! তোমার নিষ্ঠা, তোমার একাগ্রতা, তোমার দেশপ্রীতি, তোমার আদর্শ জাতিকে উত্তরোত্তর মঙ্গলের পথে, লইয়া চলিয়াছে। হে কর্ম্মী! হে আজন্ম ব্রহ্মচারী! তোমার অমানুষিক কর্মশক্তি একদা এই দুর্ভাগ্য জাতির মুক্তি বহন করিয়া আনিবে। সেই শুভদিন লক্ষ্য করিয়া আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ভগবান তোমাকে শতায়ু করিয়া দেশের কল্যাণে নিযুক্ত রাখুন— তোমার চিরস্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন।

।। ওঁ স্বস্তি ।। ওঁ স্বস্তি ।।

কলিকাতা *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে*

বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৫এ অগ্রহায়ণ *শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, সম্পাদক*

| এই মানপত্রটি খদ্দরের উপর মুদ্রিত এবং উহা খদ্দরের পীঠবস্ত্রে সংযুক্ত করা হয়। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুত যামিনী রায় মহাশয় প্রাচীন বঙ্গদেশীয় শিল্পরীতিতে উহা চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পরিষদ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। |

তৎপরে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের, নিখিল বঙ্গ কলেজ শিক্ষক সম্মিলনীর, বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট গ্রাজুয়েট সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগের, নিখিল বঙ্গ গভর্ণমেন্ট কলেজ শিক্ষক মণ্ডলীর, নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক পরিষদের, নিখিল বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের, ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের, এবং কলিকাতা লিটারারী সোসাইটির অভিনন্দন-পত্র পঠিত হয়। আচার্যদেব প্রতিভাষণে সকল প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পড়িয়া তাঁহার প্রাণে জ্ঞানের স্পৃহা জাগিয়া উঠে ও পরে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা পড়িয়া তাঁহার অন্তরে বৈজ্ঞানিক হইবার আগ্রহ জাগিয়া উঠে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উপযোগিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া পরিষদের ক্রমোন্নতিতে দেশবাসীকে সাদরে আহ্বান করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর সঙ্গীতাদি হয় ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

তৎপর দিবস ২৬এ অগ্রহায়ণ সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় আচার্যদেবকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য পরিষদগৃহে এক প্রীতিসম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় রচিত উদ্বোধন সঙ্গীত ('হে কর্মযোগী, হে জ্ঞান তাপস') কুমারী সুধীরা দাশগুপ্তা কর্তৃক গীত হইলে পর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় আচার্যদেবের ললাটে চন্দন-তিলক ও গলে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত পাত্রে শঙ্খ ও পদ্ম উপহার দিয়া তাঁহার গলে খদ্দরের মাল্য অর্পণ করেন। ধূপধূনার গন্ধে ও মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিতে পরিষদ মন্দির আমোদিত করা হয়। আচার্যদেব সমবেত মহিলা ও সদস্যগণকে আলাপ ও আপ্যায়ন দ্বারা তৃপ্ত করেন। তৎপর সঙ্গীত ও জলযোগাদির পর এই প্রীতি সম্মিলন সমাপ্ত হয়।

এই জয়ন্তী-উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পরিষদের বহু হিতৈষী সদস্য পরিষৎকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বার্ষিক কার্য্যবিবরণে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল। এই উপলক্ষে আচার্য্য মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার এম এ মহাশয় পরিষদের সাধারণ তহবিলে ১০৲ দশ টাকা দান করেন। পরিষদের সভাপতি আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে ও তৎপূর্বে যে সকল মূল্যবান উপহার পাইয়াছেন, সেগুলি তিনি পরিষদকে দান করিয়াছেন এবং সেগুলি মেসার্স কে, সি.পাল এন্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণের প্রদত্ত শো কেসে রক্ষা করা হইয়াছে।

আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত দ্রব্যাদি

১। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ কালে তাঁহার ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র, একটি রৌপ্য নির্ম্মিত কাস্কেট সমেত, (১৯১৭/২৩এ ফেব্রুয়ারী)।

২। বাগেরহাটি মহকুমার শিক্ষকগণের প্রদত্ত মানপত্র— রূপায় বাঁধা বাঁশের কাস্কেট সমেত (১৯১৭/২১এ এপ্রিল)।

৩। সিঙ্গিপাশা হেমন্তকুমারী দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য রৌপ্য নির্ম্মিত আধার সমেত এক কর্ণিক (৩১এ জানুয়ারী, ১৯২৬)।

৪। নাগপুরের অধিবাসিগণের প্রদত্ত মানপত্র— একটি রৌপ্য নির্ম্মিত কাস্কেট সমেত (১৯৩২/২৭এ মার্চ্চ)।

৫। করাচী মিউনিসিপালিটির প্রদত্ত উৎকীর্ণ লিপি সমেত ট্রে একটি (১৯৩২/২২এ অক্টোবর)।

৬। আচার্য রায়ের প্রথম সিন্ধুদেশ গমন উপলক্ষে করাচীর পার্শী রাজকীয় মণ্ডল কর্ত্তৃক প্রদত্ত মানপত্র— কাষ্ঠ ও রৌপ্য নির্ম্মিত কাস্কেট সমেত (১৯৩২/২৮এ অক্টোবর)।

৭। প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা করপোরেশন-এর প্রদত্ত একটি রৌপ্য নিম্মির্ত চরকা —চরকার পাটায় মানপত্র খোদিত।

৮। প্রফুল্ল-জয়ন্তী সমিতির মানপত্র।

৯। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মানপত্র।

১০। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের মানপত্র (তাম্র-ফলকে উৎকীর্ণ)।

১১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়-প্রদত্ত মানপত্র- (তাম্রফলকে দুই পংক্তি উৎকীর্ণ কবিতা)।

১২। করাচীর Buy Indian Bazar এর প্রদত্ত মানপত্র- - একটি চন্দন কাষ্ঠের বাকস সমেত।

১৩। নিখিলবঙ্গ গবর্মেন্ট কলেজের টীচার্স এসোসিয়েশনএর প্রদত্ত মানপত্র— চন্দন কাষ্ঠের বাকস সমেত।

১৪। নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতির সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র— চন্দন কাষ্ঠের আধার সমেত।

১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কাউন্সিল অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট টীচিং এর মানপত্র —রৌপ্য নির্ম্মিত আধার সমেত।

১৬। পাঞ্জাব প্রদেশের রাসায়নিকগণের প্রদত্ত মানপত্র— রৌপ্য নির্ম্মিত কাস্কেট সমেত।

১৭। ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন-এর সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র— রৌপ্য নির্ম্মিত কাস্কেট সমেত।

১৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র।

১৯। বিদ্যাসাগর কলেজ ইউনিয়ন কমার্শিয়াল বিভাগ হইতে প্রদত্ত মানপত্র।

২০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রদত্ত মানপত্র।

২১। নিখিলবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সম্মিলনীর সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র।

২২। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দরিদ্র ছাত্রাবাসের পরিচালক ও ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র।

২৩। নারায়ণগঞ্জ (মেদিনীপুর) হইতে প্রেরিত মানপত্র।

২৪। নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক তামার থালা।

২৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র— একটি চন্দন কাষ্ঠের বাক্স সমেত।

২৬। ছাত্র-ছাত্রী পরিষদের মানপত্র— রৌপ্য নির্ম্মিত কাস্কেট সমেত।

২৭। একটি রৌপ্য নির্ম্মিত নিশান।

২৮। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়-প্রদত্ত এক শ্বেত-প্রস্তরের পাত্র ও এক শঙ্খ।

২৯। একটি গালার ট্রে।

৩০। একটি লক্ষ্ণৌ-এর চিত্রিত ট্রে।

৩১। রৌপ্য নির্ম্মিত তালা ও চাবি।

(১৩৩৯ বঙ্গাব্দের কার্য্যবিবরণ, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৯ বর্ষ)

প্রফুল্ল-জয়ন্তী সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে দান

স্যার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৫	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	৫
.. হরিদাস বসু	৫	.. সতীশচন্দ্র ঘোষ	৪
স্যার .. হরিশঙ্কর পাল	৪	.. ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৪
রায় .. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	৪	শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র লাহা	৪
.. শ্যামাদাস বাচস্পতি	৪	.. রায় যোগেশচন্দ্র বাহাদুর	৪
.. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪	.. যতীন্দ্রনাথ বসু	৪
বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র	৩	শ্রীযুক্তা কামিনী রায়	৩

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	২		শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন	২
,, কুমারকৃষ্ণ কুমার	২		,, ডাক্তার সুধীরকুমার বসু	২
,, মৃণালকান্তি ঘোষ	২	রায়	,, যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর	২
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২		,, দেবীবর ঘোষ	১
,, অমল হোম	১		,, ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত	১
,, ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১		,, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ	১
,, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১		,, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	১
,, বিনয়কুমার সরকার	১		,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১
,, প্রিয়রঞ্জন সেন	১		,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	১
রায় ,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর	১		হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১
,, প্রমথনাথ চৌধুরী	১		মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ	১
,, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল	১		শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১
,, ডক্টর সত্যচরণ লাহা	১		,, দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক	১
,, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১		,, হেমচন্দ্র ঘোষ	১
,, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১		,, অনঙ্গমোহন সাহা	১
,, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১		,, মন্মথমোহন বসু	১
,, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	১		,, সতীশচন্দ্র বসু	১
,, চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১		,, ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ	১
				১২০

"I can now understand why there is socialism in this world. Look at these lofty mansions of the idle rich and look at the miserable huts of the actual worker and cultivators that I saw.."

— P.C. Ray

বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ভারতীয় মনীষার প্রতিশ্রুতি

দেশে এবং বিদেশে সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অত্যন্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগজনক। উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া এবং জঙ্গীবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য লইয়া খেলা করিতেছে এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং আমরা ইহার বিরুদ্ধে ভারতের লেখক ও শিল্পীগণের, এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ আছে তাঁহাদের সকলের, প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদ জানানো অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। এ সময়ে আমাদের নীরব থাকা অপরাধ হইবে, সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তাহার ঘোর ব্যত্যয় করা হইবে।

ভারতে নাগরিক অধিকার হইতে জনগণকে যেরূপে সাঙ্ঘাতিকভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহা শুধু রাজনীতির দিক দিয়াই সর্বনাশকর নহে, উহা দ্বারা সংস্কৃতি ও জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি বিস্তারের চেষ্টাকে খোলাখুলি আক্রমণ করা হইতেছে। প্রায়শই যেভাবে পুস্তকাদি, বিশেষত সমাজতন্ত্রের মতবাদ ও কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে, তাহা আমাদের মতে অত্যন্ত কলঙ্ককর। নামজাদা বাণিজ্য শুল্ক আইনের (Sea Customs Act) ১৯ ধারা অনুসারে বিদেশ হইতে প্রেরিত পুস্তক, পুস্তিকা ও পত্রিকা আটক করার কথা প্রায়ই শুনি। শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ্ হিসাবে সিডনী ও বিয়াট্রিস ওয়েবের প্রচুর খ্যাতি আছে; কিন্তু তাঁহাদের সে খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁহাদের লেখা 'সোভিয়েট কমিউনিজম' নামক পুস্তক পর্যন্ত ঐ আইনে ভারতে আমদানি করা নিষিদ্ধ হইয়াছে এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরাজী অনুবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। গবর্নমেন্টের সংস্কৃতি ও প্রগতিবিরোধী মনোভাব ছাড়া ইহার আর কোনো কারণ থাকিতে পারে না। বোম্বাইতে সম্প্রতি লো'র 'রাশিয়ান স্কেচ বুক' বাজেয়াপ্ত হয়, ব্যাপারটি অত্যন্ত বিস্ময়কর হইলেও উহা হইতে সেন্সরনীতির কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাজেয়াপ্ত বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের আদেশে নিষিদ্ধ পুস্তক ও পত্রিকার তালিকা প্রকাশ করিলেই বোঝা যাইবে, এ দেশে সরকারী কার্যপদ্ধতি কিরূপ নিন্দার্হ। ইহা ছাড়া, দেশে স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদপত্র সৃষ্টির বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ তো আছেই।

সরকারী হিসাব অনুসারে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ৩৪ খানি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। চিন্তার ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা আমরা ভোগ করি বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহার দুরবস্থা সকলের পক্ষে

উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে।

সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ আছে তাহাদের কাছে ভারত অপেক্ষাও ভারতের বাহিরের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। মহাযুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া পৃথিবীময় বিচরণ করিতেছে। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরি খাদ্যের পরিবর্তে অস্ত্র যোগাইয়া এবং সংস্কৃতির সুযোগের পরিবর্তে সাম্রাজ্যগঠনের প্রলোভন ধরিয়া নিজের জঙ্গীবাদী রূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে। আবিসিনিয়াকে পদানত করিবার জন্য ইতালী যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা যুক্তি ও সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসবান সকলকে কঠিন আঘাত করিয়াছে। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতা, স্থূল জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিকে ইচ্ছাপূর্বক প্ররোচনা দান, দ্রুত অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি, সঙ্কটময় পরিস্থিতির এই সব পূর্বসূচনা। আমরা এই সুযোগে আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই; যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। কোনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষের যোগদানের আমরা ঘোর বিরোধী; কারণ আমরা জানি যে, আগামী যুদ্ধে সভ্যতা ধ্বংস হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নই হউক, বা নাৎসি জার্মানি হউক— যেখানে সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে সেখানেই উহার রক্ষার জন্য আমরা উদ্গ্রীব এবং আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিব।

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রেমচাঁদ, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি। ১৪ই ভাদ্র, ১৩৪৩।

(গবর্নমেন্ট কর্তৃক বক্তব্য ও পত্রিকাদি নিষিদ্ধ করা এবং আর এক মহাযুদ্ধের আয়োজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভারতের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করেছেন। রোমাঁ রোলাঁর আহ্বানে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ তারিখে ব্রাসেলসে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হইয়াছে, ইস্তাহারটি তথায় প্রেরিত হইয়াছে। প্যারিসে সংস্কৃতিরক্ষা সম্মেলনেও উহা প্রেরিত হইয়াছে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লেখক, শিল্পী ও মনীষীরা এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগেই এই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে)। *'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৫০ বছর– গণশক্তি' হইতে গৃহীত।*

আচার্যদেব ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৩৭)

INDIAN INTELLECTUAL'S MANIFESTO

"The Nazi attack on the Soviet Union has opened a new and momentous phase in world history The use of machines and of men rages to-day on a colossal front and on a scale unheard of before

At this hour of trial we feel it is urgent that attention is drawn to the massive moral and material achievement which the Soviets have to their credit Some of us have been critical of aspects of the Soviet regime; some, again do not support the theory of Marxism which the Soviets have attempted to put in to practice. But when one remembers the dark legacy of czarist misrule, which was followed for years by a disastrous civil war and the intervention against the infant Soviets by nearly all the powers on earth, the Soviet achivement can only be described as magnificent

Rabindranath Tagore has testified to it in glowing term, and since the two leading sociological investigators in the world to-day--- Sidney and Beatrice Webb brought out their book on Soviet communism--- A new civilisation, information in regard to the U.S S R. has been both reliable and abundant."

COMPLETE EQUALITY

"In the Soviet Union, all factories, mines, railways and shipping land and trading organisation are the property of the people as a whole The economic and the social life of the country is planned for the welfare of all and not for the profit of the few. The drama fo Soviet planning can not fail to grip even those who do not hold with Socialists hypotheses. Complete equality of all citizens, irrespective of race or sex or nationality, enables them to participate in the business of the community.

Equal opportunity for education is provided universally, the school-leaving age is raised to seventeen and payment is made to students at universities Work is for all, unemployment does not exist; economic crisis, recurrent everywhere else have ceased. The maximum working day is 8 hours the average less than 7 Free

medical attention is provided for all workers receive wages while sick as though they are at work, and are besides entitled to paid holidays every year No where in the world as impartial observers testify are women and children so well cared for as in the Soviet Union

Majestic in conception practical in detail, scientific in form the Soviet plans essay tasks never yet attempted by any State, ancient or modern "

SCIENTIFIC SPIRIT

"There is no country, we imagine, in which so large and so varied an amount of scientific research is being carried on at the public expense, alike in the realms of abstract theory and in that of technology There is certainly none in which there is so little chance of that frustration of science by the profit-making instinct of which the British and American scientists are now complaining." (Soviet communism)

We in India can not forget how in one grand gesture the Revolution the Soviets renounced all 'priorities' and 'Capitulatious' and 'Concessions' and 'privileges' which the czarist Government had enjoyed in Asiatic countries along with the other Great powers

Scores fo races and millions of people were condemned by the czars to 'planned backwardness' while the Soviet freedom for national and linguistic minorities has produced a high flower of culture, and a new intellectual life is astir on sites where superstition and dark ecclesiastical reaction once reigned supreme For in the U S S R with its 185 peoples and 142 languages 'there is no imposed privilege for a race or for a language "

EMANCIPATION OF WOMEN

"The first Mohammedan State to adopt legislation for women's emancipation was not Kamal's Turkey but Soviet Azerbaijan How different is Soviet Uzbekistan from the Bukhara Chanate, where there were 8 000 witch doctor for the Emir his harem and his court'

As the Webbs point out " The Soviet Union has set itself diligently not merely to treat the 'lesser breeds without the law' with equality

but recognising that their backwardness was due to centuries of poverty' repression and enslavement, has made it a leading feature of its policy to spend out of common funds considerably move per head on its backward reces that on the superior ones, in education and social improvements, in industrial investment and agricultural reforms "

LOVE OF KNOWLEDGE

"The figures for book-production in the U.S S.R. are astronomical. At the end of the first five year plan Soviet book-production was greater than that of England, Germany and Japan taken together.

Einstein, banished by the Nazis, sells more perhaps in the U.S.S.R than anywhere else . between 1927 and 1936, 55,000 copies of his work were sold in the Union

In the land of his birth, the 375th anniversary of Shakespeare's birth passed unnoticed, while the event was celebrated by workers and peasants everywhere in the U S S R some 200,000 people saw in Moscow the performance of 'King Lear' in the spring of 1939. In the small republic of Armenia, 32,000 copies of Shakespeare sold in last five years.

The Soviet people have no 'cultured classes' in over sense of the term and want none. Ther seek a wholly cultured people and try to offer leisure, security and opportunity to all."

NEW CIVILISATION

"In a little over twenty years and in face of the most stupendous odds, the common people of the Soviet Union have created what we believe is a new civilisation And even we in India, borne down by generations of inanity and degradation, can not remain undis-turbed when that civilisation is in peril. Helpless and unfree, we can at least send out good wishes to the Soviets and wait anxiously for the day when they will come out victorious over the forces arrayed against them "

The signatories of the appeal are:

P.C. RAY, Satyendra Nath Majumdar (Editor, 'Arani'), Rabindranarayan

Ghosh (Principal, Ripon College), Hem Chandra Nag (Editor, Hindusthan Standard), Mrinal Kanti Ghosh (Amrita Bazar Patrika), Vivekananda Mukherjee (Editor, Yugantar), Bankim Chandra Sen (Editor, 'Desh'), Jatish Chandra Bhowmick (Editor, 'Forward'), A.R Malihabadi (Editor, 'Rozana Hind'), Amal Home (Editor, Calcutta Municipal Gazettee), P.K. Bose (Principal, Bangabasi College), Bhupendra Nath Datta.

(Calcutta University)— Biresh Chandra Guha (Ghosh Professor of Applied Chemistry), Kalidas Nag, Amiya Kumar Sen, Narayan Chandra Banerjee, Jitendra Nath Banerjee, Tripurari Chakraborti, N.K. Sinha, Humayun Kabir, Niharranjan Ray, Batakrishna Ghosh, Surendranath Goswami, R P. Das Gupta, L.P Sukul, A.B.M Habibullah, P C Gupta, Haricharan Ghosh, Renu Roy, Nikhil Chakraborty, Sarasi Kumar Saraswati

(Bar Library, High Court)— Arun Sen, Abany C. Banerjee, Sukumar Mitra, Hirendranath Mukherjee, S K Acharyya, *Jyoti Basu*

(Artists and Writers), Pramatha Chaudhuri, Naresh Chandra Sen Gupta, Jamini Roy, Atul Chandra Gupta, Manik Banerjee, Tarasankar Banerjee, Amiya Chakraborti, Premendra Mitra, Buddhadev Bose, Sajani Kanta Das, Bishnu Dey, Hiren Kumar Sanyal, Niren Roy, Gopal Haldet, Abdul Kadir, S.Upadhyay, Samar Sen, Abu Saiyid Ayyub, Benoy Ghosh, Subhas Mukherjee, Ajit Chakraborti, Bimala Prasad Mukherjee, Chanchal Chatterjee, Jyotirindra Maitra, Kamakshi Chatterjee. (Bangabasi College), N.N Sen Gupta, Karunamoy Mukherjee, Provash Chandra Ghosh, (Vidyasager College), Amarendra Prasad Mitra (Victoria Institution), (Scottish Church College)— N.C. Bhattacharyya, Sushil C. Dutta. (Ripon College)-- Ananda Krishna Sinha, Bejoy Kumar Roy, Satish Chandra Sengupta, Bhabatosh Datta, Nandalal Ghosh.

The above manifesto, signed by a large number of intellectuals of Bengal, was issued soon after Hitler attacked the U.S.S R., 1941.

আচার্যদেবের পিতা শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের উইলনামা

True Copy

(উইলের নকল)

শ্রী হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী

শ্রী শ্রী হরি শরণং

শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী পিং মৃত আনন্দ লাল রায়চৌধুরী জাতি কায়স্থ পেশা তালুকদারি সাং রাড়ুলী পং মলুই ষ্টেশন পাইকগাছা জেলা খুলনা কস্য উইলনামা পত্রমিদং সন ১২৯০ সালাব্দে লিখিলং কার্য্যঞ্চাগে আমি সন ১২৮৩ সালের ২৯এ কার্ত্তিক তারিখে একখানি উইলনামা রেজেষ্ট্রী করিয়াছিলাম তাহা অন্যথা ও বিনষ্ট করিয়া নিম্ন দফাওয়ারি উইলনামা প্রস্তুত করিলাম।

১। আমার বাটীস্থ শ্রীশ্রী রাজারাজেশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত আছেন তাঁহার দিগের নিত্য নৈমিত্তিক সেবা প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে ও শ্রীশ্রী শারদীয়া পূজা, শ্যামা পূজা, কার্ত্তিক পূজা, শ্রীপঞ্চমী পূজা, দোলযাত্রা, দেউল পূজা ও অতিথি সেবা এবং পিতৃ– মাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়াকলাপ যে নিয়মে চলিয়া আসিতেছে অনুযায়ী নির্ব্বাহ হইবেক।

২। আমার অবিবাহিত কন্যার বিবাহার্থে আমার ষ্টেট হইতে অন্যূন ১০০০৲ টাকা প্রদত্ত হইবেক।

৩। আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দাসী নিজ ব্যয়ার্থ আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে বাৎসরিক ৩৬০৲ টাকা নগদ ও দশ সেরা পালির ১০ আড়ি ধান্য পাইবেন এবং বাসার্থে উত্তরের কোটার উপরিতল তাঁহার ব্যবহারাধীন থাকিবেক।

৪। আমার ষ্টেটে এইক্ষণে ঋণ আছে ও ভবিষ্যতে যদি হয় তাহা পরিশোধার্থে আমার

সম্পত্তির যে কোন অংশ বিক্রয় কিম্বা পত্তনি মৌরশী ইত্যাদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং দৈব দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে রাজস্ব পরিশোধ কিম্বা ভরণ পোষণের নিমিত্ত নূতন ঋণ করা আবশ্যক হইলে তাহা অন্যের মত নিরপেক্ষ হইয়া আমার জ্যেষ্ঠপুত্র করিবেন। তাহাতে অপর উত্তরাধিকারীগণ আবদ্ধ থাকিবেন। আমার কৃত কিম্বা ভবিষ্যতে ঐ প্রকার ঋণ হইলে তাহা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ত্যজ্য সম্পত্তি কেহ বিভাগ করিয়া লইতে কি অন্য কোন দেনায় আবদ্ধ অথবা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

৫। আমার মধ্যমপুত্র সপরিবারে শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার পুত্র মাতামহের বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন সুতরাং তাঁহার অত্রালয়ে বাস করার সম্ভবনা নাই যদি বাস করিয়া পৈত্রিক ক্রিয়া কার্য্য রক্ষণাবেক্ষণ করেন তবে আমার পরিত্যাজ্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন নচেৎ অন্যত্র বাস করিলে ইহার কিছুই পাইবেন না।

৬। আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান প্রফুল্লচন্দ্র রায়চৌধুরী বিদ্যাভ্যাস করার্থে বিলাত গমন করিয়াছেন তিনি প্রত্যাগত হইয়া যদি স্বজাতি সমাজে পরিগৃহীত ও স্বধর্ম্মে অবস্থিতি করেন তবে রীতিমত পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন নচেৎ হইবেন না।

৭। আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান পূর্ণশশী রোগোপলক্ষে কিছুমাত্র লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই ভবিষ্যতে যে কৃতকার্য্য হইবেন সে-সম্ভাবনাও অল্প অতএব আমার অবিদ্যমানে তাঁহার বিষয়ের অংশের কর্ত্তৃত্বভার আমার বড় পুত্রের উপর ন্যস্ত হইবে। মালি মোকদ্দমা তহশীল খরচ বাটী-ঘর মেরামত দেবসেবা সাধারণ লোকলৌকিকতা ইত্যাদি ব্যয় বাবদ গ্রাসাচ্ছাদন জন্য বার্ষিক ২০০ টাকা নগদ পাইবেন এবং অস্থাবর সম্পত্তি ৩০০ টাকার পরিমাণ দ্রব্যাদি পাইবেন অথবা নগদ ৩০০ টাকা। আমার বর্ত্তমান অন্তঃপুরমধ্যে একত্রে সরিকস্থান সমাবেশ হইতে পারে না। সুতরাং বড় পুত্রই ঐ খণ্ডে বাস করিবেন। অপরে অন্য খণ্ডে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া লইবেন তাহার মূল্য স্বরূপ আমার ষ্টেট হইতে প্রত্যেকে ৩০০ টাকা করিয়া পাইবেন।

৮। আমার পরিত্যজ্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির কর্ত্তৃত্বের ভার আমার বড় পুত্রের প্রতিই অর্পিত হইবে এবং আমার ব্যবহার্য্য বৈঠকখানা সমেত ফার্ণিচার তিনিই ভোগ করিবেন অন্যেরা নিজ ২ টাকা হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পোতায় বৈঠকখানা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন।

৯। আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র দৈব বিড়ম্বনায় বাক্‌শক্তিহীন হইয়াছেন যদি চিকিৎসা দ্বারা বাকাস্ফূর্ত্তি ও জ্ঞানলাভ না হয় তবে তিনি যাবজ্জীবন বড় পুত্রের সংসারে থাকিয়া প্রতিপালিত হইবেন। তদভাবে তাঁহার প্রাপ্য অংশ উপরের লিখিত ধারানুসারে সকলের

মধ্যে অথবা যিনি ২ এই পুরীতে বাস করিবেন তাঁহাদের মধ্যে বিভাগিত হইবে।

১০। আমার বড় পুত্রকে সকলপ্রকার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ও পৈত্রিক ক্রিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার প্রদত্ত হইল পৃথকরূপে কেহ আদায় তহশীল করিতে পারিবেন না এদের কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া আদায় তহশীল হইবেক।

১১। আমার পুস্তকালয়ে নানাবিধ আরবি পারশি উর্দ্দু পুস্তক সকল সঞ্চিত আছে আমার জীবনান্তে ঐ সকল গ্রন্থ তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে প্রদত্ত হইবে।

১২। উল্লিখিত শর্ত্ত সমস্ত আমার জীবনান্তে বলবর্ত্তী হইবে এতদর্থে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অত্র উইলনামা প্রস্তুত করিলাম। ইতি – সন সদর তারিখ ৩রা মাঘ

লেখক–	ইশাদী—
শ্রী অক্ষয়কুমার বসু	শ্রী সূর্য্যকুমার খাষনবীশ
সাং খেশরা মোং রাড়ুলী	সাং ভবানীপুর
শ্রী অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য	শ্রী বিহারী লাল মিত্র
সাং রাড়ুলী	সাং রাড়ুলী

প্রেম রসায়নে ওগো সর্বজন প্রিয়,

করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৭০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আচার্যদেবের উদ্দেশে কবিগুরু)

কবিগুরু ও আচার্যদেবের পত্রালাপ

University College of Science
and Technology
Department of Chemistry
92. Upper Circular Road.
Calcutta.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শেষ বয়সে আপনাকে লইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম। চরকার সপক্ষে বিপক্ষে যাহাই লিখুন না কেন তাহাতে বরং সমাজের উপকারই এ বিষয়ে যত বাদানুবাদ হয় ততই ভালো। এই প্রবন্ধের সপক্ষে বিপক্ষে অনেকেই লেখনী ধারণ করিয়াছেন, ইদানীং মহাত্মা গান্ধীও আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি অনেক সভায় বলি যখন 'বড়দাদা' আমাদের দিকে তখন 'ছোটদাদা'কে ভয় করিনা। সে দিন আপনার সামনে হিসাব করিয়া দেখিলাম আপনি আমার অপেক্ষা তিন মাসের বয়োজ্যেষ্ঠ। সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্যসত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'গড্ডলিকার' প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্য সম্রাট স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন অচিরে পরপর, বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে দিন গ্রন্থকার পরশুরামকে আমি বলিলাম এ প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাঁহার মাথা না কিড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হাতের তৈয়ারি একজন রাসায়নিক এবং আমার কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যে অনেক দিন যাবত ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে, তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রেও একজন 'কেষ্ট-বিষ্টু'। সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। আর একটি কথা!— আপনিতো এগারো বারো বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতেছেন। শুনিয়াছি ঈশ্বর গুপ্ত তিন বৎসর বয়সেই পদ্য রচনা করিয়া ছিলেন এবং পোপ নাকি কিশোর বয়সেই বলিয়াছিলেন-

Father father mercy take
I shall no more verses make.

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, চল্লিশ বৎসরের পর নূতন ধরণের কিছু কেহ রচনা করিতে পারেন না কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখিয়াছি নিউটন ৪৩/৪৪ বৎসর বয়সের পূর্বেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন কিন্তু পরপর যুগান্তর সংঘটনকারী আবিষ্কার করেন। আবার সমান (Schumann) পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরে জড়বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত করেন। রিচার্ডসন (Father of English Novelists) পুস্তক

বিক্রেতা ছিলেন এবং আমার যেন স্মরণ হইতেছে যখন পঞ্চাশ বৎসরের কাছাকাছি তখন তিনি নভেল লিখিতে হাত দেন। আমাদের পরশুরামও প্রায় ৪৩/৪৪ বৎসর বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসল কথা এই যে আপনাকে কি অনুরোধ করিব যে আর একটি এমন তীব্র সমালোচনা করেন যে পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়ে? এক সময় পড়িয়াছিলাম যে অনেক তথ্য ও শক্তি গুহায় নিহিত থাকে। কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝিবে, কাহাকে কখন গুপ্ত অবস্থা হইতে সুপ্রকাশ করিয়া তুলেন।

ভবদীয়

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।।

শান্তিনিকেতন

সুহৃদ্বর,

বনে বসে Scientific American পড়ছিলুম, এমন সময় চিঠির খামের কোণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সরস্বতীর পদাঙ্ক দেখতে পেয়ে আনন্দই হল। আমার হৃৎপদ্ম থেকে কাব্য সরস্বতীকে বিদায় করে তিনি স্বয়ং আসন নেবেন এমন একটা চক্রান্ত চলচে। খুলেদেখি, যাকে বলে ইংরেজিতে টেবিল-ফেরানো— আমারই পরে অভিযোগ যে, আমি রসায়নের কোঠা থেকে ভুলিয়া ভদ্রসন্তানকে রসের রাস্তায় দাঁড় করাবার দুষ্কর্মে নিযুক্ত। কিন্তু আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার মুখে শোভা পায়না; একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে তার বিচার হবে। হিসাব করে দেখবেন কত ছেলে যারা আজ পেট মোটা মাসিকপত্রে ছোট গল্প এবং মিলহারা ভাঙা ছন্দের কবিতায় সাহিত্যালোকে একেবারে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারত; এমন কি, লেখকদায়গ্রস্ত সম্পাদকমণ্ডলীর আশীর্বাদে যারা দীপ্তশিখা সমালোচনায় লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত বড় বড় লাফে ঘটিয়ে তুলত তাদের আপনি কাউকে বি, এস, সি, কাউকে ডি, এস, সি, লোকে পার করে দিয়ে ল্যাবরেটরির নির্জন নিঃশব্দ সাধনায় সন্ন্যাসী করে তুললেন। সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি কতটুকুই বা কৃতকার্য হয়েছি। আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন মাসিকপত্র বলে যে সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যসেবী হতে পারত ভূশণ্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন।

আমার কথা যদি বলেন আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি। বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমর হয়েচে। এমন কি ভাবচি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মত শুদ্ধির কাজে লাগব, যে

সব জন্মসাহিত্যিক গোলমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে, জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন তাদের ফের জাতে তুলব। আমার এক একবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন; কিন্তু আর বোধ হয় উদ্ধার নেই। যাই হোক আমি রস-যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।

এ অঞ্চলে যদি আসতে সাহস করেন তাহলে মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করা যাবে। ইতি ১৮ অগ্রাণ, ১৩৩২।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।।

University College of Science
and Technology
Department of Chemistry
92, Upper Circular Road
Calcutta

১৩ই অক্টোবর, ১৯৩২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সম্প্রতি আমি মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। সেইখানে বোম্বাই হইতে দুইখানা টেলিগ্রাম পাই। গতরাত্রে আরও একখানা পাইয়াছি। তাহা এই পত্রের সঙ্গে দিলাম। বোম্বাই প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষগণের ধারণা আমি রাসায়নিক ও ঐন্দ্রজালিক একই সংজ্ঞাভুক্ত। এই জন্য তাঁহারা মনে করেন আমি এখান হইতে আপনার উপর এমন সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিতে পারিব যে, আপনি আর অমত করিতে পারিবেন না।

এই অস্বাস্থ্য লইয়া আপনি যে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারিয়াছেন ইহাতে আমি বিস্ময়াবিষ্ট। অবশ্য ইহাতে বিশেষ ফললাভ হইয়াছে। এখন পুনরায় আবার বোম্বাই যাইয়া ২৫শে তারিখের মধ্যে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন এ প্রকার অনুরোধ করিতেও আমি সঙ্কুচিত। যাহা হউক বোম্বাইবাসীগণের নির্বন্ধাতিশয় উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তাহাদের পক্ষ হইতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি। অবশ্য আপনাকে যদি রাজি করিতে পারি আমার পশার খুব বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আমারও স্বার্থ আছে। আপনার অভিমত

জানিতে পারিলে বোম্বাই তার করিব। সম্ভবতঃ আগামী সোমবার বা মঙ্গলবার করাচী রওয়ানা হইতে পারিব।

বিনীত

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার প্রতি দয়া রাখবেন। মহাব্যক্তি প্রাণপাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন সেই দৃষ্টান্তেই প্রাণের মমতা না রেখেই পুণায় ছুটেছিলেম। তাই বলে বারে বারেই দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হবার বয়স আমার নয়। সম্মোহন বাণ আপনার তূণে যে নেই তা নয়, কিন্তু শুধু তার টানে ছুটতে ভরসা হয়না। আপনার আলকিমির চোলাই যন্ত্রে সঞ্জীবনরস যদি আবিষ্কার করে থাকেন তবেই দূর দুর্গম পথে আপনার আমন্ত্রণ স্বীকার করতে পারি। আয়ুর তহবিল রিক্ত হয়ে এসেচে সেই জন্যে বয়স সম্বন্ধে কৃপণতাই বিধি। একটু চিন্তা করে যদি দেখেন তবে আমাকেও নিশ্চিত সেই পরামর্শই দেবেন। আপনাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার দুরাশা আমার নেই। ইতি ১৪ই অক্টোবর, ১৯৩২।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।।

Farewell address by the students of the Presidency College(1916)

Sir

On the eve of your retirement from the field of your labours in the Presidency College, permit us, your students of the college, to offer you this humble token of our united love and regard

Your place in the college Sir we are afraid can never be filled Men will come and men will go but where else can we possibly expect to find again that sweetness of disposition that vigour of simplicity that unwearied spirit of service, that broadbased culture that wisdom in deliberation and debate which for the space of thirty years or more endeared you so much to your pupils?

Yours was Sir indeed no small achievement Your way of life with its distinct Indian traits recalled us to the sweet and simple and manly days of Indian attainment You have been to us all through a guide philosopher and friend Easy of access ever-pleasant ever-willing to help the poor and needy student with your counsel and your purse living a life of sturdy, celibate simplicity with genuine patriotism not loud buatr deep, you have been to us an ancient Guru reborn a light and an inspiration from the treasure-house of old Indian spirituality

When the history of India's intellectual attainment in the modern era comes to be written your name will be mentioned in the very vanguard of progress as the maker of modern chemistry in India The credit and the glory of being the pioneer in the field of chemical research and of giving the impetus to scientific curiosity in this country is yours \Your "History of Hindu Chemistry" has opened a new chapter of Indian attainment and built a bridge over the abyss of the past whereon our young researchers may shake hands with the spirits of a Nagarjuna and a Charaka

And you have effected more The theoretical study of chemistry has impelled you to it's application to the natural resources of the country and the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works is a living testimony to what un-aided Indian Science and business

organisation can accomplish

In the evening of your life Sir, when men seek for rest and repose you have preferred to remain in harness, to make the torch of Science you lighted a generation ago, burn steady and clear! May the College of Science and the cause of chemical research profit long by your untiring zeal! May many more and yet many more groups of eager investigators be sped on this path with your blessing! And may we, Sir, the present students of the Presidency College and our successors, occupy a warm corner in your loving and capacious heart!"

(Life and Experiences of a Bengali Chemist-- P.C.Ray. Vol-I. pp 188-189)

Reply of Sir P.C. Ray

Mr. President my esteemed collegues and young friends:

I hope I shall be pardoned if I fail adequately to give expression to my pent-up feelings---so much I feel and overpowered at the kind words, nay, eulogistic terms in which you have been pleased to refer to me. I know I should make due allowance for them, for on an occasion like this you are apt to over indulgent and forgiving to my many failings and short comings and equally prone to lay undue stress upon my good points, if you been able to discover any However, let that pass Gentlemen, I have often regarded it as a divine dispensation that my dear friend and distinguished colleague (pointing to Sir J.C Bose) and my humble self should have been working side by side for close upon thirty years, each in his own department, cheering each other up, through evil report and good, and I trust that the fire which it has been our lot dimly to kindle will be kept burning on from generation to generation of our students, gaining in brilliance and volume and intensity till it will have illumined the whole of our beloved motherland. Perhaps some of you may be aware that I have never cared to set much store by what are ordinarily called worldly effects or possessions. If, however any one were to ask me what treasures I have piled up at the end of my career at the Presidency College I would answer him in the words of Cornelia of old You have all heard

of the story of the Roman matron how on one occasion a patrician lady had called on her and was displaying with vanity her ornaments and jewels and how when she asked Cornelia in turn to bring forth her own jewellery she (Cornelia) begged to be allowed to postpone her exhibits for a time and patiently waited till the return of her two sons from school Then pointing to her boys (famous afterwards as the Gracchi) with conscious pride she exclaimed, "These are my jewels" I should also Cornelia-like point to a Rasik Lal Datta a Nilratan Dhar a Jnanendra Chandra Ghosh a Jnanendra Nath Mukherjee to mention the names of only a few representatives of the devoted band of workers who have gathered round me from time to time Gentlemen in my article on the "Reflections on the Centenary of the Presidency College" in the current issue of your College Magazine I have tried to bring home to you the noble part which our great institution has played in the making of new India I hope it will be yours to keep up its glorious traditions

Gentlemen, it is impossible for me to think that I am severing my connection with the Presidency College all my cherished associations are entwined round it --every nook and corner of the Chemical Laboratory, even the vey brick and mortar is redolent of fragrant memory When I further recollect that as a boy I was for four years a student of the Hare School which is only an affiliated feeder of the parent institution and that I was a student of the science department of the College for another four years it will readily be seen that my connection with your College extends to a period of thrity-five years and it will be my dying wish that a handful of my ashes should be preserved somewhere within the hallowed precincts of your academy Gentlemen, I am afraid I have gone beyond the limit within which I intended to confine myself I thank you once more from the bottom of my heart for your fine address, and I assure ysou that the memory of to-day's function I shall cherish to the last day of my lilfe

(Life and Experience of a Bengali Chemist-- P C Ray Vol-I pp 190-191)
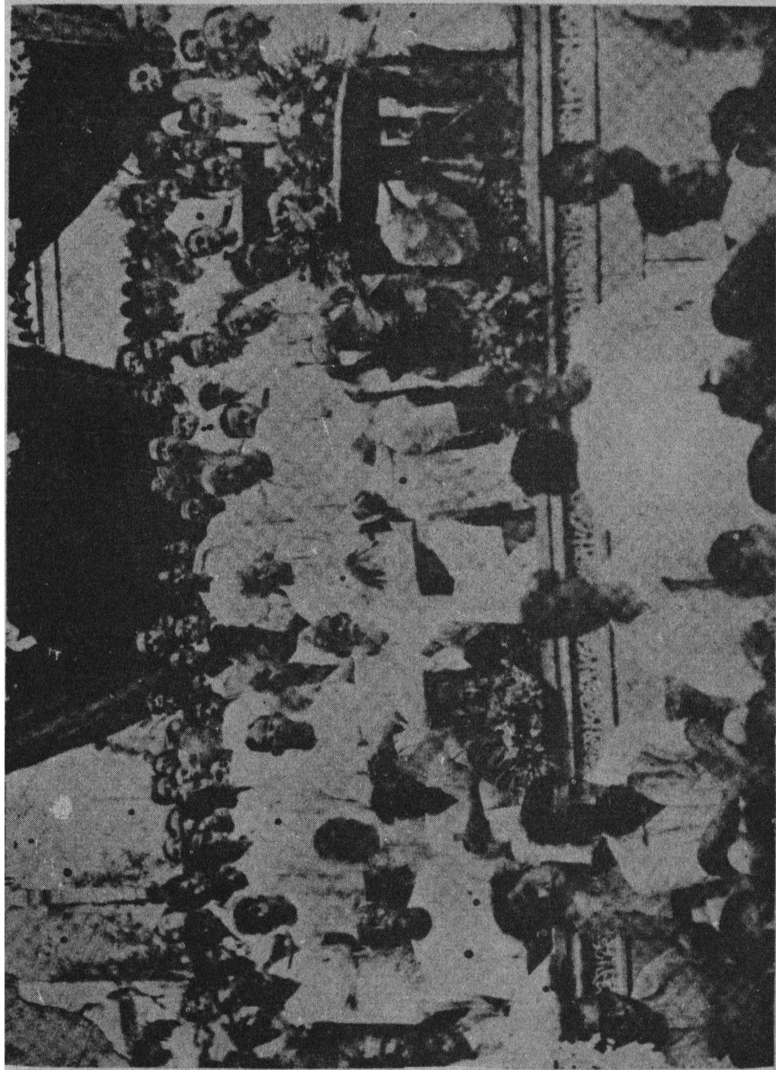
জন্মভূমি রাড়ুলীতে অন্তিম অভিভাষণ (২৪শে এপ্রিল ১৯৪৩)

সৌজন্যে· শ্রী দুলাল ব্যানার্জী

জন্মভূমি রাড়ুলীতে প্রফুল্লচন্দ্রের অন্তিম অভিভাষণ

(প্রবাসী, ১৩৫০)

"আজ জীবন সন্ধ্যার উপকূলে এসে হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাবার ইচ্ছা হ'ল, সেই কোন সুদূরে ফেলে-আসা শৈশবের সোনার দিনগুলির কথা, আজ আমার একান্ত নিভৃত নির্জন চিন্তার মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়ে আমাকে চকিত আহ্বানে জানিয়ে দিয়ে যায়,— ঐ দূর নীলিমার অস্ফুট বারতা। আজ আমি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসেছি, পৃথিবীর বন্ধন ও মমতা, হাসি ও গান—সব কিছু আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে। আমার সুদীর্ঘ জীবনে এতটুকু বুঝেছি যে— আমি এই ধরণীকে ভালোবেসেছি, ভালোবেসেছি আমার দেশকে ও জাতিকে, ভালোবেসেছি আমার প্রিয় জন্মভূমিকে। তোমরা হয়ত জানো না, কিসের মায়া আমাকে এই বঙ্গের নিম্নভূমির জল-জঙ্গলে টেনে এনেছে। ঘাটে ঘাটে তরী বেঁধে বর্ষা বসন্তের দিনমান কাটিয়েছি তোমাদের সুখ-দুঃখের সহিত, আমি সুদীর্ঘ দিন জড়িত আছি,— তোমাদের ব্যথা ও বেদনা আমার বিগত কর্মবহুল জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অশান্তি এনেছে,— তোমাদের উৎসব ও আনন্দ আমাকে আশান্বিত করেছে। জানি, এই বন্ধন একদিন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সেদিন আর বেশী সুদূরে নয়।"

২৪শে এপ্রিল ১৯৪৩ সালে রাড়ুলীতে প্রদত্ত ভাষণ

আচার্যদেবের একটি অতি প্রিয় উক্তি

।। সর্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম ।।

(সর্বত্র জয় অনুসন্ধান করিবে, কিন্তু পুত্র এবং শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে।)
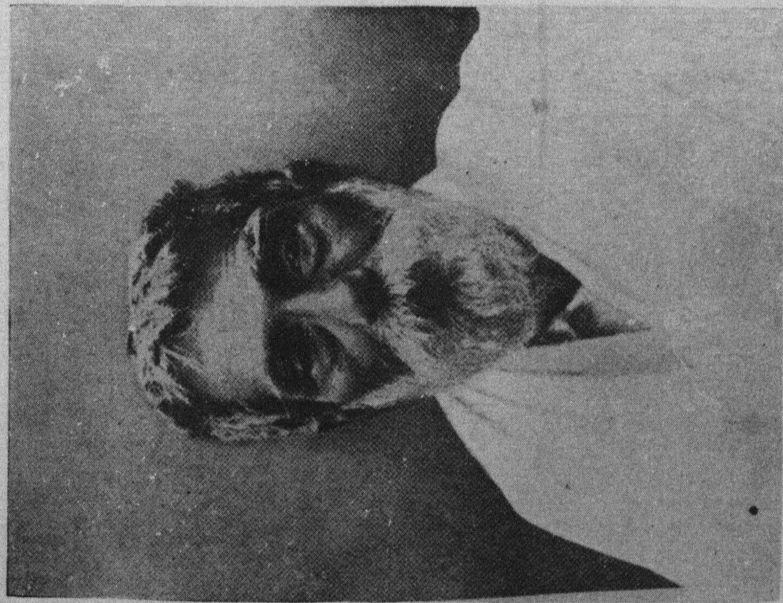
আচার্যদেব (১৯১৯)

আচার্যদেব

শেষ নমস্কার

।। The Calcutta Municipal Gazette ।।

PRAFULLA CHANDRA RAY

-' When thou comest into this world thou criest while the world laughs in gladness of heart So live and so work that when the time for departure from the field of thy mundane activitics come thou mayest leave it with a smile on thy lips with gladness in thy heart and the world weeping in grief

A poet-saint of India of the Middle ages indicated for man this standard of conduct this fulfilment of life's destiny ever in the Great Taskmaster's eye One in ten millions can satisfy this test Acharyya Prafulla Chandra Ray was one of those very few He has gone from amougst us We weep for him

Because he had so lived amongst us and so worked for us that our life was the better for it He brought the message of hope and promise of abundance into many a home He breathed into many a scholar a new spirit of unceasing quest to seek to strive and not to yield Prafulla Chandra could so live and work because he shaped himself in the mould formed by the makers of New India Those were the days when India was getting over the shock of her first impact with the West She had had placed in her hands proofs of the glories of her past A more intimate knowledge of the habits of life and thought of the Western world enabled her to start comparison between these and her own A comparative study showed her that she need not be an apologist when confronted by Western standards and values of life This was the period when national self-respect was beginning to be re-gained national self-confidence re-won

A child of this Time Spirit Prafulla Chandra by his study and research put into the hands of his people concrete proofs that in the arts and sciences of life India of the past had been a pioneer and path-finder to the world when it was younger That revelation led logically to activities that would enable India of the present to play her great part in the evolution of modern life in a world which Science has been making smaller erasing distances in space and bridging over rivalries in thought This aspiration is the key to the understanding of the life and conduct that was incarnated in the

founder of the pioneer school of chemists in India.

Acharyya Prafulla Chandra was a scholar and a recluse by the necessities of his work But the law of his being drew him into the market-place of affairs. He was the inspiration behind all the activities that strove to build a better material life for the commonalty of his people. He found, therefore, nothing irreconciliable between modern industrialism and the cottage industries that had once made the wealth of India', and as a symbol of which *Khadi* stands today It was because he wanted to make wealth more common that he threw himself with such zest into all constructive work This took him to the humble dwellings of the peasant, who, to the majority of our modern educated men and women, represented an age that has lost all use for them But to this doyen and prince of scholars, The "Man with the Hoe" was the corner-stone of India's life And help to him in famine and flood constituted the greatest service to India.

Inspired by these ideals Prafulla Chandra lived a dedicated life--a life of purest idealism There was no place for 'Self' in it For the happiness of the many he sacrificed all earthly gains and comforts, he lived the life of an ascetic, caring nothing for sensual pleasures, nothing for praise or promotion--giving up his all in his ministry to mankind It was spontaneous self -giving This gift and the sublime simplicity of his life gave him a seat in the hearts of his fellow-countrymen which few had occupied before

This is the son whom India mourns today--a man who held aloft the banner of her dignity To this man of science, to the memory of this servant of man, to this great lover of India, we offer our tribute of tears in unison with millions in his and our Motherland

The Calcutta Municipal Gazette [Editorial] (P.C.Ray Memorial Supplement)

24th June 1944.

।। আনন্দবাজার পত্রিকা ।।

দীপনির্বাণ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের লোকান্তর ঘটিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় প্রতিভা ও মনীষার যে দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিয়াছিল বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়া তাহার শেষ দীপশিখা নিবিয়া গেল। রাজনীতিতে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, ধর্মে, কর্মপ্রেরণায় বাঙালীর ধীশক্তি, কর্মশক্তি ও চরিত্রশক্তির এই অভাবনীয় দীপ্তি সারা ভারতবর্ষকে আলোকিত করিয়া বিশাল বিশ্বে সঞ্চারিত হইয়াছিল। নাম করিতে হইলে একত্রে বহু নাম করিতে হয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ প্রভৃতি মনস্বীমণ্ডলের মধ্যে কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম করিব? ইঁহাদের সম্মুখে সমগ্র ভারতবর্ষ অবনত হইয়াছে; ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার শাশ্বতরূপ ইঁহাদের মধ্যে পরিমূর্ত হইয়াছে; বিশ্ববিদ্বৎসভায় ইঁহারা কেহ যেখানে দাঁড়াইয়াছেন, শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে সকলে ভারতের শ্রেষ্ঠতা, স্বীকার করিয়া লইয়াছে। যুগপৎ এতগুলি মনীষার বিকাশ সহসা কোথাও সম্ভব হয় না। বাঙালীর কোন্ ভাগ্যগুণে অথবা বহু পুরুষার্জ্জিত কোন সাধন শক্তির বলে ইহা সম্ভব হইয়াছিল জানি না।

বাঙালীর ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হইয়া এই যে অপূর্ব দীপাবলীর উৎসব সাজাইয়াছিলেন, তাহার শেষ দীপশিখার পরিনির্বাণ আজ সাশ্রুনয়নে বসিয়া দেখিতেছি। দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে আশ্রয় দিবার, উপদেশ দিবার যাঁহারা ছিলেন, আজ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের সহিত তাঁহাদের ধারা শেষ হইল। বাঙালীর প্রতি সংসারের প্রত্যেকজন যাহাকে একান্ত আপনার বলিয়া ভবিতে শিখিয়াছিল, যাঁহাকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল, জাতিধর্মনির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতার পরমাত্মীয় সেই মহাপুরুষ সকলকে কাঁদাইয়া বিদায় লইলেন। সুদীর্ঘ জীবনের দেশসেবা ও জনসেবা উদযাপিত হইল।

প্রবন্ধ রচনার সময়েও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পবিত্র দেহ বহ্নিসাৎ হয় নাই। তাহা তাঁহার জীবন সাধনার পরিণতি ও কর্মসাধনার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে প্রশান্ত মূর্তিতে শয়ান রহিয়াছে। মহানিদ্রায় প্রসুপ্ত সেই শান্ত স্থির মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া বাঙলার গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস যেন এক নিমেষেই পাঠ করিলাম। বাঙালী সমাজের ২।৩ পুরুষ আচার্যদেবের সম্মুখেই গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারাই পদতলে বসিয়া জ্ঞানে ও কর্মে শিক্ষালাভ করিয়াছে। তাঁহারই চক্ষের উপর নব্য বাঙলা সৃষ্টি হইয়াছে এবং তিনি নিজেই অন্যতম স্রষ্টারূপে বাঙালীর নবজীবন গঠন করিয়াছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন উহার ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রম করিয়া জাতীয় সাধনার প্রতীক ও প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার অভাব জাতির পক্ষে একটা বিরাট ও বহু কর্মময় প্রতিষ্ঠানের অভাবেরই তুল্য। বহুমুখী কর্মপ্রেরণা তাঁহার জীবনের মধ্যে সম্মিলিত হইয়া উহাকে যে অপূর্ব রূপ দান করিয়াছিল তাহার তুলনা নাই। তাহা পূরণ করিবারও কোনো উপায় নাই। জীবনের এই অপরিসীম বিস্তৃতি প্রথম হইতে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই হয়তো সঙ্কীর্ণ সাংসারিক সম্বন্ধের মাত্রা তিনি সহজেই এড়াইয়া গিয়াছেন। বৃহত্তর সমাজকে একান্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহারই সেবায় আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন। পুরাকালের ভারতে একদা যিনি স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল কামনায় আপনার ব্যক্তিগত সকল আকাঙ্ক্ষা বলি দিয়াছিলেন সেই কুরু পিতামহ ভীষ্মকে স্মরণ করিয়া আজিও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকে। সংসারে থাকিয়াও সংসারত্যাগী চিরকুমার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের মহাসমাপ্তির দিকে চাহিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেই যেন উপলব্ধি করিতেছি ভারতবাসীর শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে তিনিও অনুরূপ আসন অধিকার করিবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা (সম্পাদকীয়) রবিবার ৪ঠা আষাঢ় ১৩৫১ ১৮ই জুন ১৯৪৪

।। প্রবাসী ।।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গৌরবদীপ্ত জীবনের অবসানে উনবিংশ শতাব্দীর সহিত বাঙালীর শেষ যোগসূত্র ছিন্ন হইল। পরিণত বয়সে তাঁহার পরলোকগমনে শোকের কারণ নাই, কিন্তু এই একটি জীবনদীপ নির্বাণে বাংলার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীর, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, দেশপ্রেমিকের তিরোধান ঘটিল। দেশের এ ক্ষতি পূরণ হইবার নয়। আচার্যদেবের পূণ্য জীবন মহামানবের প্রতি অসীম করুণাবারি অকাতরে বর্ষণ করিয়াছে, মিতব্যয়ী বিলাসবাহুল্যবর্জিত সরল জীবনযাত্রার নামমাত্র প্রয়োজন মিটাইয়া তাঁহার অর্জিত সকল অর্থ পরহিতব্রতে অর্পিত হইয়াছে। ১৫ বৎসর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে রসায়নের অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন, তাঁহার বেতনের সমুদয় অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যই এই অর্থ ব্যয়িত হইতেছে।

ইহা ভিন্ন কত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অনাথাশ্রম, দরিদ্র ছাত্র এবং অসহায়া নারী ও শিশু যে তাঁহার প্রদত্ত অর্থে উপকৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি "সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরের ভারতবর্ষ" নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া সেখানেই তাহা প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের অনেক মনীষী উহার প্রশংসা করেন।

ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রে তাঁহার গবেষণা অতুলনীয়। তাঁহার "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" এবং "রসার্ণবম" গ্রন্থদ্বয় প্রগাঢ় মনীষা ও সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করিতেছে।

সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে তিনি যৌবনেই যোগদান করেন। এ বিষয়ে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যে তিনি আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে ব্রাহ্ম আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। শেষজীবনে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষক দল সৃষ্টি আচার্যদেবের সর্বপ্রধান কীর্তি। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই আজ বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজকে তিনি স্বীয় আবাসগৃহ করিয়া লইয়াছিলেন। বিজ্ঞান কলেজকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসিতেন, সেখানেই তিনি থাকিতেন এবং এই কলেজ গৃহেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পূণ্যস্পর্শে বিজ্ঞান কলেজ সমগ্র ভারতের বিজ্ঞানীদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

এদেশে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগেরও তিনিই পথপ্রদর্শক। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস তাঁহারই সৃষ্টি। বাংলাদেশের বহু রাসায়নিক এবং অপর শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁহার পরামর্শ ও উৎসাহ লাভ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বিপদের দিনে তাঁহারই সাহায্যে অনেকের অস্তিত্ব রক্ষা হইয়াছে।

মানবসেবাব্রতে আচার্য্যদেবের তুলনা বিরল। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গের বন্যায় ৬০ বৎসর বয়স্ক এই বৃদ্ধের অদ্ভুত কর্মশক্তি দেখিয়া মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন — মহাত্মা গান্ধী আর দুইটি পি.সি. রায় তৈরি করিতে পরিলে এই বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ করিতে পারিতেন।

পূণ্যশ্লোক এই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

'প্রবাসী' (সম্পাদকীয়), শ্রাবণ, ১৩৫১

॥ **The Modern Review** ॥

ACHARYA PRAFULLA CHANDRA RAY

Acharya Prafulla Chandra Ray, the last of the intellectual giants of Bengal, has passed away in Calcutta at the ripe age of 83. A Scientist of the highest order, he was also an educationist a patriot a Social reformer His whole life was dedicated to the cause of suffering humanity The heart of this celebrated scientist flowed with the milk of human kindness He lived a single life and gave away in charities whatever money he had earned The Calcutta University was the recipient of a princely gift of over two lakhs from him On Acharya Ray having signified his intention of vacating the Chair of Palit Professor of Chemistry on the completion of his 60th year in 1922 the Senate requested him to continue for another five years in the interests of research He accepted the offer but desired that his salary from the above date onwards might be utilised for the expansion of the Department of Chemistry both General and Applied He finally retired from the Chair in 1937 and his salary for these fifteen years was funded Scores of educational institutions owed their continued existence to his munificence and hundreds of poor students had been able to build up a career through his silent Charities

He was a patriot from his student days While a research student at the Edinburgh University he published a small book *India Before and after the Mutiny* which created quite a stir in England The Scotsman took notice of this book by an Indian student and Acharya Ray has proved to the world, in his History of Hindu Chemistry how advanced India had been in the field of chemical research before the dawn of Christian civilisation what Sir William Jones realised Acharya Ray proved He was a Sanskritist of high order The Rasarnavam edited by him in 1908 was published in the Bibliotheca Indica of the Asiatic Society of Bengal which has been cherished by students of Hindu Chemistry all the world over

He had joined the Sadharan Brahmo Samaj There he had found the most suitable platform for throwing himself heart and soul in the social service activities He rose to be President of that Samaj

He was a force in the Brahmo movement all through his life he has bequeathed half of his remaining property to the Sadharn Brahmo Samaj in his last will

Acharya Ray's services to the cause of scientific research in India are well-known His laboratory was a nursery for the foremost scientists of modern India He prized the reputation of his pupil more than his own It was his usual practice to publish research papers under the joint authorship of himself and his pupils This proved to be a great encouragement to the young students and stimulated their spirit of research, and thus he may truly be called the Father of Scientific Research in India At the invitation of Sir Asutosh he had joined the University as the first University professor of Chemistry. In 1916, after the foundation of the University College of Science, Acharya Ray was appointed Palit professor of Chemistry He loved the Science College, he lived in the Science College and he breathed his last at the premises of the Science College. The presence of this venerable Guru had sanctified the Temple of Science and had made it a place of pilgrimage

Acharya Ray believed that science should be utilised as a ready handmaid to industry To translate this idea into action, he founded the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, One of the foremost Chemical manufacturing concerns of India today He was also intimately connected with a whole host of other industrial works Many of the industrial enterprises of Bengal had received his disinterested guidance and help in the early struggling periods of their existence. It was a purely patriotic motive that impelled him to apply his knowledge of chemistry to the cause of industry

Acharya Ray had a dynamic personality and was a very active worker till only a few years back During the North Bengal Flood of 1922, when he was sixty, a correspondent of the Manchester Guardian while giving a vivid account of his relief work in the North Bengal floods, stated that he had heard a European saying "If Mr Gandhi had only been able to create two more Sir P C Rays he would have succeeded in getting Swaraj within this year" Acharya Ray has himself said "If anyone were to ask what period of my life has been most active I would unhesitatingly answer From sixty

onwards During this space of time I have toured throughtout the length and breadth of this vast peninsula at least 200 000 miles in opening exhibitions, national institutions and preaching the gospel of Swadeshi Throughout the last 21 years of my life it has been my custom to spend on an average a couple of hours in the maidan in all seasons of the year which practically does away with the necessity of recouping my energies by an exodus to the hill stations" In his life the truth of Goethe's great saying has been fully realised "Time is infinitely long, if we use it fully most things can be got within its compass"

The Modern Review(Editorial) July 1944

।। শনিবারের চিঠি ।।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ মাত্র এই বাইশ বৎসরের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া বঙ্গমাতার যে কয়জন সুসন্তান রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের চিন্তা ও সাধনাকে স্থায়ী ও কার্য্যকরী রূপ দিয়া বিশ্বের দরবারে স্বদেশ ও স্বজাতিকে চিরসম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা সংখ্যায় খুব নগণ্য ছিলেন না: আচার্য জগদীশচন্দ্র (১৮৫৮) হইতে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯) মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ প্রভৃতি নামের সমারোহ। পৃথিবীর যে কোনও দেশে যে কোনও জাতির মধ্যে এতগুলি কৃতীপুরুষ এত অল্পকালের ব্যবধানে অর্থাৎ প্রায় একসঙ্গে কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রায় সব কয়টিই একে একে নির্বাপিত হইয়াছেন। বাঙালী জাতির সাম্প্রতিক মনীষাদৈন্য ভয়াবহরূপে প্রকট করিয়া শুধু চারিজন চারি দিকপালের মত স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে স্ব স্ব মহিমায় শেষ পর্যন্ত বিরাজমান ছিলেন, ধর্ম্ম ও সাহিত্যর ক্ষেত্রে অরবিন্দ, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্র, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ এবং পলিটিক্স ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সরোজিনী নাইডু। গত ২রা আষাঢ় (১৬ই জুন) তারিখে ঠিক চিত্তরঞ্জনের তিরোধান দিবসে কর্মী ও মনীষী প্রফুল্লচন্দ্র বিদায় লইলেন। বাকী যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের সহিত বাঙালী জাতির কর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ যোগ নাই-, অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুতে বাংলাদেশের হৃদয়বরেণ্য সর্বজনমান্য শেষ মহদাশয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিল। বাঙালী সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হারাইল।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন চমকপ্রদ হইলেও শিক্ষাপ্রদ, তাঁহার জীবন আদর্শ জীবন। বিদ্যাসাগরের পর এত বড় আদর্শ গৃহীজীবন আর দেখিতে পাই না। সৌভাগ্যের বিষয়, নিজের জীবনী তিনি স্বয়ং বিস্তৃতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার জন্য আমাদিগকে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা এবং কর্তাভজা ব্যক্তিদের অলৌকিক গালগল্প হাতড়াইয়া ফিরিতে হইবে না। প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন 'প্রদীপ'- সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রফুল্লচন্দ্রের একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিয়া নিজের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। মহাপুরুষের সেই প্রথম জীবনীটিও Acharyya Ray Commemoration Volume (Calcutta, 1932) -এ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আচার্য রায়ের সপ্ততি বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে যে জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়, তাহারই উদ্যোক্তাগণ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্নের সভাপতিত্বে এই চমৎকার পুস্তকটি প্রকাশ করেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য জগদীশচন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, Dr F G Donnan Dr M O Forster Dr Gilbert J Fowler, রায়বাহাদুর হীরালাল, ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, Dr A R Normand Dr J L Simonsen প্রভৃতি সংক্ষেপে প্রফুল্লচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার ও কীর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র যে কত বৃহৎ ও মহৎ ছিলেন, এই একটি মাত্র স্মৃতিগ্রন্থে তাহার সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়ন বিজ্ঞান-ঘটিত দান পৃথিবীর সর্বদেশের বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসের দ্বারা প্রাচীন ভারতের মহতীকীর্তি পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, তিনি এই বিভাগে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন শুধু নিজের দানের দ্বারাই নয়; শিষ্য-প্রশিষ্য সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার যে আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, বিজ্ঞানানুশীলনকে যে স্থায়ী মর্য্যাদা দিয়াছেন, তাহাই তাঁহার চরম কীর্তি হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষের আর কোনও বৈজ্ঞানিক নিজেকে এভাবে বিলুপ্ত করিয়া শিষ্যসম্প্রদায়ের কীর্তির মধ্যে বাঁচিতে চেষ্টা করেন নাই। প্রাচীন ভারতে ঋষি-গুরুর গোত্রে গৌরবান্বিত শিষ্যেরা যে ভাবে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, আচার্য রায় গোত্রীয় বৈজ্ঞানিকেরা তেমনই আজ সারা ভারতবর্ষে খ্যাতি ও মহিমা অর্জনের দ্বারা গুরুকেই জয়যুক্ত করিতেছেন; ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা পৃথিবীর দরবারে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্যবসায়ে বাঙালীকে প্রতিষ্ঠা দান করিবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনা ও উদ্যম তাঁহার অন্য স্মরণীয় কীর্তি। বাঙালী আজ ঔষধের কারবার, বস্ত্রের কারবার, তৈল-ঘৃত-দুগ্ধের কারবার করিয়া জাতীয় সম্পদ যতটুকু বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে, আচার্য রায়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনা

তাহার প্রায় সবটুকুরই মূলে। একমাত্র চাকুরিজীবী পরাধমুখাপেক্ষী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীকে ব্যবসায়ের পথ দেখাইয়া প্রফুল্লচন্দ্র একরূপ নবজীবন দান করিয়াছেন। আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালী যদি কোনও দিন স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, প্রফুল্লচন্দ্রকে সেদিন তাঁহারা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতে বাধ্য হইবে। তাঁহার একার চেষ্টায় বাঙালী জাতির জীবন ও কর্ম্মের আদর্শ যে অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইতিহাস একদিন তাহার সাক্ষ্য দিবে।

আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবাকাজে তাঁহার নিজের অক্লান্ত চেষ্টা ও অযাচিত দান যদিও বা কোনদিন আমরা বিস্মৃত হই, এই কাজে বাঙালী তরুণ সম্প্রদায়ের সংগঠন-শক্তিকে উদ্রিক্ত করিয়া তিনি যেভাবে বারংবার নানা বিপদের মধ্যে দেশকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইতিহাসের পাতা হইতে তাঁহার সে কীর্ত্তি কোনও দিনই মুছিবে না। একমাত্র তাঁহারই আদর্শে ও চেষ্টায় আর্ত্তসেবার কাজ একটা জাতীয় কাজে পরিণত হইয়াছে। বাঙালীর সেবাধর্ম্মের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র চিরজীবিত থাকিবেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশবাৎসল্য ও স্বজাতি প্রীতি তাঁহাকে চিরকাল সর্বসাধারণের বরণীয় ও আদরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি যখন বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে এডিনবরায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই India before and after the Mutiny পুস্তকে দেশের পরাধীনতা ও দুরবস্থার জন্য তাঁহার অন্তরজ্বালা প্রকট হইয়া ওঠে। দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর ব্রতে সায় দিয়া তিনি খদ্দরবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বদেশী ও খদ্দর প্রচারে বিরত থাকেন নাই। বাঙালী জাতির মস্তিষ্কের অপব্যবহার দেখিয়া তিনি যৌবন কাল হইতেই মর্মাহত ছিলেন এবং ভারতবর্ষে বাঙালীকে প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার সরলজীবন, অমায়িক ব্যবহার এবং অশনে বসনে অনাড়ম্বরতা তাঁহাকে উচ্চ-নীচ সকলেরই আপনার করিয়াছিল। তাঁহার দেশহিতৈষিতা সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র বাঙালী জাতি আত্মীয়-বিয়োগের বেদনা অনুভব করিতেছে। সেই বেদনা আরও মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অনুরূপ আর কেহ আশে পাশে নাই বলিয়া। বাঙালী যদি কোন দিন মানুষ হইয়া উঠে, সেদিন প্রফুল্লচন্দ্রের নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ রাখিয়াই তাহারা তাঁহাকে অন্তরের পূজা নিবেদন করিবে—

বাঙালী আজিও সচেতন হইল না। বারবার একই কথা বলিতে বলিতে আমার জিহ্বার জড়তা আসিল, দুঃখদুর্দশার একই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইল। আমার যৌবনের শক্তি বার্দ্ধক্যের জড়তায় বিলীন হইতে বসিল-বাঙালী কিন্তু জাগিল না। আমার মুখে একঘেয়ে নিন্দাবাক্য শুনিতে শুনিতে লোকে আমার প্রতি বীতরাগ হইয়াছে। বাঙালী-নিন্দুক বলিয়া আমার অখ্যাতি রটিয়াছে,

নানা ভাবে নানা উপহাস - বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। আমি সঙ্কীর্ণমনা এমন কথাও যে দুই একজন না বলিয়াছেন তাহা নয় তবু আমি দুর্মুখের মত কথা বলিতে ছাড়ি নাই। সেকি বাঙালীকে ঘৃণা করি বলিয়া? আমি বাঙালী, সুজলা, সুফলা, বাংলা দেশকে আমি ভালবাসি। বাঙালী সবল হউক, সুস্থ হউক। আপনার পায়ে আপনি নির্ভর করিয়া দাঁড়াক, ইহাই আমি নিরন্তর কামনা করি। আমার এই আন্তরিক কামনাই আমাকে কটুভাষী করিয়াছে।

শনিবারের চিঠি (সংবাদ সাহিত্য): আষাঢ়: ১৩৫১

।। মাসিক বসুমতী ।।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

বাঙ্গলার শেষ সুবর্ণ-দেউটি আজ নির্বাপিত। জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক ত্যাগ ও কর্মে সমুজ্জ্বল জীবনের অবসান ঘটিল। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, আর্ত্তবন্ধু, দেশহিতব্রতী মহাপুরুষ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৬ই জুন অপরাহ্ণ ৬টা ২৭ মিনিটে বিজ্ঞান-কলেজ ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৩ বৎসর ৫ মাস বয়স হইয়াছিল। তিনি কেবল অধ্যাপকই ছিলেন না। ছাত্রদের বন্ধু ছিলেন। তাহাদের সুখ-দুঃখ তিনি নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করিতেন। নিজেকে বঞ্চিত করিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থ গরীব ছাত্রদের বিলাইয়া দিতেন। নিজের খাবারের ভাগ ছাত্রদের না দিয়া খাইতেন না। তাই তিনি এতগুলি উজ্জ্বল রত্ন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। সরকারের স্যার উপাধি দানের পরও দেশের লোক তাঁহাকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াই জানিত। আচার্য্যদেবের মন দেশের জন্য, দরিদ্রের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত।

কোথাও বন্যা হইল, দুর্ভিক্ষ হইল আচার্য্য বাহির হইয়া পড়িলেন ভিক্ষার ঝুলি হাতে। রোগশীর্ণ জীর্ণ শরীরে সে কি উদ্যম! যে কোন স্বদেশী প্রচেষ্টার জন্য তিনি অকাতরে দান করিয়াছেন। কত বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তবুও সাহায্যদানে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন বিজ্ঞানকে নিত্য ব্যবহার্য্য কার্য্যে না লাগাইতে পারিলে তাহার কোন সার্থকতা নাই। সৃষ্টি হইল বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। ভারতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ইহাই এখন বৃহত্তম।

তাঁহার স্বদেশ প্রেম ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিজ্ঞান-প্রেমকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। "বিজ্ঞান অপেক্ষা করিতে পারে কিন্তু স্বরাজ পারে না।" তাঁহার বিখ্যাত উক্তি। তিনি

নিজেকে অকৃপণ ভাবে দান করিয়াছেন পরার্থে। দরিদ্রের কষ্টের লাঘব, ছাত্রদের সুখ-সুবিধা, দেশবাসীর উন্নতি ইহা লইয়াই ছিল তাঁহার জীবন। এমন সহজ সরল অথচ শক্তিমান পুরুষ সত্যই দুর্লভ। বাঙ্গালা দেশের মাটীতে তিনি উপযুক্ত সার দিয়াছেন, উপযুক্ত বীজ ছড়াইয়াছেন। তিনি চাহিয়াছিলেন বাঙ্গালী নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখুক। ব্যবসা করুক। কল-কারখানা করুক। স্বাধীন হইতে হইলে পরমুখাপেক্ষী থাকা চলিবে না। বাঙ্গালা দেশ তাঁহার কাছে চিরঋণী থাকিবে। তাঁহার আত্মাকে তৃপ্তিদান করিতে হইলে তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্যসমূহ করিতে হইবে। তিনি যে দীপশিখা জ্বালিয়া গিয়াছেন, সে শিখা যেন নির্ব্বাপিত না হয়। সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবেই আমরা তাঁর অবিনশ্বর আত্মার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদানের অধিকারী হইব।

মাসিক বসুমতী (সম্পাদকীয়): আষাঢ়: ১৩৫১

।। Hindusthan Standard ।।

ACHARYA RAY

The greatest living man of Bengal is gone to his rest The last of the giants is fallen In the death of Acharya Prafulla Chandra Ray Bengal has suffered an irreparable loss And so has India It is true he has died full of years and honours But this is no consolation to us, for his very presence was a source of infinite inspiration to us And even in his old age and shattered health he never failed to respond to the country's call with all the warmth of enthusiasm that was his A patriot in every fibre of his being, he lived and worked for the people of the country, and the lowly and the down-trodden were his special care It may well be said of him that he merged himself in the people of the land, and his sympathies were as wide as humanity itself Prafulla Chandra lived the life of a sage and a saint The very breath of his life was sacred, for there was not the least tinge of selfishness in him And it has been truly said of him that he was a model of humility in greatness. Above all, his childlike simplicity was a thing of beauty and joy for ever The saint of Dakshineswar used to say that godliness is childliness, and the childlike simplicity of Prafulla Chandra was a proof of the abundance of godliness that was in him.

There was no lack of great men in Bengal when Acharya Prafulla Chandra was born. That was perhaps the most glorious epoch in

Bengal, the only other period comparable to it being that of Vaishnava Renaissance. It was a time when epochs were being made in every department of life, and Prafulla Chandra was certainly an epoch-maker in the truest sense. Every great man comes with a mission to fulfil, and Acharya Prafulla Chandra came with a mission that was noble and inspiring Science had made a tremendous progress all the world over, but in India it was all but neglected And it was the mission of Prafulla Chandra, along with his eminent contemporary Jagadish Chandra Bose, to give science its due place in the life of the country Between them they succeeded in this uplifting endeavour remarkably well. The original discoveries of both made a profound impression on the savants of the world That was not all however, for the greatest merit of Prafulla Chandra's scientific work was to give chemistry the much needed practical turn for the benefit of the common man in India. It was due to his zeal, energy and devotion that a School of Chemistry was founded, and it is well-known that his laboratory had for a long time been the only supply centre of Indian Chemist of recognized merit This work marks him out as a constructive genius of immense calibre and potentiality.

Prafulla Chandra was a man of Science, but science was not the be-all and end-all of his existance. He was great as a scientist- - in fact, he was one of the greatest scientists the world has produced- but his heart was as great as his intellect His fingures were always at the pulse of teh nation and the heart-bittings of the nation never failed to move him. Indeed, his heart always bitting unison with that of the country and it was thus that he was a true leader of the nation

The poverty of the masses agonized him. The miseries of the people tortured him The subjection of the country distressed him beyond measure And it is no wonder therefore that his heart was in tune with all the progressive movements in the country He was an apostle of the freedom movement, as is demonstrated by his famous declaration that "science can wait but Swaraj cannot." All his thoughts were centred in the country and whatever he did he did for the country and its people. Self had no place in his scheme of life A man of boundless charities, he earned not for himself but for the people. We bow to him with all the reverence of our heart May his sacred work and his sacred example inspire the

people for a long time to come with the will to dedicate themselves. self-effacced to the service of the country and humanity

Hindusthan Standard (Editorial): Calcutta, 18th June 1944

॥ **The Statesman** ॥

Sir Prafulla Ray

At a ripe age Sir Prafulla Ray has passed on, leaving to his admirers a multitude not only of his own people, memories of a man who served his generation, and coming generations, with great gifts of mind and character The salient facts of his career were set out in our news columns yesterday, where he was summed up as distinguished chemist educationist, industrialist, patriot and social reformer A great teacher, he was from a long succession of students at Calcutta's Presidency College and afterwards at its University, the affection that in India goes out to a teacher who by his skill, learning and devotion gets the best out of younger people and by his obvious concern for their welfare makes himself easy of access in their perplexities In his own special sphere he will perhaps be best remembered as the builder of a school of chemists who have gone far and wide to work for the new India He was a man of great charm, modest gentle, generous, eager always to stretch out a helping hand to the genuinely needy gently intolerant of the pretentions In all that he did he was a humanist, seeking human values The scenes in the streets of North Calcutta yesterday, as his body was carried to the burning ghat, were remarkable testimony to his hold on the feelings of people of all ages

The Sunday Statesman, (Editorial) Calcutta, June 18, 1944

।। দেশ ।।

প্রফুল্লচন্দ্র

দীপ নিভিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় প্রতিভা ও মনীষার যে দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের লোকান্তর ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শেষ দীপ-শিখা নির্বাপিত হইল। বাঙলার এই যুগকে বৈষ্ণব জাগরণের যুগের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে। রাজনীতিতে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, ধর্মে, কর্মপ্রেরণায় বাঙালীর ধীশক্তি, কর্মশক্তি ও চরিত্রশক্তির অভাবনীয়-দীপ্তি সারা ভারতকে আলোকিত করিয়া এই যুগে বিশাল বিশ্বে সম্প্রসারিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ প্রভৃতি মনস্বীমণ্ডলের প্রতিভার কাছে সমগ্র ভারতবর্ষ শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছে। ভারতীয় সাধনার শাশ্বত রূপ ইঁহাদের মধ্যে পরিমূর্ত হইয়াছে। যুগপৎ এতগুলি মনীষার বিকাশ সহসা কোন জাতির মধ্যেই সম্ভব হয় না। বাঙালীর ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হইয়া হইয়া এই যে অপূর্ব দীপাবলীর উৎসব সাজাইয়াছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে আমরা তাহার শেষ শিখা পরিনির্বাণ অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রত্যক্ষ করিলাম।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পরলোক গমনে জাতি হিসাবে বাঙালীর কি ক্ষতি ঘটিল, হিসাব করিবার সময় এখনও আসে নাই। ত্যাগময় তার কর্ম জীবনের বহুমুখীন প্রতিভার দীপ্তি বাঙলা দেশের সমগ্র সমাজে অপরিম্লান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছিল; প্রশস্তিমূলক কোন ভাষাতেই তাহার সম্যক রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। বিশেষত ভাবের যেখানে প্রভাব ভাষার গতি সেখানে রুদ্ধ হইয়া পড়ে। বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রধানত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। জগতের বিজ্ঞান সাধনায় তাঁহার অবদান সামান্য নয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে বিজ্ঞান সাধনায় নবযুগের তিনিই উদ্বোধন করেন। এ দেশের সমগ্র শিল্প সমৃদ্ধির মূলে প্রফুল্লচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। যন্ত্রচালিত শিল্প-সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রতিকারের নিমিত্ত প্রফুল্লচন্দ্র একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে সাধনা বৃথা যায় নাই। সে সাধনার একটা যুগ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে বলা যায়।

কিন্তু পাশ্চাত্যের তথাকথিত বিজ্ঞান সাধনা ও প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার মধ্যে আমাদের দৃষ্টিতে একটু পার্থক্য ছিল; বিশ্বের অন্তর্নিহিত উদার পরম সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্পর্কলাভ করাকেই ভারতবর্ষ বিজ্ঞান সাধনার স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে, প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা মানবের জীবনের মূলের এই সমন্বয়বোধের পরম সত্যের সঙ্গে

সংযুক্ত ছিল। বাঙালী জাতির আর্থিক উন্নতি সাধনের নিমিত্ত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সুমগ্র জীবন অতন্দ্রিত কর্মসাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন।

একদিক হইতে তিনি ছিলেন কর্মযোগী; প্রকৃত কর্মযোগী ও কর্মসন্ন্যাসী একই কথা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সংসারে থাকিয়াও অনাসক্ত সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সন্ন্যাসের দৈন্যহীন জীবনের তারুণ্য ও মহিমা অনুপম ছিল। পরহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত এমন পবিত্র জীবনের আদর্শ আধুনিক জগতে দুর্লভ ছিল। ত্যাগময় জীবনের এমন মহিমার কথা আমরা ভারতের অতীত পুরাণগাথাতেই পাঠ করিয়াছি। ভীষ্মদেব, দাতাকর্ণ, দধীচীর কথা শুধু শুনিয়াছি মাত্র; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রে অতীত ভারতের সেই ত্যাগময় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জীবন প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই। এ দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে সমবেদনার সূত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রাণের যেরূপ সুগভীর সংযোগ ছিল তাহার তুলনা হয় না; দরিদ্রের সেবাব্রতে তিনি তাঁহার জীবনকে সমগ্রভাবেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পরম সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ব্যতীত প্রেমের এমন বল জীবনে লাভ করা যায় না; এই দিক হইতেই প্রফুল্লচন্দ্র তত্ত্বদর্শী ছিলেন এবং তাঁহার জড় বিজ্ঞান সাধনার মূল ও অধ্যাত্ম-প্রেরণা প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেশের চিন্তায়, জাতির চিন্তায় বিভোর আত্মভোলা এমন সাধকের প্রভাবে বাঙালী জাতির, তরুন জীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছে; প্রফুল্লচন্দ্র সাহিত্যিক ছিলেন; বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি জীবনের সমগ্র সাধনার ভিতর দিয়া প্রদীপ্তি লাভ করিয়াছে; প্রফুল্লচন্দ্র জাতির উপদেষ্টা ছিলেন; তাঁহার পাদমূলে বসিয়া বাঙালী জাতির দুই তিন পুরুষ বিদ্যালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র তীব্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন; বিদেশীর কাছে ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি তাঁহার একান্ত বিরক্তি আমরা জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসাধনার মূলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; ঘৃণ্য-পরানুকরণ-স্পৃহার দৈন্য পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠার মহিমার কথাই তিনি আমাদিগকে শুনাইয়াছেন; সর্বোপরি ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের সহৃদয়তা। এ দেশের সকলকে তিনি আপনার করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার সে আত্মীয়তা শুধু মানসিক ভাববিলাস মাত্র ছিল না। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি মমত্ববোধের সে প্রগাঢ়তা বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছিল, প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাদেশিকতার প্রকৃত ভিত্তি ছিল এইখানে।

এ দেশের সমাজের সংস্কারসাধন তাঁহার জীবনের অন্যতম তপস্যা ছিল; কিন্তু তাঁহার সেই সংস্কার প্রবৃত্তির মূলে ছিল জাতিকে দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার অন্তরের একান্ত আকুলতা, পাশ্চাত্যের অনুকরণ স্পৃহা নয়। জাতির শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি জাতির উন্নতি কামনা করিতেন। এদিকে তাঁহার প্রকৃতিতে অনমনীয় একটা মর্যাদা বোধ ছিল এবং মর্যাদাবোধকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার স্বাদেশিকতা জাতির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য তাঁহাকে প্রণোদিত করিত। পরের দিকে

ডাকাইয়া ঘরের মহিমা তিনি কোন দিনই ভুলেন নাই।

তিনি সহরবাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার অভ্যস্ত সেই নাগরিক জীবন বাঙলার পল্লী-নিকেতনের আকর্ষণ হইতে তাঁহার প্রাণকে মুক্ত করিতে পারে নাই। বাঙ্‌লার জল, বাঙ্‌লার বায়ু, এবং বাঙ্‌লার মাটি তাঁহার দৃষ্টিতে চিরমধুর হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্‌লামায়ের এই বরেণ্য সন্তান তাহার সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া বঙ্গজননীর সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং সেবার সেই প্রবৃত্তি তাঁহার সমগ্র জীবনকে একান্তই নিরহঙ্কার ও অন্য-সক্ত করিয়াছিল। মহাদাদর্শে আত্মসমাহিত এমন তন্ময় মানুষ সর্বদেশে এবং সকল যুগেই অনন্যসাধারণ; বহুর চিন্তায় ইঁহারা নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকাইয়া দিয়া থাকেন অথচ বহুর বেদনাকে নিজের মধ্যে নিত্য করিয়াই ইঁহাদের ব্যক্তিত্ব সত্য হইয়া উঠে। জাতির সমষ্টি চেতনারই ইঁহারা জাগ্রত মূর্তি; ব্যক্তিগতভাবে নিজের বলিতে ইঁহাদের কিছুই থাকে না। প্রফুল্লচন্দ্র এমন একজন মনস্বী পুরুষ ছিলেন। ধন- অর্জন করিয়াও ধনীর জীবন গ্রহণ করেন নাই; জ্ঞানী হইয়াও জ্ঞানের গরিমা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; এ দেশের জনগণের জীবনের বেদনা তাঁহার মনন-মহিমাকে নিরন্তর উদ্দীপ্ত করিয়াছে এবং এ দেশের তরুণ সমাজ সেই উদার আদর্শ হইতে প্রাণময় শক্তির প্রেরণা লাভ করিয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্রের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এমন মহাপ্রাণ পুরুষের অগ্নিময় মর্ত্য জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাব হইতে জাতি বঞ্চিত হইল। কিন্তু রহিয়া গেল তাঁহার স্মৃতি। ত্যাগময় যাঁহাদের এমন জীবন, স্মৃতির মধ্যে তাঁহাদের সমগ্র শক্তি জীবন্ত থাকে এবং জাতির স্মৃতিমূলে তাঁহারা অমর জীবনের অমৃতময় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন; আজ মৃত্যুর পরপারে অমৃত লোকবাসী আদিত্যবর্ণ সেই আচার্যদেবকে আমরা পরম শ্রদ্ধাভরে বন্দনা করিতেছি। আমাদের অশ্রুধারায় তাঁহার জীবনের পরিপূর্ণ ত্যাগ মহিমা আমাদের দৃষ্টিতে সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠুক; আজ মৃত্যুর এই ব্যবধানের ভিতরেই আমরা তাঁহাকে যেন জীবনে অধিকতর সত্য এবং নিত্য করিয়া পাই।

'দেশ'(সম্পাদকীয়) ১১বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা, শনিবার ১০ই আষাঢ়, ১৩৫১, ২৪শে জুন ১৯৪৪

॥ **Amrita Bazar Patrika** ॥

ACHARYA PRAFULLA CHANDRA

A GIANT has fallen For about sixty years Acharya Prafulla Chandra Ray filled a large space in the life of a nation struggling with its ancient tenacity and against a handicap that the modern age has imposed upon it for survival, self expression and expansion of its proud heritage In science and literature in industries and humanities and in fact, in every human endeavour that enriches life and makes

it worth dying for Acharya Ray's. Contributions were as brilliant as his initiative was bold and overpowering In childhood he had fought against a weak constitution and he succeeded In youth he had struggled against prejudices and superstitions and he knew no defeat Of Acharya Ray it cannot be said as it has been said of a Roman conqueror that he came saw and conquered He did conquer but all time the struggle was fierce and the claims he put forward were hotly contested Steadily but surely all the academic honours came to him in this country His thirst for knowledge grew and then in one of the well-known British Universities he won the highest distinction by hard and painstaking work Once again his skin proved an obstacle Raw graduates of British origin got into the Indian educational Service for the mere asking The India office closed its doors against him and for about three decades until the last days of his educational career in Presidency College Prafulla Chandra languished in what they then called the provincial service created specially for academicians and scholars drawn from the sub-human Indian races

But the injustice of man in authority and their superiority complex could not take the shine and vigour out of his versatile mind To hundreds of enthusiastic and admiring young men he unravelled the marvels of Science Outside the class room he dedicated his life to enquiry investigation and research Professor Prafulla Chandra Ray soon became an institution His personality was one to reckon with His fame spread far and wide On retirement from Presidency College he found a larger sphere of work as Director of the Chemical Laboratories of the University College of science brought into being by Sir Asutosh Mukherjee and mainly financed out of the munificence of Sir Tarak Nath Palit and Sir Rash Bihari Ghosh For fifteen years the salary he drew was spent on improving the equipment of the laboratories and maintaining the Research Fellowships

To Acharya Prafulla Chandra knowledge was not a sealed book To him wisdom was not something which was profaned by the touch of the multitude Himself a faithful worshiper in the Temple of Learning he flung open the gates to eager and inquisitive minds and within a short time a school of science was built up and its foundations securely laid A tree they say is known by its fruits

Acharya Prafulla Chandra was known not only by his own personal achievements, which were so many and of such a diverse character, but by the labours of a large band of scholars and scientists who have made conquests in difficult and carefully Preserved domains

If there was any man in India's recent history to whom "plain living and high thinking" was a cult it was Acharya Prafulla chandra Nor was his interest confined to science In chemistry he has canned imperishable fame by a life's work which is immortal But his energy was dynamic His enthusiasm contagious and his sympathies wide and perhaps universal He talked about literature and wrote profusely on it He gave his time and attention to urgent social reform and his influence was magnetic In his leisure hours he was absorbed in quiet but deep reflections on the enormous resources of his countries ancient soil and the appalling poverty of the creative impulse The result was the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works which will go down in history as the standing monument to his initiative enterprise and resourcefulness

On politics which a famous writer in a moment of frustration called the last refuge of the scoundrels, he held strong views Sometimes he was uncompromising very often he came into conflict with the passing fashions and tests But his Judgement was unerring A devotee of science and a patron of learning he could not isolate himself from the currents of the political movements On a historical occasion he said that "researches can wait" that "industires can wait' but that "swaraj can not wait"

For Swaraj he fought and toiled It was not swaraj of the few over the many It was not the raj of the rich over the poor To Acharya Prafulla Chandra Swaraj was the fulfilment of the people's aspirations In modern context to quote President Roosevelt, it meant to him freedom from want, idleness and fear His love for the underdog was a passion and that passion had been the dominating motive force of such a great and eventful career

A whole nation mourns today the passing away of a saint, a seer, a pioneer and a benefactor of humanity Acharya Prafulla Chandra has died full of years and honours But the example he has set, the spirit of which his initiative has been the harbinger and the legacy he has left will abide for ever an inspiration to India in

bondage and a beacon to his fellowmen all over this accursed world, Acharya Prafulla Chandra has just missed a century but his has been a grand innings of which we are all proud. ..

Amrita Bazar Patrika (Editorial), Saturday, June 17, 1944

।। যুগান্তর ।।

পরলোকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লোকান্তরিত হইয়াছেন। গত কয়েকদিন হইতেই তাঁহার অবস্থা খুব খারাপ যাইতেছিল, চিকিৎসক মহাশয়দের ইস্তাহারে কোন আশার আভাষই পাওয়া যাইতেছিল না— তথাপি কেহই এই নিদারুণ শোকের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। যে কয়জন মুগ্ধকর পুরুষকে লইয়া আধুনিক বাঙ্গলার গর্ব্ব, তাঁহারা একে একে সকলেই গত হইয়াছেন— বাকী ছিলেন শুধু আচার্য মহাশয়। তাঁহাকেও যে এত শীঘ্র হারাইতে হইবে, একথা তাই মন বুঝিলেও অন্তর স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। জাতীয় গরিমার এই সর্ব্বশেষ প্রদীপটিকে তাই সকলেই সাগ্রহে উদ্বেগে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিতেছিলেন। মহাত্মাজী সেদিন তারযোগে আচার্যের শতবর্ষ আয়ু কামনা জানাইয়াছিলেন— এই কামনা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়কের মুখে সারা ভারতেরই হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। কিন্তু মানুষের কামনা, তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ের অক্ষম আকুলতা নিষ্ফল হইল— আচার্য তাঁহার গৌরবমণ্ডিত মহাজীবনের অবসান করিয়া অমর লোকে মহাযাত্রা করিলেন।

বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে যিনি সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার অসামান্য মনীষার নব নব অবদানে, দেশের চিত্তে যিনি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন জ্ঞান ও কর্মসাধনার , ত্যাগ ও প্রেমের অবতাররূপে, তাঁহার মৃত্যু নাই - স্মৃতির অমর্ত্ত্যলোকে অম্লান মহিমায় তিনি চিরজাগরূক থাকিবেন, একথা সত্য। কিন্তু তথাপি আচার্য্য রায়ের অন্তর্ধানে বাঙ্গলাদেশ যাহা হারাইল, তাহা কি আর পূরণ হইবে? অদ্বিতীয় প্রতিভা সম্পন্ন বিজ্ঞানী এদেশে আরো জন্মিয়াছেন, দেশ সেবক ও কর্মসাধনায় উৎসর্গীকৃত জীবন পুরুষও বাঙ্গলার ইতিহাসে দুর্লভ নয়- - শিক্ষাক্ষেত্রে ও বাঙ্গলার ইতিহাস ঐশ্বর্য্যে গরিয়ান কিন্তু সর্ব্ব শাখায় সমান সার্থক, সব কিছুর সমন্বয়ে সম্পূর্ণাঙ্গ প্রতিভারূপে আচার্য্য যে স্থান করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা ভারতে কেন, সমসাময়িক পৃথিবীতেই দুর্লভ। সেই দুর্লভ সম্পদ হারাইয়া বাঙ্গলা তথা ভারত

আজ নিঃস্ব হইয়া পড়িল— এ রিক্ততা শুধু রবীন্দ্র-বিয়োগের সঙ্গেই তুলনীয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের সকল দিক লইয়া আলোচনা সংবাদপত্রের নিরূপিত পরিসরে সম্ভব নয়। আমরা শুধু তাঁহার মনীষা ও ব্যক্তিত্বের যেটুকু অংশ অবশ্য জ্ঞাতব্য তাহারই উল্লেখ করিব। তিনি রাসায়নিকরূপে জগতে খ্যাতিমান ছিলেন কিন্তু কি কি বিশেষ আবিষ্কৃতি তাঁহার এই খ্যাতির মূল, তাহা অনেকেরই জানার সুযোগ হয় নাই। প্রথমতঃ এদেশে বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপ্তি নাই, দ্বিতীয়তঃ বঙ্গভাষায় এখনো যথোচিতভাবে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য গড়ে উঠে নাই, তাই আচার্যের বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তিসমূহ এখনো বিদ্বান সমাজেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। হিন্দু রসায়নের অদ্বিতীয় গৌরব পারদ সহযোগে রাসায়নিক জীবনের কৌশল ব্যক্ত করিয়া আচার্য্য বিশ্বের বিজ্ঞান ক্ষেত্রেই যুগান্তর আনিয়াছেন, একথা আমরা কয়জন জানি? কয়জন জানি যে ধাতুদ্রব্যের ধর্ম নিরূপণ বা ভেষজ পদার্থের বিশুদ্ধি পরীক্ষণের আধুনিকতম পদ্ধতি আচার্য্য রায়েরই আবিষ্কার? মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাহার এই সকল আবিষ্কৃতির মূল্য কতখানি, তাহার সত্যকার বিচার বিজ্ঞানীরাই করিতে পারেন। কিন্তু যে কোন বুদ্ধিমান্ লোকই স্বীকার করিবেন যে, মাত্র এই গৌরবই আচার্যকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতে পারিত। কিন্তু কেবলমাত্র বীক্ষণাগারের গবেষণা ও পরীক্ষা—নিরীক্ষাতেই অত বড় প্রতিভার পরিসমাপ্তি হইতে পারে নাই— জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে আচার্য কর্ম্মের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছিলেন এবং যে বিজ্ঞানকে তিনি বিদ্যারূপে পাইয়াছিলেন, তাহাকেই শক্তিরূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন বাস্তবের উন্নতির জন্য। বিজ্ঞানীরা সাধারণতই সমাজবিমুখ। তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব সাধনা লইয়াই তদগত থাকেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রের আহ্বান তাঁহাদিগের দ্বারে বৃথা করাঘাত করিয়া ফিরিয়া যায়। আচার্য্য সে আহ্বানকে ফিরাইয়া দেন নাই। দেশে বিবিধ রাসায়নিক উপকরণ উৎপাদন হইতে শুরু করিয়া, কৃষির উন্নতি বিধান, কলকারখানা ও শ্রমশিল্পের বিস্তৃতি পর্যন্ত সব ব্যাপারেই তাঁহাকে একক নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। আর এই কর্ম্মানুরাগও তাঁহার নিছক আত্মপ্রকাশের প্রেরণা হইতে আসে নাই, তাহার পশ্চাতে ছিল সুগভীর দেশপ্রেম।

এই নিরন্ন, হতভাগ্য, পরমুখাপেক্ষী দেশের বেদনা তাঁহার বুকে বাজিয়াছিল, তাই তাঁহাকে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ব্যবসায় বাণিজ্যে, শিল্পে সংস্কৃতিতে বড়করিয়া তুলিবার জন্য তিনি বিজ্ঞান লক্ষ্মীর অত্যুঙ্গ মন্দিরায়তন হইতে একেবারে পথের ধূলায় নামিয়া আসিয়াছিলেন।

এক হাতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন, আর এক হাতে একের পর এক করিয়া গড়িয়াছেন কত শিল্প প্রতিষ্ঠান, রসায়নাগার, বিদ্যানিকেতন ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু জ্ঞান গৌরবের মতো কর্ম্ম গৌরবকেও তিনি পরমার্থ মনে করেন নাই, তিনি ছিলেন সত্যকার বৈরাগী, কোন কিছুর মোহই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে বন্যা, মহামারী, দুর্যোগ-দুর্বিপাক, সেখানেই এই মহাপুরুষকে দেখা গিয়াছে নামের জন্য নয়, বক্তৃতা দিয়ে আসর মাৎ করিবার জন্য নয়, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে দ্বারে ঘুরিয়া সেবার দ্বারা, আশ্বাসের দ্বারা, বিপন্নকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহার সেই আত্মবিস্মৃত উদ্যম কে না দেখিয়াছেন? ইচ্ছা করিলেই তিনি একটা মস্ত নেতা হইয়া পড়িতে পারিতেন, কিন্তু সে দুর্বলতা তাঁহার ছিল না বলিয়াই তিনি সারা দেশের হৃদয়ে একচ্ছত্র নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে আচার্য ছিলেন চিরকুমার ব্রহ্মচারী, সমস্ত জীবনের অর্জিত বিত্ত তিনি অকাতরে দান করিয়াছিলেন দেশের জ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য। নিজে তিনি থাকিতেন বিজ্ঞান কলেজের দুইটি ঘর লইয়া এবং তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন দেখিয়া কেহ বুঝিত না, তিনি কে এবং কি। সরল অনাড়ম্বর আত্মবিস্মৃত এই চিরসন্ন্যাসীর সেই অনুপম জীবনও একটি আদর্শ। দেশ বিদেশের উচ্চ উপাধি তাঁহার মস্তকেই বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি ঈষৎ কৌতুক হাস্যের সঙ্গেই সেই সম্মানকে গ্রহণ করিয়াছেন ও তাঁহার বহু ব্যস্ত কর্ম জীবনের কোন একান্তে তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ জানিতেও পারে নাই। অর্দ্ধমলিন খদ্দরে দেহ ঢাকিয়া স্তূপীকৃত গ্রন্থের আড়ালে বসিয়া তিনি নিঃশব্দে আপনার কাজ করিয়া গিয়াছেন.... আবার প্রয়োজন হইলেই সব ফেলিয়া উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া গিয়াছেন ফুটন্ত কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে। পূর্ণ ৮৩ বৎসরের জীবনে কোন দিন কেহ তাহার ব্যতিক্রম দেখে নাই। এই দীর্ঘকালব্যাপী একনিষ্ঠ জীবনের উপর প্রথম ছেদ পড়িল তাঁহার চরম সমাপ্তিতে এবং ইহার সঙ্গেই আমাদের বিগত শতাব্দীর গরিমাময় ঐতিহ্যেরও সমাপ্তি হইল। এই সমাপ্তির প্রগাঢ় বেদনার মধ্যেও একমাত্র আশ্বাস এই যে, আচার্য তাঁহার পিছনে যে দিগ্বিজয়ী শিষ্যদল রাখিয়া গিয়াছেন (বাঙলার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা সকলেই তাঁহার ছাত্র) তাঁহাদের সাধনার মধ্য দিয়াই আচার্যের প্রভাব ও প্রতিভা চিরউজ্জ্বল, চির অম্লান থাকিবে। শিষ্যপরম্পরায় বাঁচিয়া থাকিবার কামনা আর্য কুলপতিরা করিতেন— আচার্য ছিলেন তাঁহাদেরি সর্ব্বশেষ প্রতিনিধি, তাঁহার সেই কামনাও অপূর্ণ থাকিবে না। আজ শোকদীর্ণ হৃদয়ে আমরা এই প্রতিভাধর আচার্য শিষ্যদের মুখের দিকে চাহিয়াই এই দেশগুরুকে বিদায় দিতেছি—"স্ব স্থানে যাও, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হও, তুমি মর্ত্যে আসিয়াছিলে ইহাকে অমর্ত্য সম্পদে ভূষিত করিতে।"

যুগান্তর (সম্পাদকীয়), শনিবার, ৩রা আষাঢ় ১৩৫১: ১৭ই জুন ১৯৪৪

॥ **Peoples' War** ॥

ACHARYA P. C. RAY

"Crusading Ardour of This Scientist -Patriot will live in countless others "

Acharya Prafulla Chandra Ray is dead India loses in him a pioneer of Chemistry and Chemical Industry in our country, a great teacher, an ardent patriot, and tireless servant of the people.

He was never an ivory-tower scientist Patriotism led him to the study of science His science he used for the service of the people Already in the eighties, when Prafulla was studying chemistry at Edinbargh, he was brooding over the poverty and the industrial backwardness of India In those days he wrote a remarkable essay on the economic condition of India, which attracted much attention

From 1888 to 1916 when he worked as professor in the Presidency College, he did his creative work for chemistry. His researches in the preparation of Mercurous Nitrite and his remarkable investigation into the beginings of Chemistry in India which were incorporated in his work "History of Hindu Chemistry" earned him world fame When in 1904, he revisited Europe, he was honoured as a great Indian chemist and Berthelot, the great french chemist, wrote an appreciable essay on his work

In India, he was the inspired teacher who fired his pupils not only with scientific zeal but with patriotic ardour to apply their science to the service for the people With loving care and patient work, he built up the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works---one of the first great Indian drug manufacturing concerns---which was both a marvel and an inspiration a precursor of a dozen chemical industrial concerns in Bengal

After 1916, the Acharya devoted more and more of his time to social and constructive activities In 1923, he threw himself, heart and soul, in the work of North Bengal Flood Relief It is through the task of rehabilitating the flood devastated villages of North Bengal that he came to be a campaigner for Gandhiji's Charka and Khaddar It was the Acharya who inspired the well-known Gandhian leader Satish Das Gupta---then his co-worker in Bengal

Chemical---to take up Khaddar work and helped him to found the Khadi Pratisthan in Bengal

But all these long he remained an inspired teacher of Chemistry living in his modest room in the University Science College---leading an extremely simple life---and donating his entire salary and income for Chemical research at the Calcutta University

The Acharya is dead, but He has left behind a whole band of talented chemist and selfless social workers The crusading ardour of a scientist---patriot--- that he was---will live in them and multiply in countless others---and enable them to realise his fond dream---a free and industrialised India ensuring a decent living for every man woman and child

Peoples' War: Vol. II, No. 52, Sunday, June 25, 1944(Special Report)

।। জনযুদ্ধ ।।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

গত শুক্রবার ১৬ই জুন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়েছে। তিরাশী বছর আগে, যখন বাংলাদেশ অনেক বিষয়ে অনগ্রসর ছিল, সেই অতীতেই আচার্য্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই অতীতের আবহাওয়ার মধ্যেও নতুন সাহসে ভবিষ্যতকে তিনি প্রগতি বলেই বুঝে নিয়েছিলেন। তাই প্রথম জীবন থেকেই হিন্দু সমাজের প্রাচীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমাজ সংস্কারকের সংগ্রাম তিনি শুরু করেছিলেন, জমিদারী জীবনযাত্রা প্রথার আরাম, অনাচার ও অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের গণ্ডিতে আবদ্ধ বাঙ্গালীকে তিনি শিল্পবিকাশের নতুন পথ ধরবার সাহস দিয়েছিলেন, পৃথিবীর কবিতা ও সাহিত্য শিক্ষার নতুন কল্পলোক থেকে তিনি দৃঢ় হস্তে বাঙ্গালীর মুখ ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও সৃজনের দিকে।

ভবিষ্যত একের নয়, ভবিষ্যত বহুর এ উপলব্ধিও তাঁর ছিল। তাই নিজে খুব বড় বৈজ্ঞানিক হব এ লোভ সংবরণ ক'রে বহু বৈজ্ঞানিক তৈরি করবার শিক্ষা-পরিকল্পনায় তিনি সর্বশক্তি ঢেলে দিয়েছিলেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন তাঁর মনকে কারও চেয়ে কম নাড়া দেয়নি। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করেছিলেন যে বাঙ্গালী জাতির যা নিজস্বশক্তি আছে তাকে আরও

শক্তিশালী করে তুলতে পারলে ভারতীয় জাতীয়তার শক্তিই বাড়বে, বাঙ্গালী আত্মনির্ভরশীল হবে, তাই বাঙ্গালীর জাতিগত দুর্বলতাকে যেমন তিনি নিষ্করুণভাবে বারে বারে আঘাত করেছেন, জাতি হিসাবে বাঙ্গালীকে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেও চেষ্টার তিনি কখনো ত্রুটি করেননি।

ভবিষ্যতের প্রগতি আর সমষ্টিগত মঙ্গল— এই দুই পথে তাঁর চিন্তা অগ্রসর হয়েছিল বলে সোভিয়েত দেশে মানুষের সমষ্টিগত প্রগতির দৃষ্টান্ত তাঁর মনকে টেনেছিল। সোভিয়েটের উপর হিটলারের আক্রমণ যখন এই প্রগতিকেই আক্রমণ করল তখন দেশের বড় বড় নেতাদের মধ্যে আচার্যই সকলের আগে এগিয়ে এসেছিলেন, এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।

তাঁর মৃত্যুতে কমিউনিষ্ট পার্টি তার পতাকা অর্দ্ধনমিত করেছে।

জনযুদ্ধ (সাপ্তাহিক) ৩বর্ষ ৮ম সংখ্যা, '২১শে জুন' বুধবার, ১৯৪৪ (বিশেষ প্রতিবেদন)

Synopsis of Editorials

Indian Express

Outstanding Humanitarian

"Among our scientists he was the most outstanding humanitarian and among humanitarians he was the most outstanding scientist"

The Hindu

A Leading Light

" In the death of Sir P C Ray the country has lost a great man of science and a leading light of the Indian renaissance that began in the closing decades of the last century"

Madras Mail

Advancement of Science

" The death of Sir P C Ray, who devoted his whole life to the pursuit of science, will be regretted not only by his countrymen but by all nations interested in the advancement of science and the benefits that flow therefrom"

Morning News

Life of A Sadhu

"He lived the life of a *sadhu* and gave away his all to his countrymen *Guru* of many scientists of our own day, Prafulla Chandra Ray has left an intellectual progeny that will carry his tradition for many a long year to come India will undoubtedly produce other scientist and scholars but not another P C Ray. He served his country well and faithfully and the country north, south, east and west mourns his loss to-day sincerely and with a genuine heart" -

Collected from
'The Calcutta Municipal Gazette'
Sir P.C. Ray Supplement, 24th June/1944

Indian Journalists' Association

At a meeting of Executive council of the Indian Journalists' Association held on Wednesday evening last June 21, at the Purvasa office Mr B SenGupta presiding, a resolution was passed, all standing recording the Council's deep sense of sorrow and irrepairable loss at the demise of Acharyya P C Ray

"The profession of journalism mourns the death of Acharyya Ray who was renowned for his sturdy independence and his sympathy in their fight for the liberty of the Press. The Council recalls with gratitude his uniform kindness to representatives of the Press and the cordial relations that always existed between him and the Press."
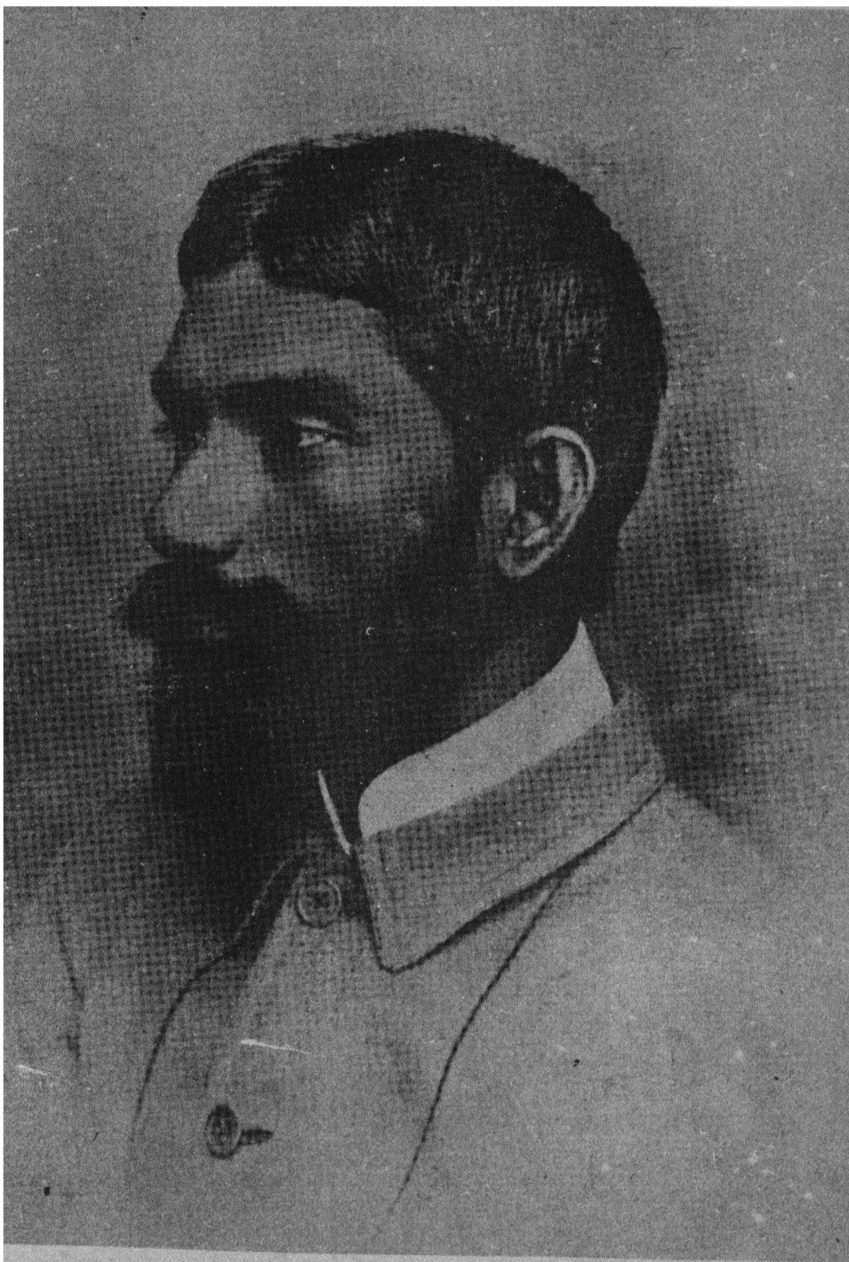
আচার্যদেব (১৮৯৬)

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ ২রা আগস্ট, কপোতাক্ষ নদের তীরে তদানীন্তন যশোহর জেলায় (১৮৮২ সাল থেকে খুলনা জেলা, বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) রাড়ুলী গ্রামে জন্ম। পিতা বহু ভাষাবিদ, সুপণ্ডিত, সমাজসেবী ও বিদ্যোৎসাহী হরিশচন্দ্র রায়। মাতা– ভুবনমোহিনী দেবী। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁদের তৃতীয় সন্তান। এবছরই রবীন্দ্রনাথ, মতিলাল নেহরু, নীলরতন সরকার, জলধর সেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অক্ষয়কুমার মৈত্র, বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৬২ শিশু প্রফুল্লচন্দ্রের পারিবারিক ডাকনাম রাখা হয় ফুনু।

১৮৬৩ আচার্যদেবের পিতামহ আনন্দলাল রায়ের মৃত্যু।

১৮৬৬-৭০ গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠগ্রহণ, ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ এবং মাদারবক্স আখুঞ্জীর ছাত্র। স্কুল পালানো স্বভাবের জন্য পরিচিতি। গ্রাম্য জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে একাত্মতা।

১৮৭০ আগস্ট মাসে পিতামাতা ও বড় ভাইয়ের সাথে কলিকাতায় আগমন। ১৩২ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে (চাঁপাতলা) ভাড়াবাড়িতে বাস।

১৮৭১ হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন শুরু। ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা।

১৮৭২-৭৩ কঠিন আমাশয় এবং অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত হয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যান। বিদ্যালয়ের প্রথাগত পড়াশুনা স্থগিত। তবুও পিতৃদেবের বিরাট পাঠাগারে নিজের উদ্যোগে নিরলস অধ্যয়ন। নিজ চেষ্টায় ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষার সূত্রপাত। ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ। পরিমিত আহার এবং সময়নিষ্ঠার সাথে জীবন-চর্যার শুরু।

১৮৭৪ কলিকাতায় পুনরায় আগমন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি। কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় অনুরক্ত। কৃষ্ণবিহারী সেন, আদিত্যকুমার চ্যাটার্জী, মহেন্দ্রলাল দাঁ প্রভৃতি শিক্ষকের সংস্পর্শে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট। কেশবচন্দ্র সেন কৃত ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র— সুলভ সমাচার এবং কৃষ্ণবিহারী সেন কৃত ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার নিয়মিত পাঠক।

১৮৭৫ স্কুল ছেড়ে পুনরায় গ্রামে গমন। গ্রামবাসীদের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা।

১৮৭৬ পুনরায় অ্যালবার্ট স্কুলে জুলাই মাস থেকে পড়াশুনা শুরু। এই বছরই ডাঃ মহেন্দ্র

লাল সরকার 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স'-এর প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৭৭. এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি।

১৮৭৮: এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। ২ বছরের জন্য স্কুল থেকে ৫ টাকা বৃত্তি লাভ। ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ।

১৮৭৯: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যয়ন শুরু। কলেজে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর বাগ্মিতা ও দেশভক্তিতে উদ্বুদ্ধ। রসায়ন অধ্যয়নের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে যাতায়াত।

১৮৮০. ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসী এবং সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তিলাভ।

১৮৮১: ফার্স্ট আর্ট (এফ. এ.) পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ।

১৮৮২: বি.এ.(বি-কোর্স) পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। রসায়ন অধ্যাপক আলেকজান্ডার পেডলারের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ। সকলের অজ্ঞাতে গিলক্রাইস্ট (বার্ষিক ২০০ পাউন্ড) বৃত্তি লাভ। উচ্চ শিক্ষার জন্য আগস্ট মাসে বিলাত যান। সে বছর সারা ভারতে ২ জন এই বৃত্তি লাভ করেন। অন্য জন ছিলেন বোম্বাই-এর বাহাদুরজী। বিভিন্ন কারণে পৈত্রিক আয়ের ক্রম অবনয়ন। বিলাতে জগদীশচন্দ্র বসু ও সত্যানন্দ দাস কর্তৃক সম্বর্ধিত। শিক্ষা আরম্ভ।

১৮৮৩. এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতকালীন ঋতুতে অধ্যয়ন শুরু।

১৮৮৪: বি.এস সি রসায়ন বিভাগের প্রধান ক্রাম ব্রাউনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ইউরোপের বিখ্যাত রসায়নবিদ জেমস ওয়াকার তাঁর সহপাঠী।

১৮৮৫: 'ইন্ডিয়া বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য মিউটিনি' প্রবন্ধ- প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনার জন্য পুরস্কার লাভে বঞ্চিত কিন্তু প্রবন্ধটি গুণীজনের প্রভূত প্রশংসা লাভ। তদানীন্তন বিখ্যাত বিরোধী পার্লামেন্ট নেতা জন ব্রাইট কর্তৃক প্রশংসিত। প্রবন্ধটি বৃত্তির টাকায় ছাপিয়ে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রচার। সারা ইউরোপে ও ভারতের পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক প্রচার ও পরিচিতি লাভ। বি.এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৮৬: 'Essays on India' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ ও খ্যাতিলাভ। সেজন্য স্কটসম্যান পত্রিকায় ভূয়সী প্রশংসা। ডি.এস-সি উপাধির জন্য প্রস্তুতি ও গবেষণা শুরু।

১৮৮৭. এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এস-সি উপাধি লাভ। গবেষণার বিষয়বস্তু "Conjugated ("gepaarte") Sulphates of the Copper Magnesium Group "A study of Isomorphous Mixtures and Molecular Combinations"। হোপ প্রাইজ (বার্ষিক

১০০ পাউন্ড) বৃত্তিলাভ। এডিনবার্গ কেমিক্যাল সোসাইটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৪ই মার্চ Carbo-Ketonic Ethers- এর উপর বক্তৃতা দান। ফ্যারাডে গোল্ড মেডেল প্রাপ্তি।

১৮৮৮ স্কটল্যান্ডের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ পরিদর্শন। ফ্রান্স ও ইতালী হয়ে রেলপথে বিন্দ্রিসি বন্দরে গমন। সেখান থেকে জাহাজ যোগে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। অতঃপর রেলপথে স্বগ্রামে গমন। ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেওয়ার জন্য অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন এবং স্যার উইলিয়াম মিউর–এর নিকট হইতে পরিচিতিপত্র লাভ। স্যার আলফ্রেড ক্রফট এর অবিচার এবং প্রভিন্সিয়াল (বেঙ্গল) সার্ভিস এ যোগদানের জন্য এক বছর প্রতীক্ষা। জগদীশ বসু ও তাঁর স্ত্রী দ্বারা আপ্যায়ন। ঐ সময় প্রাণিবিদ্যা সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন। ব্রিটিশ শাসকদের নথিতে Staunch Revolutionary but in the garb of a Scientist" নামে লিপিবদ্ধ হয় তাঁর নাম।

১৮৮৯ জুলাই মাসে মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান। আলেকজান্ডার পেডলার– এর সাহচর্য। সুশিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য মন–প্রাণ সমর্পণ।

১৮৯০ মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথম বাংলা ভাষায় সরল 'প্রাণিবিজ্ঞান' বই প্রকাশ। 'নেচার ক্লাব' স্থাপন। সদস্য ছিলেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, অধ্যাপক জগদীশ বসু, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, রামব্রহ্ম সান্যাল, ডঃ বিপিনবিহারী সরকার প্রমুখ। সাপের বিষের উপর বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে বসবাস শুরু। গাছপালা ও প্রাণিবিদ্যা সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন।

১৮৯১ অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত, পূজার ছুটিতে দেওঘর গমন। রাজনারায়ণ বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ মনীষীর সঙ্গলাভ।

১৮৯২ দেশীয় ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণা। বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সূচনা। সহপাঠী এবং দেশভক্ত অমূল্যচরণ বসুর সহযোগিতায় বিদেশী ঔষধের সাথে অসম লড়াইএর মুখোমুখী। নিজেদের হাতে স্বদেশে প্রস্তুত ঔষধের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ।

১৮৯৩ স্বগ্রামবাসী যাদবচন্দ্র মিত্রের নিকট থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড্ প্ল্যান্ট ১৩০০ টাকায় ক্রয়।

১৮৯৪ 'জারনাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল '-এ তৈল ও ঘৃতে ভেজাল সম্পর্কে রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং প্রবন্ধ প্রকাশ। পৈতৃক ঋণ পরিশোধ। তাঁর পরিকল্পিত নকশা অনুসারে প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ ও নবীকরণ। প্রধান প্রধান

রসায়নাগার পরিদর্শনের জন্য বিলাত যাত্রা। পিতা হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু।

১৮৯৫. 'মারকিউরাস নাইট্রাইট' আবিষ্কার।

১৮৯৬: 'জারনাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এ মারকিউরাস নাইট্রাইট সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ। ইউরোপের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক রস্কো, ডাইভারর্স, বার্থেলো, ভিক্টর মেয়র, ভোলাউ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের উচ্চ প্রশংসা এবং অনুপ্রেরণা। তাকে সহযোগিতার জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক এক জন রিসার্চ স্কলার প্রদানের সিদ্ধান্ত এবং শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনের যোগদান।

১৮৯৭: বেঙ্গল গর্ভ্নমেন্ট কর্তৃক রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ পদের প্রস্তাব এবং রিসার্চ ও শিল্পগড়ার চেষ্টার অন্তরায় হবে বুঝে প্রত্যাখ্যান। বার্থেলোর সাথে যোগাযোগ। তাঁর উৎসাহে রসায়নের ইতিহাস লেখার প্রতি আগ্রহ এবং এ বিষয়ে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও তথ্যানুসন্ধান।

১৮৯৮-৯৯: ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর প্রস্তুত দেশীয় ভেষজের কার্যকারিতার প্রশংসা— বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ার স্থান লাভ। ডঃ রায়ের লিখিত প্রবন্ধ বার্থেলো কর্তৃক প্রশংসিত এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ। ব্রাহ্মসমাজের কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচিত।

১৯০০: নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াসে তাঁর অর্জিত অর্থের দ্বারা তহবিল গঠন। মুরারিপুকুরে পশুর হাড় পুড়িয়ে ফস্‌ফেট প্রস্তুত।

১৯০১: মহামতি গোখেল ও গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচয় ও সৌহার্দ্য। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সাথে পরিচিতি লাভ। কলেজ সহকর্মী চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), সমাজসেবী সতীশ দাশগুপ্ত, ডাঃ কার্তিক বসুর বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগদান। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রভৃতি প্রথিতযশা চিকিৎসক ও দেশহিতৈষীদের দেশীয় ঔষধ প্রচারে অকুণ্ঠ সহযোগিতা। ঐ সময় Calcutta Pottery Works-এর সঙ্গে নানা ভাবে সহযোগিতা।

১৯০২: আচার্যদেবের উদ্যোগে কলিকাতা টাউন হলে ভারতে গান্ধীজীর প্রথম বক্তৃতাদানের আয়োজন। Englishman (Statesman) পত্রিকার ২০শে জানুয়ারি সংখ্যায় ব্যাপক প্রচার। বেঙ্গল কেমিক্যাল লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত। 'History of Hindu Chemistry' Vol. I গ্রন্থটি প্রকাশ। মঁসিয়ে বার্থেলো, রসকো প্রমুখ মনীষীর উচ্চপ্রশংসালাভ।

১৯০৩: স্বগ্রামে পিতা হরিশ্চন্দ্র রায়ের নামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন। বিখ্যাত ফরাসী পত্রিকা Journal des Savants (January 1903) Nature, Knowledge, American

Chemical Journal প্রভৃতি দেশবিদেশের পত্রপত্রিকায় History of the Hindu Chemistry বইটির উচ্চপ্রশংসা ও স্বীকৃতি।

১৯০৪: দ্বিতীয়বার ইংলন্ড গমন। ইউরোপের গবেষণাগার সমূহ পরিদর্শনের জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রেরিত। লন্ডনে ডেভী ফ্যারাডে ল্যাবরেটরিতে রিসার্চের সুযোগ লাভ। লন্ডন, ডান্ডি, লিড্স, প্যারিস, এডিনবার্গ, মানচেস্টার, ব্রিমিংহাম, বার্লিন জেনেভা, জুরিখ, ফ্রাঙ্কফুর্ট ইত্যাদি স্থানের ল্যাবরেটরি পরিদর্শন। শেষে ফ্রান্সে গমন। বড়দিনের ছুটিতে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণ কর্তৃক বিপুল সম্বর্ধনা লাভ। প্রখ্যাত রসায়নবিদ স্যার জেমস্ ওয়াকার, উইলিয়াম রামসে, ডিকসন, পারকিন ফ্রাঙ্কল্যান, অ্যন্ডম্যান, ভ্যান্ট-হফ্, সিলভা লেভি, বার্থেলো প্রমুখের সাথে ব্যক্তিগত পরিচিতি লাভ ও মত বিনিময়। মাতা ভুবনমোহিনীর মৃত্যু।

১৯০৫: স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধিতা করে Bengal Stream Navigation Co.-তে সক্রিয় অংশগ্রহণ। U.J. Patel, W. Valchand Hirachand প্রমুখের সাথে এই শিল্পে ভারতীয়দের স্বার্থ সম্পর্কে প্রচার। বেঙ্গল কেমিকেল মানিকতলা কারখানায় স্থানান্তরিত।

১৯০৬: "নব্যরসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি" পুস্তক প্রকাশ।

১৯০৭: জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক National Council of Education - এর সভাপতি নির্বাচিত। পুনরায় 'ব্রাহ্মসমাজে' কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত।

১৯০৮: রাড়ুলী Central Co-operative Bank প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহযোগিতা। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি।

১৯০৯: History of Hindu Chemistry Vol-II গ্রন্থটির প্রকাশ। রসায়নবিদ অধ্যাপক সিলভা লেভির প্রশংসা। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রধান অধ্যাপকপদে উন্নীত। বাংলার কৃতী বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, মানিকলাল দে, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পুলিনবিহারী সরকার, রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ ছাত্রের প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান এবং আচার্যদেবের বাসভবনে তাঁর সাথে একত্রে অবস্থানের সূত্রপাত। "Elementry Inorganic Chemistry" নামে কলেজের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক লেখেন।

১৯১০: মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার প্রগতি ও সমৃদ্ধির স্বীকৃতি হিসাবে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত। বিখ্যাত পুস্তিকা "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" ইংরাজী এবং বাংলায় প্রকাশ। প্রকাশনা শিল্পকে উৎসাহ দানের জন্য চক্রবর্ত্তী-চ্যাটার্জী কোম্পানিকে তাঁর সব বই প্রকাশের দায়িত্ব প্রদান।

১৯১১: 'ময়দান ক্লাব'-এর সূত্রপাত। অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, সত্যানন্দ বসু, অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, ডঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, সুভাষচন্দ্র বসু, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। ঐ সময় তাঁর প্রিয় ছাত্রদের নিয়ে "বেতালের বৈঠক" শুরু।

১৯১২: The Congress of the Universities of the Empire-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তৃতীয়বার ইংলন্ড গমন; সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু ও অন্যতম প্রতিনিধি স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার সুযোগ এবং ভারতে আরও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি দানের দাবি। অধ্যাপক রামসে, ডঃ ভেলি কর্তৃক Amonium Nitrite—এর উপরে গবেষণার জন্য প্রশংসা। কেম্ব্রিজ, শেফিল্ড এবং ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক Companion of the Indian Empire (C.I.E) উপাধি প্রাপ্তি। ভাইস চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখার্জীর পত্রে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনার প্রস্তাব এবং রসায়নের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগদানের আহ্বান।

১৯১৩: 'বঙ্গীয়—সাহিত্য—সম্মেলন'— এর বিজ্ঞান বিভাগে সভাপতিত্ব। ভারতের পাবলিক সার্ভিস সম্পর্কে রয়াল কমিশনের সামনে শিক্ষাবিভাগের বিভেদনীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপন।

১৯১৪-১৫: পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদান। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক Armstrong কর্তৃক 'Master of Nitrites' নামে বিভূষিত। তাঁর উৎসাহে এই সময় অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' রচনা করেন।

১৯১৬: প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ। তাঁকে আবেগমথিত বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিজ্ঞান কলেজে 'পালিত অধ্যাপক রূপে' যোগদান। রসায়ন বিভাগের প্রধান হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মারক বক্তৃতাদান। অত্যন্ত আর্থিক অসুবিধার মধ্যে এবং যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা সত্ত্বেও রিসার্চের কাজে এগিয়ে চলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার দাবিতে যশোহরে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন'-এ প্রস্তাবদান।

১৯১৭: কলিকাতায় ৩১তম ভারতীয় জাতীয় সমাজ সংস্কার সমিতির সভায় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সভাপতির ভাষণ। বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্মচারিদের জন্য Bengal Chemical সমবায় সমিতি গঠন এবং সমবায়ের কাজে উৎসাহ দান। Indian Industrial Commission এর কাছে বক্তব্য পেশ।

১৯১৮: বাগেরহাট কলেজ স্থাপন। স্বগ্রামে 'Education Society' স্থাপন করে দুস্থ ছাত্র ও বিধবাদের সাহায্যকল্পে বেঙ্গল কেমিক্যালের নিজস্ব ১০ হাজার টাকার শেয়ার দান।

'Essays and Discourses' বইটি প্রকাশ। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষণ।

১৯১৯: 'নাইট' উপাধিলাভ। রাউলাট বিলের প্রতিবাদ সভায় টাউন হলে বক্তৃতা দান। The Deutsche Akademie of Munich তাঁকে Honorary fellow নির্বাচিত করে আসাম Students convention-এ সভাপতির ভাষণ। Bengal Potteries Ltd-এ Director হিসাবে যোগদান। Bengal Enamel Works– এর সহিত সক্রিয় ভাবে জড়িত। "নেচার" পত্রিকায় রসায়নাচার্য স্যার এডোয়ার্ডথর্পের মন্তব্য : "স্যার পি.সি.রায় শীঘ্রই সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবেন।" Students Stores Organisation (Co-operative) Committee-র সভাপতি নির্বাচিত।

১৯২০: ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত এবং ভাষণ দান। রসায়নে উচ্চতর গবেষণার জন্য চতুর্থবার ইংলন্ড গমন। ঢাকা ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক D.Sc ডিগ্রী প্রদান। খাদি ও অনাথ শিশুদের সাহায্যের জন্য Trust গঠন। 'জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা' বইটির প্রকাশ।

১৯২১: সমস্ত সঞ্চিত অর্থ রসায়ন এবং বিজ্ঞান কলেজের উন্নতির জন্য চুক্তিবদ্ধ। তাঁর নিজের নামে প্রতিমাসে ২০০টাকা হিসাবে রিসার্চ ফেলোশিপ প্রদান। এই দানের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। খুলনার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্যে রিলিফ কমিটি স্থাপন ও আর্থিক সাহায্য দান। ১০ হাজার টাকা দানে নাগার্জুন পুরস্কার স্থাপন। ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ায় অবশিষ্ট কার্যকালে আর বেতন গ্রহণ করবেন না বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানান। Bengal Co-operative organisation–এর সভাপতি নির্বাচিত। গাইবাঁধায় All Bengal Teachers Association (ABTA)–এর প্রথম সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর Chemical Service Committee-র সদস্য হিসাবে ভারতে শিল্পের স্বার্থে প্রকৌশলী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এই মর্মে অভিমত প্রদান।

১৯২২: উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে আত্মনিয়োগ। কয়েক লক্ষ টাকা, ঔষধ ও খাদ্য সংগ্রহ এবং বন্যাপীড়িতদের মধ্যে বিতরণ। ডাঃ ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ রায়, গোপীনাথ সাহা প্রমুখ ব্যক্তিদের সক্রিয় সহযোগিতা। চরকা প্রচলনে আত্মনিয়োগ। কাটিপাড়া সেবাশ্রমে চরকার উন্নতিকল্পে বেঙ্গল কেমিক্যালের এক হাজার টাকার শেয়ার দান। চরকা ও খাদি প্রচলনের উৎসাহ ও প্রচারের জন্য খাদি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা দান। 'সেন্ট্রাল রং' বইটি বাংলা এবং ইংরাজীতে প্রকাশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য হিসাবে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ৮ ডিসেম্বর সিনেট সভায় ঐতিহাসিক প্রস্তাব প্রদান, এবং সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত।

১৯২৩: আমেদাবাদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দান। ফরিদপুরে গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর উপস্থিতিতে কংগ্রেসের সমাবেশে যোগদান। পিছিয়ে পড়া মানুষের সম্পর্কে বক্তৃতা দান। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন সভায় বক্তৃতা। কোকনদে খাদি প্রদর্শনীতে সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণদান। Anti-Malaria Co-operative Society—র সহিত সক্রিয় ভাবে যুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধানা শিষ্যা গৌরী মার বাগবাজারে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন ও উৎসাহ দান। খুলনা জেলা সমবায় সমিতির ৩য় বার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতা দান।

১৯২৪: Indian Chemical Society স্থাপন এবং প্রথম সভাপতি এবং ঐ Building-এর জন্য ১০,০০০ টাকা দান। ফরিদপুরে হিন্দু মহাসভা আয়োজিত সভায় স্বাগত ভাষণ। উৎকল প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত। ঐ সভায় তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'Science can effort to wait but Swaraj can not.' কলিকাতা করপোরেশন-এর মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক Primary Education Special Committee—র চেয়ারম্যান নির্বাচিত। খাদি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে 'দি ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় জনসাধারণের কাছে আবেদন।

১৯২৫: সিউড়ি মেলার উদ্বোধন। শান্তিনিকেতন পরিদর্শন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দান। কোকনদে কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধিরূপে যোগদান। 'Makers of Modern Chemistry' বইটির প্রকাশ।

১৯২৬: প্রথম Rural Welfare Association—এর সভায় সভাপতির ভাষণ। All India College & Universities Teachers Conference—এর উদ্যোক্তা এবং সভাপতির ভাষণ। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আহ্বানে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ। 'The Discovery of Oxygen' বইটি প্রকাশ। রাড়ুলী গ্রামে খুলনা জেলা সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

১৯২৭: ঢাকা বিভাগের সমবায় সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ। বারাণসীতে All India Education Conference—এ যোগদান। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য যশোহরে প্রতিষ্ঠিত 'জেনানা সম্মিলনী'কে পুনর্গঠন এবং প্রভূত আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহদান।

১৯২৮: কোকনদে খাদি প্রদর্শনীর উদ্বোধন। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের আহ্বান।

১৯২৯: কেম্বিজ-এ Congress of the Universities of the Empire—এর C.U. এ প্রতিনিধি হিসাবে সভায় যোগদান এবং বিজ্ঞান কলেজের দুরবস্থার কথা প্রকাশ। পঞ্চমবার ইংলন্ড গমন এবং বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন। বোম্বাই-এ প্রাদেশিক সমবায় সম্মেলনে

সভাপতির ভাষণ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আয়োজিত লাহোরে প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও সভায় ভাষণ। সেখানে "The State and The University" শীর্ষক বক্তব্যে বিজ্ঞান কলেজের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের বিরূপ এবং বর্বর মনোভাবের বিশদ ব্যাখ্যাদান।

১৯৩০ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত স্বদেশী মেলায় ভাষণ। বোম্বাই-এ Classified Trade Organisation– এ ভাষণ। সোদপুর খাদি-প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১৯৩১ পুনায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় স্বদেশী মেলায় উদ্বোধনী ভাষণ। তিরুচিরাপল্লীতে সর্বভারতীয় খাদি প্রদর্শনীতে উদ্বোধনী ভাষণ Radha Charan Lal– A study বইটির প্রকাশ। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে পুনরায় বন্যা এবং বঙ্গীয় সংকট ত্রাণ সমিতি গঠন এবং পি সি রায়কে সাহায্য পাঠানোর জন্য বোম্বাই প্রদেশবাসীর কাছে জেলে যাওয়ার পূর্বে গান্ধীজীর আহ্বান। গান্ধীজী কর্তৃক আচার্যদেবকে Doctor of Flood সম্বোধনে অভিহিত। আর্যাস্থান Insurance Co–তে আচার্য রায়ের সাহায্য দান। বঙ্গীয়–সাহিত্য–পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত। করাচীতে সর্বভারতীয় শিল্প মেলার উদ্বোধন। পানিহাটীতে বেঙ্গল কেমিকালের শাখার উদ্বোধন।

১৯৩২ ''ভারতের শিল্প বিকাশ' সম্পর্কে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের শিল্পোন্নতির বিষয়ে আলোচনা। 'চা-পান ও দেশের সর্বনাশ' পুস্তকের প্রকাশ। বিখ্যাত স্মৃতি গ্রন্থ Life & Experience of a Bengali Chemist–এর প্রথমখণ্ড প্রকাশ বইটি Youth of India ব নামে উৎসর্গ করেন। আর্থারটন বইটির উচ্চপ্রশংসা করেন। Calcutta Review পত্রিকায় The Shakespearean Puzzle নামে ধারাবাহিক রচনা ও অন্যান্য লেখা প্রকাশ। লাহোরে পৌরসভা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিরাট সম্বর্ধনা। সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে টাউন হলে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ ও পৌরসভা কর্তৃক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বিশাল ও অন্তরস্পর্শী সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। সম্বর্ধনা ছিল ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৯। তাঁর নামে বাগেরহাট কলেজের নামকরণ।

১৯৩৩ ত্রিবাঙ্কুরে রাজ্য যুব সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ। ইন্দোরে স্বদেশী মেলায় উদ্বোধনী ভাষণ। দিল্লীতে সর্বভারতীয় শিল্পমেলায় উদ্বোধনী ভাষণ। মেদিনীপুরে একটি মন্দিরে গান্ধীজীর প্রণোদিত হরিজনদের প্রবেশাধিকারের অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। করাচীতে শিল্প মেলা ও সমবায় ব্যাংক উদ্বোধন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ। করাচীতে শিল্প মেলা ও সমবায় ব্যাংক উদ্বোধন এবং করাচী পৌরসভা কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে টেলিগ্রাম প্রদান।

১৯৩৪ লাহোরে ভারতীয় বীমা সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ। ১৯৩১-১৯৩৪ পরপর তিনবার বঙ্গীয়-সাহিত্য–পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত। London Chemical Society কর্তৃক Fellow নির্বাচিত। মেদিনীপুরে Bengal Salt Co. স্থাপন। Indian Science News

Association এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত। তাঁর উৎসাহ ও সহযোগিতার এই সংগঠনের মুখপাত্র Science & Culture পত্রিকার প্রকাশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান। খুলনা সম্মিলনীর কুমিরা অধিবেশনে সভাপতিত্ব। খুলনা কটন মিলের প্রতিষ্ঠা। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ।

১৯৩৫: "Life and Experieence of a Bengali Chemist" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ। ওয়ার্ধায় শিক্ষা সম্মেলনে (The Great Wardha Educational Conference)--এ যোগদান। শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের জন্য ''বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ'' নামক আলোচনা সভার প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৩৬: পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ—সাহিত্য—সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে সভাপতি। স্যার আশুতোষ মুখার্জী স্মারক প্রাণিবিদ্যা, জীববিদ্যা গবেষণার জন্য 'আশুতোষ প্রাইজ' খাতে কলিকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ হাজার টাকা দান। 'জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়' এবং 'খাদ্য বিজ্ঞান' বই প্রকাশ'। ৭৫ বছর বয়সে রসায়নের 'পালিত' অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ। এমিরেটাস প্রফেসর হিসাবে কর্মরত। ১৯২৬-৩৬ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দানের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। ১৮৯৪-১৯৩৬ দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রসায়ন সম্পর্কিত ও শতাধিক অন্য গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ। টাঙ্গাইলে বাংলা আসাম ব্রাহ্মসমাজের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ। নারায়ণগঞ্জে চিত্তরঞ্জন কটন মিলের উদ্বোধন। ময়মনসিংহ জেলায় করটিয়া কলেজের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা এবং জ্ঞানবারিধি' সম্মানে ভূষিত। 'বঙ্গীয় ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘের' পক্ষে জনসাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন। মনীষী রোমা রোলার আহ্বানে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনকে সমর্থন করে ইস্তাহারে স্বাক্ষর দান।

১৯৩৭. ওয়ার্ধায় মাড়োয়ারী এডুকেশন সোসাইটির রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ভাষণ দান। ''বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা ও শিল্প ব্যবসায়ে কৃতিত্বলাভ'' পুস্তকের প্রকাশ। ''আত্মচরিত'' গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৩৮· Indian Chemicals Manufacturers Association— এর প্রতিষ্ঠা, ও সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৩৯: বাংলা ও বাংলার বাহিরে বহু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

১৯৪০: মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবসে সভাপতির ভাষণ। বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালকমণ্ডলীর সহিত মতভেদের ফলে সভাপতির পদ ত্যাগ। মেদিনীপুরে বন্যাত্রাণের জন্য আবেদন। কুখ্যাত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরোধিতা। কলিকাতা বেতারে বক্তৃতা

প্রদান।

১৯৪১ সিনেট হলে অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রফুল্লজয়ন্তী উৎসব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৮০তম জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন। নাৎসী বাহিনীর সোভিয়েত আক্রমণ এর প্রতিবাদের প্রস্তাবে প্রথম স্বাক্ষরদাতা।

১৯৪২ প্রিয়শিষ্য ও ভক্ত অরবিন্দ সর্দারের টাউন শ্রীপুরের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান।

১৯৪৩ খুলনা শহরে এবং রাড়ুলী গ্রামের অধিবাসিগণ কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এবং ২৪শে এপ্রিল জীবনের শেষ জনসভা।

১৯৪৪ ৮২ বছর ১০ মাস ১৪ তম দিনে (৮৩ বছর) ১৬ই জুন, সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিটে মহাপ্রয়াণ।

শ্রীপিনাকপাণি দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত।

"When I have served my time I shall still want to live again and again in the lives of those who will carry on the struggle from generation to generation untill the four--fold curse of tyranny, injustice poverty and ignorance is lifted form the brow of my beloved long--suffering Motherland '

P.C.Ray

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

লেখক জীবনের সূচনাতেই আমার সৌভাগ্য হয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ছাত্র না হলেও তাঁর স্নেহ লাভের। একখানি পাক্ষিক পত্রিকায় সে সময় স্বনামে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ এবং কবিতা, আর বেনামীতে কৌতুক রচনা লিখতাম। ঐ পত্রিকার একজন কর্মকর্তা একদিন বললেন, বৈশাখে একটি নববর্ষ সংখ্যা বের করার কথা ভাবছি। চলুন, এই উপলক্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে যাই, একটি শুভেচ্ছা বাণী প্রার্থনা করতে। যতদূর মনে পড়ছে, বিজ্ঞান কলেজ ভবনের পিছনে দিকে তিনতলার একখানি ঘরে থাকতেন তখন আচার্য রায়। আমরা সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ যখন যাই, দেখলাম পরনে ডোরা কাটা লুঙ্গি, গায়ে হাত কাটা খদ্দরের ফতুয়া, পায়ে দেশি চটি, আচার্য বসে বসে কি খাচ্ছেন। এ সময় ঢোকা ঠিক হবে কি না বুঝতে না পেরে দরজায় টকটক করে বার কতক শব্দ করতেই ভেতর থেকে আওয়াজ এল, কে রে কি চাস? বললাম, ভেতরে আসব স্যার' স্যার বললেন, তার জন্যে অনুমতি নেবার দরকার কি? সোজা চলে আসবি। ভেতরে ঢুকে সসংকোচে বললাম, আপনি খাচ্ছিলেন। আচার্য রায় বললেন, তাতে কি? মুড়ি খাচ্ছিলাম, মুড়ি নারকেল আর আখের গুড়। তোরা খাবি? আমি বললাম, না স্যার, আমরা এখনি খেয়ে এসেছি। তিনি বললেন, কি খেয়েছিস, পাঁউরুটি বিস্কুট কেক, না চপ কাটলেট? ঐ সব ছাইভস্ম খেয়ে খেয়ে পেটের দফারফা করিস বলেই ও এত লিভারের দোষ আর অগ্নিমান্দ্য বার মাস তোদের কাবু করে রাখে। পাঁউরুটিতে কি থাকে জানিস? তাড়ি। তাড়ি দিয়ে এক টুকরো ময়দার তালকে ফাঁপিয়ে তৈরি করে ঐ রুটি। আর চপ কাটলেট সিঙাড়াতে থাকে পচামাছ মাংস পচা আলু ভেজাল তেল। খাবারের নামে এই সব বিষ বিক্রি হয় বাজারে আর ছেলে মেয়েরা তাই গেলে চায়ের সংগে।

সঙ্গের বন্ধুটি বললেন, আপনি চা খান না স্যার? খাই, নিজে তৈরি করে খাই, বললেন আচার্য এবং কুঁজো থেকে জল ঢেলে খেতে খেতে বললেন, চা-টা না খাওয়াই ভাল। বদভ্যাস করে ফেলেছি, ছাড়তে পারি না। কিন্তু তোরা করবি কেন? তোদের হুঁশিয়ার করার জন্যেই ত লিখেছি চা পান না বিষ পান? এই বলেই হো হো করে হাসলেন। বললেন, শুনেছিস ত সেই মিশনারির গল্প? আমি যা বলিব তাই করিবে। যা করিব কদাচ তা করিবে না! খোঁজ নিলে দেখবি সব চায়ের দোকানেই চায়ের একটা করে পুঁটলি থাকে, সেটা বছর খানেকের আগে খোলা হয় না। গরম জলে সেটা একবার করে ডোবায়,

আর তার সঙ্গে একটু চিনি আর চামচে দুই গুঁড়ো দুধ গোলা মিশিয়ে চা তৈরি করে। ও খেতে আছে? ওসবের চেয়ে মুড়ি চিঁড়ে ছাতু গুড় নারকেল ঢের ভাল জিনিস। ঢের বেশী উপকারীও। যে দেশে যার জন্ম, তার জল হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকৃতি সেখানে সেই রকম গাছ পালা ফুল ফল ও ফসল সৃষ্টি করে, যেখানকার যা অসুখ, সেখানকার মাটিতে জন্মায় তার ওষুধও। শিখে রাখ, এটা বিজ্ঞানেরই তত্ত্ব। তারপর বললেন, হ্যাঁ কি জন্যে এসেছিস, তা জিজ্ঞাসাই করা হয় নি। আগেই বলে রাখছি কিন্তু চাকরি-টাকরি চাইবি না। আমি বললাম, না স্যার, আমরা একটা লেখা চাইতে এসেছি, আমাদের এই ছোট্ট পত্রিকার জন্যে। আচার্য বললেন, হাবিজাবি গল্প আর প্যানপেনে কবিতা দিয়ে ভরাস ত তোদের পত্রিকা? ওতে আমি লিখবটা কি? বললাম, না স্যার, আমরা দেশ বিদেশের দর্শন বিজ্ঞান শিল্পকলা ও সাহিত্যের প্রসঙ্গ লিখি, লিখি রাজনীতি অর্থনীতির কথা। অবশ্য গল্প কবিতাও লিখি।

কয়েক সংখ্যার কাগজ নিয়ে গিয়েছিলাম, তা তুলে দিলাম তাঁর হাতে। উল্টে উল্টে দেখতে দেখতে বললেন, ভালই ত করেছিস জিনিসটা। কিন্তু পয়সা পাচ্ছিস কোথায়? ধার দেনা বাধিয়ে ফ্যাসাদে পড়বি না ত! তাঁর অনুমান তো মিথ্যে নয়, তাই চুপ করে থাকলাম। তিনি বললেন, আমি ত সাহিত্যিক নই, সাহিত্যের পাঠক। আমি কি লিখব বল ত। আমি বললাম, শুনেছি, আপনি সাহিত্যেরই ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন, শুধু দেশের ছেলে মেয়েদের দেশকে শিল্প বাণিজ্যে সমৃদ্ধ করার শিক্ষা দেবেন বলে। পড়েছিও ক্যালকাটা রিভিউয়ে আপনার শেকসপীয়ার বিশ্লেষণ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এবং প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সংগ্রহ নামক সংকলনের মূল্যবান লেখাগুলি। আচার্য বললেন, ওরে ওসব খেয়ালখুসীর লেখা। খুব কিছু দাম নেই ওর। দামী জিনিস মাত্র একটাই লিখেছি, সে হল হিন্দু রসায়নের ইতিহাস। আমি বললাম, আপনার আত্মজীবনীও ত অসাধারণ বই স্যার। পড়েছিস? খুসী হয়ে বললেন, আচ্ছা যা, দোব লেখা। আসিস শনিবারে এই সময়ে।

সম্পাদক বন্ধুর প্রয়োজন তাঁর প্রত্যাশিত লেখাটি পেতেই মিটে গেল। আমি কিন্তু এই সূত্রে মাঝে মাঝেই হানা দিতে লাগলাম আচার্য রায়ের কাছে। ক্রমে তাঁর দেশজোড়া বাৎসল্যের মাটিতে একটু জায়গা হয়ে গেল আমারও। তখন আমি ছিলাম নিতান্তই শীর্ণকায় আর ঢ্যাঙা, মাথায় ছিল বড় বড় চুল এবং হাঁটু ছোঁয়া পাঞ্জাবী পরতাম। আমাকে দেখে একদিন তাই বললেন, তুই ত তালপাতার সিপাই। গায়ে এতটুকু পদার্থ নেই, একরাশ বই পড়া বিদ্যে মগজে বোঝাই করে রেখেছিস। কদিন বাঁচবি? এই বিদ্যে কাজে লাগাবিই বা কি করে? বললাম, আপনার আশীর্বাদের জোরেই বেঁচে থাকব স্যার, আস্তে আস্তে মোটাও হয়ে যাব হাতির মত। তিনি বললেন, শুধু আশীর্বাদে হবে না, পেটে খেতে হবে, দুহাতে পরিশ্রমও করতে হবে। বলতে পারিস, আমি তাহলে এত রোগা পটকা কেন?

সলজ্জ কৌতুকে বললাম, বলতে ইচ্ছা করছিল, সাহস হচ্ছিল না! আচার্য বললেন, বংশানুক্রম। আমার বাবা কাকা সবাই এই রকম কৃশকায় ছিলেন। এডিনবরায় আমার এক শিক্ষক বন্ধু আমাকে বলতেন, মি: স্ট্রেট লাইন, অর্থাৎ কিনা শ্রীযুক্ত সরল রেখা। সুযোগ পেয়ে বললাম, আপনি সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে একখানা চটি বই লিখে ইংরেজ ওপরওয়ালাদের বিষ নজরে পড়েছিলেন শুনেছি, এ কি সত্যি? সত্যি বৈকি, আচার্য রায় বললেন, এই জন্যেই ওরা আমাকে শিক্ষা বিভাগের চাকরিতে বেশী ওপরে উঠতে দেয়নি। কিন্তু দেশী বড় কর্তারাও কেউ আমার ওপর খুসী হন নি, বাঙালী মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার লেখাটার জন্যে। আমি বললাম, ওটা পড়েছি। ব্যবসা বাণিজ্যের বা খেটে খাওয়ার কাজে না গিয়ে সবাই যাচ্ছেন আরামের চাকরিতে এবং দেশের শিল্প বাণিজ্য ও কাজকারবারের দুনিয়াটা চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে অবাঙালীর হাতে, একথা বললে সর্বভারতীয়তাবাদী কংগ্রেস কর্তারা চটতে পারেন, কিন্তু জজ ম্যাজিস্ট্রেট ও হাকিম শ্রেণীর মানুষরা চটবেন কেন? তাঁদের ত বরং চোখ ফোটা উচিত। ছেলেমেয়েদের অন্য ভাবে মানুষ করে তোলার ভাবনাই জাগা উচিত তাঁদের মনে।

আচার্য বললেন, তা জাগলে ত হতই। আসলে তাঁদের মনের কথা হল, দেশটাকে তোমরা স্বাধীন কর, সমৃদ্ধ কর, আমরা সেই গাছের ফল পেড়ে খাব। দেখ, মানুষ পরিবারের মধ্যে জন্মায়, সেখানে থেকে যায় সমাজে। সমাজ থেকে প্রবেশ করে দেশে, দেশ থেকে দুনিয়ায়। ইংরেজ বল, ফরাসী বল, জার্মান বল, সবারই শিক্ষার সার কথা এই। আমাদের ধারা হল উল্টো। আমরা মার পেট থেকে পড়েই ইন্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিকতাবাদী হই। তার ফলে পরিবার সমাজ দেশ সব যায় রসাতলে। কিন্তু প্রকৃতি ত কোন শূন্য ঠাই বরদাস্ত করে না। আমাদের ফেলে যাওয়া জায়গায় অন্যেরা ঢুকে পড়েছে। আর আমরা হয়েছি কেরানী, আর স্কুল মাস্টারের জাত। তাও জুটলে, না জুটলে বেকার। এই কথা বলে যদি খুন হতে হয় তাও হব। একদিন গিয়ে দেখলাম আচার্য খুব উত্তেজিত। সামনে উপবিষ্ট দুটি ভদ্রলোককে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করছেন। দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছি, ঢুকব কি ঢুকব না! দেখতে পেয়ে বললেন, রবিবাবুর গান ভাঁজছিস নাকি, যাব কি যাব না, মিছে এ ভাবনা! সুট করে ঢুকে চৌকির এক কোণে বসে পড়লাম। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই কার ভক্ত, গান্ধীর না সুভাষের? আমি বললাম, ন্যায় ও সত্যের ভক্ত। আচার্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক বলেছিস। দেশ হল পরম সত্য, ন্যায় হল দেশের জন্যে মানুষের জন্যে যে যতটুকু পারি, ততটুকু কাজ করা। সেই কাজ গান্ধী করুন, সুভাষ করুন, আমরা আছি তাঁদের সঙ্গে। এখানে পাল্লাপাল্লি পক্ষাপক্ষ কেন? আরে আগে সৈনিক হতে হয়, তবে ত সেনাপতি হবার যোগ্যতা আসে। যার সে যোগ্যতা আসে না, যেমন আমার, আমার আজীবন সৈনিক থাকাই শ্রেয়। বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু স্যার স্বয়ং গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ যাঁর ব্যক্তিত্বকে সসম্মানে স্বীকার

করেছেন; তিনি ত আমাদের মত মেকো ভোলান্টিয়ার নন! তিনি বললেন, আমি বিজ্ঞানকর্মী, দেশের ছেলেমেয়েকে কর্মমুখী ও বিজ্ঞানবোধ সম্পন্ন করাতে পেরে থাকি যদি কিছুটাও, তাহলে সেইটুকু হল আমার সাফল্য। এর বাইরে সাহিত্য হোক রাজনীতি হোক, সে সবই আমার কাছে কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিকের কাজ। নেতৃত্বের লোভ কোনদিন করিনি। তার প্রয়োজনই হয়নি। তা সত্ত্বেও আমাকে হট্টগোলের হাটে টেনে নামান হচ্ছে। এসবই করছেন কাগুজে ভদ্রলোকরা, যাঁরা আজ আচার্য বলে মাথায় তুলছে, কাল পাষণ্ড বলে তুলে আছাড় দিতে অভ্যস্ত!

আমি বললাম, না স্যার কাগুজেদের মধ্যে আমরাও ত আছি। খোদ প্রফুল্লচন্দ্র সরকার আপনার আত্মজীবনী তর্জমা করছেন। তিনি বললেন, দৈত্যকুলে দুচারটে পেল্লাদ চিরদিনই থাকে, এখনো আছে। আমি তখন অধ্যাপকতা থেকে সাংবাদিকতায় এসেছি। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কথাটা বললাম, তবে সংকট ত্রাণ সমিতি সম্পর্কীয় বিতর্কে তখন সত্যিই আচার্যকে অনুচিতভাবে জড়ান হয়েছিল। একদিন এক নিষ্ঠাবান কংগ্রেসসেবী এসেছেন আচার্যের কাছে, নিজের বিবাহ সম্বন্ধে অভিমত চাইতে। আচার্য বললেন, বিয়ে করবে তুমি। তোমার সামর্থ্য ও প্রয়োজন বিচার করে ঠিক কর। এখানে অন্যের মতামতের দাম কি? তবে সাংসারিক দিক থেকে দেখলে বিয়ের উপযোগিতা আছে বৈকি! অবিবাহিত জীবনে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে যে শক্তি নষ্ট হয়, তা কাজে লাগাতে পারলে ঢের বেশী সময় পাওয়া যায়। আমি মস্ত একটা ঘা খেয়ে পিছিয়ে এসেছিলাম, নইলে হয়ত অন্য রকম কিছু হত জীবনটা। সুযোগ বুঝে বললাম, বলবেন স্যার সেদিককার ইতিহাসটা আমাদের। কৃত্রিম রাগের অভিনয় করে বললেন, গাধা কোথাকার! বাবা খুড়োদের ভুলভ্রান্তি স্খলন পতন নিয়ে তল্লাসি করতে হয় না। যা বলিনি, তা না বলাই থাক। এর চেয়ে অন্তরঙ্গ প্রকাশ তাঁর আর কোনদিন হতে দেখিনি, যদিও এই জ্ঞানতপস্বী সত্য সাধকের পদাশ্রয়ে আনাগোনা করেছি তাঁর জীবনান্তকাল পর্যন্ত।

Buy Indian League of Bengal

(Acharya P.C.Ray's Appeal)

The average daily income of the people of this country, as you are no doubt aware, is only two annes six pies, whereas in Germany it is two Rupees, in England two Rupees one anna and four pies and in the United States of America it is three Rupees This intense poverty of our country is the root of many evils and it is essential that it should be remedied as quickly as possible. However equitably or even equally the total wealth produced might be divided, it will have no effect in bringing about a better condition, unless the producing capacity of the people of this country is rapidly increased Therefore Agriculture on which the great majority of the people now depend, should not only be improved but should be supplimented by manufacturing industries and cognate enterprises, such as banking and insurance. The unfortunate part of the whole thing is this that the cultivators have not sufficient land. Moreover cottage industries having died out, they have to remain in enforced idleness for the major part of the year and so eke out a meagere substance from the little plot of land they cultivate. The condition of the unemployed middle class is probably still worse. It behoves us, therefore, to support not only the existing industries but also to revive those which have died out as well as to start new ones.

It may not be possible for everyone of us to start an industry but we can each one of us help the existing ones by purchasing the goods which are manufactured by them, even if it be necessary to pay a little more. But there is an initial difficulty, when Swadeshi goods are available, it sometimes happens that the purchaser is unable to buy owing to the difficulty of getting it. Either he does not know whether such goods are at all available or he does not know where they are available In order to help such purchasing and thereby to give a stimulas to Swadeshi industries and concerns, this League (the Buy Indian League) has been started and it is hoped that this League will be able to bridge the gulf between the Swadeshi manufacturers and the Purchasers of the Swadeshi goods It should be the endeavour of this League to give and collect all information as to where particular goods are manufactured or

are available

This league also asks the conductors of Swadeshi manufacturers and enterprises to co-operate with the league by supplying all necessary information as to their manufactures

When every Province of India is striving hard to stimulate the national consciousness should Bengal, the home of Swadeshi movement lag behind ? I fondly, remember the days when the "Mela" movement led by Naba Gopal Mitra and Raj Narain Bose of revered memory struck a responsible chord in the hearts of young Bengal of that time and how the movement started by them gave the first great stimulas to swadeshi enterprises. The impassioned and eloquent speeches of the late lamented Surendranath Banerjee exerting his countrymen to take up the Swadeshi vow during the agitation of the anti-partition days are still ringing in my ears. and still more recently I have watched with the greatest pleasure the Khaddar movement growing in volume and intensity at the clarion call of Mahatma Gandhi In the flood of the movement, the whole of Bengal has been inundated and one could feel how sound was the heart of Bengal. In some of these great movements, it has been my privilege to do my little bit and I feel happy at the thought that the fondly cherished dreams of my youth are about to be realised in the evening of my life, I know the idealism of Bengal and the sacrifice of her sons and daughters are ready to undergo for this happy consummation.

On behalf of the league I ask every one, Young or old, to join the league and cooperate with us in furtherance of this movement Rember Heaven helps those who help themselves

P.C.Ray
President
Bengal Buy Indian League
The Amrita Bazar Patrika, Tuesday, April 12, 1932